হ্যানস্ অ্যাণ্ডারসন রচনাবলী

১

অনুবাদ

লীলা মজুমদার

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-বারো

প্রকাশিকা
গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২, ১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রাকর
মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২/১ শিশির ভাদুড়ি সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

অলংকরণ ও প্রচ্ছদলিপি
বিমল দাস

বাঁধাই
বিদ্যুৎ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৫ বৃন্দাবন ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম খণ্ডের মূল্য
পঁচিশ টাকা

বই প্রসঙ্গে

সবুরে মেওয়া ফলে। জানি না কতটা সার্থক হয়েছি আমরা বর্তমান গ্রন্থের মাধ্যমে এই প্রবাদ বাক্যটিকে রূপ দিতে। তবুও অপরাধ স্বীকার করে নিই আমাদের অগণিত গ্রাহক বন্ধুদের কাছে— যাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতা বিপুলভাবে উৎসাহিত করেছিল সৎ-সাহিত্য প্রকাশে ব্রতী হতে। দেরিতে হলেও আজকের এই শুভ মুহূর্তে হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন রচনাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠক-বন্ধুদের হাতে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত।

রূপকথার জনক হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন-এর পরিচয় নতুন করে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ছোটো-বড়ো সকলের ঘুম কেড়ে নেয় তাঁর প্রতিটি লেখা। সারা পৃথিবীর শিশুর রাজ্যে হ্যান্সের আসন পাতা রয়েছে সম্রাটের মতো।

মানুষ আসে মানুষ যায়—রূপকথাও লেখা হয়েছে, হবেও-বা আরো অনেক। কিন্তু তার মধ্যে হ্যান্স চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন সব দেশের সব কালের শিশুর মনোরাজ্যে।

সবশেষে আমার সেই-সব শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের কথা না বললে নয়— যাঁদের সহযোগিতায় সম্ভব হয়েছে এ বই-এর সুষ্ঠু রূপায়ণ। বাংলা শিশু সাহিত্যের আর এক যশস্বিনী লেখিকা শ্রদ্ধেয়া লীলাদি অর্থাৎ লীলা মজুমদার মহাশয়া তাঁর সহস্র ব্যস্ততার মধ্যেও ছোটোদের মুখে হাসি ফোটাতে এগিয়ে এসেছেন বাংলায় হ্যান্সকে তর্জমা করতে। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। এ বই-এর প্রুফ দেখায় ও মুদ্রণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীসমীর মৈত্র ও শ্রীমতী কৃষ্ণা মৈত্রের কাছ থেকে। লেখাকে রেখায় রূপ দিয়েছেন শিল্পীবন্ধু শ্রীবিমল দাস। দুর্লভ মূল সংস্করণের বইটি দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বন্ধুবর শ্রীশৈলশেখর মিত্র। এঁদের প্রত্যেকের জন্য রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া সহযোগিতা

পেয়েছি একলা প্রিন্টিং প্রেস-এর প্রতিটি কর্মীবন্ধুর, সহযোগিতা পেয়েছি এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানির সহকর্মীদের কাছ থেকেও—এঁদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সবশেষে এ বই-এর ভালো-মন্দ বিচারের ভার ছেড়ে দিলাম আমার ক্ষুদে বন্ধুদের উপর। তাদের ভালো লাগলেই সার্থক মনে করব আমাদের এই উদ্যোগ।

১৫ আগস্ট

গীতা দত্ত

H. C. Andersen

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসন

(১৮০৫-১৮৭৫)

ডেনমার্কের ওডেন্স শহরে হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ডারসনের জন্ম। গরিব মুচির ছেলে। ছোটোবেলা থেকে ভারি কল্পনাপ্রবণ। ১৮১৬ সালে বাপের মৃত্যুর পর থেকে আর কেউ ছেলেটার দেখাশুনো করত না। সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে, বাড়িতে বসে খেলনার থিয়েটার বানাত, পুতুল বানাত, তাদের জন্য নানারকম পোশাক বানাত। আর কেবলই দেশের বিদেশের যেখানকার যত নাটক পেত, সব পড়ত।

বড়োরা বললেন ওকে দরজির কাজ শেখানো যাক। এদিকে অ্যাণ্ডারসনের ইচ্ছা সে পেশাদার অপেরা গায়ক হবে। শেষকালে পালিয়ে কোপেনহাগেনে গিয়ে কিছুকাল থিয়েটারে থিয়েটারে ঘুরে বড়ো কষ্টে দিন কাটাল। সবাই বলত দূর, দূর, ছেলেটা ক্ষ্যাপা। অবশেষে হ্যান্স কয়েকজন নামকরা সঙ্গীতজ্ঞের সাহায্যও পেয়েছিল। কিন্তু গলাটাই গেল খারাপ হয়ে; তখন সে রয়েল থিয়েটারে নাচ শিখতে লাগল। সেখানকার অধ্যক্ষ ওকে বড়ো স্নেহ করতেন।

কেমন করে রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিকের নজরে পড়ে যাওয়াতে, তিনি অ্যাণ্ডারসনকে কয়েক বছর বিনি পয়সায় একটা বড়ো বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখালেন। তার আগেই মাত্র সতেরো বছর বয়সে অ্যাণ্ডারসনের প্রথম বই 'পালনাটকের কবরের ভূত' প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২৭ সাল পর্যন্ত লেখাপড়া চলল, যদিও একটুও ভালো লাগত না। পড়ার শেষে আবার কোপেনহাগেনে গেলেন; তখন তাঁর বাইশ বছর বয়স।

১৮২৯ সালে একটা ভ্রমণকাহিনী, নাটক ও একটা কবিতার বই প্রকাশ করে দেখতে দেখতে লোকের সুনজরে পড়ে গেলেন। ১৮৩৩ সালে রাজার কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে সমস্ত ইউরোপে ঘুরে

বেড়ালেন। ১৮৩৫ সালে কোপেনহাগেনে রূপকথার প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। কিন্তু সেগুলি যে কী অসাধারণ গল্প সে কথা বুঝতে লোকের একটু সময় লেগেছিল।

রূপকথার চেয়ে বড়োদের উপন্যাস প্রবন্ধের জন্য তাঁর বেশি নাম হয়েছিল। মাঝে কিছুদিন তিনি থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কতকগুলো অসাধারণ খামখেয়ালী রচনাও এ-সময়ে লিখে খুব আদর ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

১৮০৮ আর ১৮৪৫-এ রূপকথার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। ইউরোপের সব দেশের লোকদের সে কী আগ্রহ! শুধু ডেনমার্কেই যেন ততখানি নয়।

১৮৪৭ সালে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে খুব আনন্দে কিছুদিন কাটালেন। সেখানে যথেষ্ট আদরও পেলেন। ফিরে আসবার সময় স্বয়ং চার্লস ডিকেন্স জাহাজ-ঘাটে এসে তাঁকে বিদায় জানিয়েছিলেন।

ভালো ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার বলে খ্যাতিলাভ করবার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল। রূপকথাগুলো থেকে তেমন কিছু আশা করতেন না। অথচ সেইগুলিই বিশ্ব-সাহিত্যে অকৃত্রিম ও অদ্বিতীয় বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। রূপকথাকে গুরুত্ব না দিলেও তা লিখে যেতেন। ১৮৪৭, ১৮৪৮ সালে ও তার পরেও আরো অনেকগুলি রূপকথা লেখা হয়েছিল।

১৮৭২-এ শেষ রূপকথাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই বছরেই পড়ে গিয়ে এত জখম হয়েছিলেন যে আর কখনো আগেকার স্বাস্থ্য ফিরে পান নি। ১৮৭৫ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

অ্যাণ্ডারসনের রূপকথার বিশেষত্ব হল যে, এগুলি তাঁর নিজের মনগড়া মৌলিক গল্প; গ্রিমভাইদের গল্পের মতো পুরনো গল্পের সংগ্রহ নয়। এগুলির সাহিত্যিক গুণও অনেক বেশি।

সবচাইতে আশ্চর্যের কথা হল যে অ্যাণ্ডারসনের এই-সব গল্প যে কালে, যে দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা হয়েছিল, তখন ঘরে ঘরে বিজলীবাতি জ্বলত না, এরোপ্লেনের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, মোটরগাড়িও তৈরি হয় নি, তখন দেশ ভ্রমণে বেরুত লোকে বড়ো-

বড়ো ঘোড়ার গাড়িতে, বেপরোয়া যারা তারা কৌচবাক্সে উঠে বসে, দৃশ্য দেখতে দেখতে যেত। সমস্ত হালচাল তখন আলাদা ছিল, ওদের দেশেই সে-সমস্ত বদলে গেছে আর আমাদের সঙ্গে যে কোনো সাদৃশ্য থাকবে না, সে কথা তো বলাই বাহুল্য। তবু গল্পগুলো পড়ে মন কেমন করে, মনে হয় কত-না আপনজনের কথা হচ্ছে। তাদের সুখে আনন্দ হয়, তাদের দুঃখে কষ্ট হয়। তারা যে ভিন যুগের ভিন দেশের মানুষ, সে কথা একবারও মনে হয় না। তার কারণ বাইরের মানুষদের নিয়ে তো আর এ গল্প নয়, এ গল্প হল অন্তরের কথা নিয়ে, সেখানে দেশ নেই, কাল নেই, সবাই এক, সবাই আপন।

ভিন দেশ, ভিন যুগ হয়ে বরং একটা সুবিধাই হয়ে গেছে। গল্পগুলো পড়লে সে দেশের সেকালের হালচালের কথা সব জানা হয়ে যায়। চোখের সামনে যেন ছবির মতো তাদের দেখতে পাওয়া যায়, বড়ো-বড়ো খালে সুন্দর সব নৌকোয় চড়ে বড়োলোকরা বেড়াচ্ছে, বড়ো-বড়ো গাড়ি করে দেশ ভ্রমণ করছে, দামী দামী পোশাক পরে ভালো ভালো সরাইখানায় থাকছে। আর গরিবরা কর্কশ পশমের জামা গায়ে, বরফের ওপর দিয়ে খালি পায়ে কিম্বা ছেঁড়া জুতো পরে হেঁটে যাচ্ছে, বড়ো-বড়ো বাড়ির চিলেকোঠা ভাড়া নিয়ে মাথা গুঁজে থাকছে। তবু তাদের মনেও কত শখ, সেই-খানে তারা গোলাপগাছ লাগাচ্ছে, কত ভালোবাসার লোক ছিল তাদের, দুঃখে সুখে জীবন কাটছে, কত ভুল করছে তারা, কত প্রিয়জনকে হারাচ্ছে—তাদের সঙ্গে সব দেশের সব কালের সব মানুষের কোনো তফাত নেই।

নিতান্ত বাস্তবে ঘেরা এই জগতেও পরীদের আনাগোনা ছিল; তারা কেবলই মানুষদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ত, তা সে ভালোর জন্যই হোক, কি মন্দর জন্যেই হোক কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা যেত নিজেদের মনের বল আর গায়ের জোর আর প্রিয়জনের ভালোবাসা ছাড়া কোনো মানুষের কোনো অবলম্বন নেই। কেবলই মনে হয় সব ছোটো ছেলেমেয়ের মনের মধ্যে একটা গোপন দেশ

আছে, যেখানে সব সুখের বাস। দুঃখও যে সেখানে নেই তা বলব না, কিন্তু সে দুঃখ ফুলের মতো সুন্দর, মখমলের মতো কোমল। এই দেশকেই পরীদের দেশ বলা যায়। সব কিছু সুন্দর সেখানে। কুৎসিত যা কিছু তাদেরও সুন্দর দেখায়। নিষ্ঠুর সৎমারা সেখানে সাজা পায়। সেখানকার ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা সেকালেরও নয়, একালেরও নয়, তারা চিরকালের; তারা এ-দেশেরও নয়, ও-দেশেরও নয়, তারা সব দেশের; তারা কালোও নয়, গোলাপিও নয়, তারা সব রঙের বাইরে। তার কারণ সব মানুষের ছেলে-মেয়েদের বুকের ভিতর যে চিরন্তন মানব শিশু বাস করে, হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন তাদের গল্প লিখতেন। ঐ পরীদের দেশ খুঁজলে পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়। হ্যান্স অ্যাণ্ডারসন সেই দেশের কথাই লিখতেন। সেখানে শুধু মানুষরা থাকে না, তাদের গেরস্থালীর জিনিসপত্র, জন্তু-জানোয়ার, পাখি, ফুল, সব থাকে। তাদের মনেও সুখ দুঃখ থাকে। মানুষের ছেলেমেয়েরা যে-সব খেলনা নিয়ে খেলে, যে জিনিস ব্যবহার করে, সে-সমস্তও মানুষেরই মতো হয়ে ওঠে।

হ্যান্স অ্যাণ্ডারসনের পরীদের দেশে রাগ, হিংসা, ঝগড়াও আছে, মানুষের জগতে যা আছে, তার সবই আছে। তফাত শুধু এই যে গল্পের শেষে মন্দরা হয় ভালো হয়ে যায়, নয়তো সাজা পায়। চিরকাল দুষ্টুমি করতে তাদের দেওয়া হয় না।

আসলে ঐ পরীদের দেশটা তো আমাদের এই চেনা পৃথিবীটা ছাড়া আর কিছু নয়, শুধু একটা রঙিন তে-কোণা কাঁচের মধ্যে দিয়ে দেখা। বলা যেতে পারে একরকম মনের ইচ্ছার দেশ। সেই কাঁচটা হল কল্পনার কাঁচ, সমবেদনার কাঁচ। এই কাঁচ দিয়ে যা কিছু দেখা যায়, তাই অমর হয়ে যায়, তাই লোককথা, রূপকথা, উপ-কথা কখনো সেকেলে হয়ে যায় না। পুরনো উপন্যাস কেউ পড়তে চায় না, পুরনো নাটক কম লোকে পছন্দ করে, কিন্তু পুরনো পরীদের গল্পের নতুন নতুন সংস্করণ বেরোয়।

কেউ কেউ বলে থাকেন আজকালকার ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞান ভালোবাসে, ওরা রূপকথা চায় না। তাও ঠিক বলা হল না। যারা

বিজ্ঞান ভালোবাসে, তারাও রূপকথা ভালোবাসে। যারা বৈজ্ঞানিক জিনিস ছাড়া আর কিছু উপভোগ করতে পারে না, সেই হতভাগ্যরাও বৈজ্ঞানিক রূপকথা ভালোবাসে।

আসল ব্যাপার হল এই দশ দিক দিয়ে ঘেরা সত্যিকার পৃথিবীটা মানুষের ছেলেমেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট বড়ো নয়। এমন-কি, মহাকাশ-যাত্রীদের কাহিনীও দেখতে দেখতে দশ দিকের বেড়ার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, কাজেই কল্পনার রাজ্য ছাড়া উপায় কি? নইলে বঞ্চিতদের বুক ভরবে কিসে, ব্যর্থদের কোথায় সার্থকতা মিলবে? চিন্তা যেখানে বাস্তবের বাধায় ঠেকে ফিরে ফিরে আসে, সে জায়গা ছোটোদের কোন কাজে লাগবে? আর শুধু ছোটোদেরই-বা কেন, তাদের দলে অনেক বুড়োরাও আছে, তারাই-বা সেই নেই-দেশের হদিশ কোথায় পাবে?

এ কথাও শোনা যায় যে কাল্পনিক পরীদের গল্প পড়লে ছেলে-মেয়েদের মন দুর্বল হয়ে যায়। তাই কখনো হয়, কল্পনার যেখানে প্রসার মনের বলেরও উৎস সেখানে। পৃথিবীর সব নতুন নতুন উদ্ভাবনের পিছনে কারও-না কারও কল্পনাপ্রবণ মন কাজ করে, সব শিল্পের সব সাহিত্যের পিছনেও তাই। এই বই তারই একটা নমুনা।

লীলা মজুমদার

হানস্
অ্যাণ্ডারসেন
রচনাবলী

সূচীপত্র

নাইটিঙেল পাখির কথা

চীন-সম্রাটের প্রাসাদের মতো চমৎকার প্রাসাদ পৃথিবীতে আর একটিও ছিল না। আগাগোড়া মিহি চীনে-মাটির তৈরি, এমনি পাতলা যে, এতটুকু ছুঁলেই বুঝি ভেঙে পড়ে!

বাগানে ছিল তুনিয়ার যত সেরা ফুল। সব চাইতে সুন্দর ফুলগুলোর গায়ে আবার ছোটো-ছোটো রুপোর ঘুন্টি বাঁধা থাকত, তার টুং-টাং শব্দ কানে গেলে ফুলের দিকে একবার না চেয়ে পাশ দিয়ে কারো যাবার উপায় ছিল না। বাস্তবিকই চীন সম্রাটের বাগানের সব কিছু সাজান, গোছান নিখুঁত। তার উপর এত বড়ো বাগান যে মালীরাও জানত না কোথায় তার শেষ। কিন্তু কেউ যদি হাঁটতে হাঁটতে বাগানের সীমানা ছাড়িয়ে যেত, দেখতে পেত তার পরে ঘন বন, তার গাছগুলি কি উঁচু আর তার পরেই সমুদ্র। বন একেবারে সাগরতীর অবধি নেমে গেছিল, সে সাগরের জল কি গভীর, কি ঘন নীল! বড়ো-বড়ো জাহাজগুলি বনের গাছতলার কাছ ঘেঁষে ভেসে যেত। গাছের ডালপালার মধ্যে একটি নাইটিঙেল পাখি থাকত। সে পাখি এমনি মধুর সুরে গান গাইত যে রাতে যখন জেলেরা মাছ-ধরার জাল নিয়ে বেরুত, সে সুরের রেশ কানে গেলেই, হাজার কাজ ফেলে তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে গান শুনত।

পৃথিবীর সব দেশ থেকে ভ্রমণকারীরা সম্রাটের রাজধানীতে আসত, শহর, প্রাসাদ, বাগান, যা দেখত তারই সুখ্যাতি করত। কিন্তু যেই না তারা নাইটিঙেল পাখির গান শুনত, অমনি সবাই একবাক্যে বলত, 'এই হল সবার সেরা জিনিস।' দেশে ফিরে গিয়ে তারা ঐ পাখির গল্প করত আর সে-সমস্ত পণ্ডিতরা শহর, প্রাসাদ, বাগানের গুণগান করে বই লিখত, তারাও বলত ঐ পাখির কোনো তুলনা নেই। সাগরতীরের সেই বনের নাইটিঙেল পাখির বিষয়ে কবিরা সব অপূর্ব কবিতা রচনা করত।

সে-সব বই পৃথিবীর সব দেশে যেত ; এমনি করে একটি বই একবার চীন সম্রাটের হাতেও এল। সম্রাট সে বই পড়ছেন তো পড়ছেন-ই, পড়ছেন আর ঘন ঘন মাথা নাড়ছেন। বইতে তাঁর শহরের, প্রাসাদের, বাগানের যা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, সম্রাট পড়ে আহ্লাদে আটখানা। কিন্তু শেষের দিকে একটি কথা পড়ে তিনি তো অবাক ! বইতে লিখেছে, 'কিন্তু সেখানকার সব জিনিসের সেরা জিনিস হল ঐ নাইটিঙেল পাখি।'

সম্রাট বললেন, "এ আবার কি মাথা-মুণ্ডু লিখেছে ! নাইটিঙেল আবার কি ? এমন কথা তো শুনিও নি, জানিও নি ! আমার সাম্রাজ্যে—শুধু তাই কেন, আমারই বাগানে —এমন পাখি আছে, অথচ আমি সে কথা কখনো শুনি নি ! বাস্তবিকই বই পড়ে কিছু কিছু শেখা যায় !"

অতএব প্রধানমন্ত্রীর ডাক পড়ল। তিনি এমনি হোমরা-চোমরা ব্যক্তিবিশেষ যে, সাধারণ লোকে তাঁর সঙ্গে কথাই বলতে পেত না। যদি-বা সাহস করে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করত, তাঁর একমাত্র উত্তর ছিল, "ভুঃস্ !" তাকে তো আর কিছু উত্তর বলা চলে না।

সম্রাট বললেন, "শুনছি নাকি এখানে নাইটিঙেল নামে

এক আশ্চর্য পাখি আছে ; আমার গোটা সাম্রাজ্যে তার গানের মতো মূল্যবান জিনিস নাকি আর কিছু নেই ! তার কথা আমাকে বলা হয় নি কেন ?”

প্রধানমন্ত্রী তো অবাক ! “সে কি কথা ! আমি তো কস্মিন্ কালে তার নামও শুনি নি ; সে তো কখনো রাজসভায় হাজিরা দেয় নি যে জানব ।”

সম্রাট বললেন, “আমার ইচ্ছা আজ সন্ধ্যাবেলায় সে আমার কাছে এসে গান শোনাক ! আমার কি আছে না আছে সারা পৃথিবীর লোকে জানে, অথচ আমিই জানি না !” প্রধানমন্ত্রী বললেন, “কি জানি আমি তো তার বিষয়ে কিছুই শুনি নি । খুঁজে দেখব, পাবও নিশ্চয় ।”

কিন্তু পাবেটা কোথায় ? প্রধানমন্ত্রী এখানকার সিঁড়ি বেয়ে ওঠেন, ওখানকার সিঁড়ি বেয়ে নামেন, এখানে সভাঘরে দেখেন, ওখানে দালানে দেখেন, কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়. কেউ নাইটিঙেলের নামও শোনে নি । অগত্যা সম্রাটের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, “ঐ লোকটা আগাগোড়া বানিয়ে লিখেছে ! বইয়ে যা কিছু লেখে জাঁহাপনা যেন তা সব বিশ্বাস না করেন, কারণ তার অনেকখানিই স্রেফ মন-গড়া ।”

সম্রাট বললেন, “তা বললে হবে কেন ? যে বইতে ও কথা লেখা আছে, সে বই মহামান্য জাপান-সম্রাট আমাকে পাঠিয়েছেন, কাজেই কথাটা মিথ্যা হতে পারে না । মোট কথা আমি নাইটিঙেলের গান শুনতে চাই, তাকে আজ সন্ধ্যায় এখানে উপস্থিত হতে হবে, না হলে সভাসুদ্ধ সকলকে বেত মারা হবে ।”

বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন, সিঁড়ি বেয়ে নামলেন, সভাঘর দেখলেন, দালান

দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভার অর্ধেক মানুষও দৌড়োদৌড়ি করতে লাগল, কারণ বেত খাবার শখ একজনেরও ছিল না। সেই আশ্চর্য নাইটিঙেল পাখি সম্বন্ধে কত প্রশ্নই-না করা হল; আশ্চর্যের বিষয় যে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই তার কথা বলে আর সভার কেউ কিছু জানে না!

অবশেষে রান্নাঘরে একটা বেজায় গরিব ছোটো মেয়ের সঙ্গে তাদের দেখা হল। সেই মেয়ে বলল, "আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও পাখি আমার খুব চেনা। আহা, কি মিষ্টি গান গায়! রোজ সন্ধেবেলা আমি এখানকার পাত-কুড়ুনি নিয়ে যাই আমার রুগ্ন মায়ের জন্য। মা থাকে সমুদ্রের ধারে। ফেরবার সময় ছোটো বনটাতে একটু জিরিয়ে নিই আর সেই সময় নাইটিঙেল পাখির গান শুনতে পাই, শুনে আমার চোখে জল আসে!"

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "শোন, শোন, পাকশালের দাসী, আমাদের যদি নাইটিঙেল পাখির কাছে নিয়ে যেতে পার, রান্নাঘরে তোমাকে ভালো চাকরি পাইয়ে দেব। ওকে যে আজ সন্ধ্যায় রাজসভায় হাজিরা দিতে হবে।"

তার পর তারা সবাই মিলে যে বনে নিত্যি নাইটিঙেল গান গাইত, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে গেল রাজসভার অর্ধেক লোক। যাবার পথে একটা গোরুকে হাম্বা-হাম্বা করে ডাকতে শোনা গেল। তাই শুনে রাজসভার ছোকরা অনুচররা বলে উঠল, "ঐ যে! শেষটা সত্যি পাওয়া গেল! কিন্তু অতটুকু জানোয়ার এমনি জোরে ডাকে! কোথায় যেন আগে শুনেছি এইরকম ডাক!"

পাকশালের ছোট্টো দাসী বলল, "না, না, ও তো গোরুর ডাক, এখনো ঢের পথ বাকি।"

পুকুরে ব্যাঙ ডাকছিল।

রাজসভার প্রধান পুরোহিত বললেন, "আহা, ঐ তো! ঠিক যেন মন্দিরে ছোটো-ছোটো ঘণ্টা বাজছে!"

পাকশালের ছোট্টো দাসী বলল, "আজ্ঞে না, ও তো ব্যাঙ, তবে আর বেশি দেরি নেই।"

তার পর নাইটিঙেল পাখি গান ধরল।
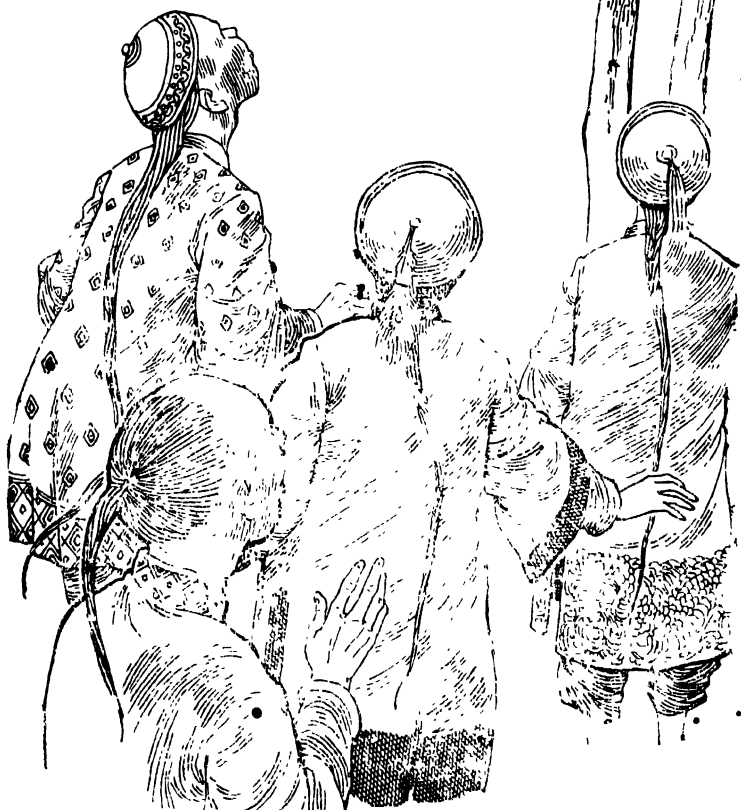
ছোটো দাসী বলল, "ঐ তো, শোন, শোন!" গাছের ডালে বসা ছোট্টো একটা ছাই রঙের পাখিকে দেখিয়ে বলল, "ঐ-যে ঐখানে!"

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "এ-ও কি সম্ভব? এমন আমি ভাবতে পারি নি! কি সাদা-সিধে চেহারা। হোমরা-চোমরা এত লোক দেখে হয়তো রং বদলেছে!"

পাকশালের ছোট্টো দাসী ডেকে বলল, "ওগো, ছোটো নাইটিঙেল, আমাদের মহানুভব সম্রাটের বড়ো ইচ্ছা তুমি তাঁকে গান শোনাও।"

নাইটিঙেল বলল, "খুব খুশি হয়েই শোনাব।" এই বলে এমনি মধুর স্বরে গাইতে লাগল যে, শুনে সবাই মুগ্ধ হল।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "শুনে মনে হয় যেন কাঁচের ঘণ্টা বাজছে। আহা, দেখ দেখ, ঐ অতটুকু গলাটি কেমন নড়ছে! আগে কখনো ওর গান শুনি নি, এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সভা জমাবে ভালো!"

নাইটিঙেল বলল, "সম্রাটকে আরো গান শোনাব?" ও ভেবেছিল ওঁদের সঙ্গে বুঝি সম্রাটও আছেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "হে মহিমাময়ী নাইটিঙেল, আমি আপনাকে আজ সন্ধ্যাকালে রাজসভার এক বিশেষ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি, সম্রাট আপনার গান শুনলে বড়োই আনন্দ লাভ করবেন।"

নাইটিঙেল বলল, "কিন্তু সবুজ গাছপালার মধ্যে আমার গান আরো ভালো শোনায়।" তবু সম্রাটের ইচ্ছার কথা শুনে খুশি হয়েই সে ওঁদের সঙ্গে চলল।

সুসজ্জিত প্রকাণ্ড সভাঘরে সম্রাট বসেছেন, ঘরের মাঝখানে নাইটিঙেল পাখির জন্য সোনার দাঁড় প্রস্তুত। সভাসদরা সকলে

উপস্থিত। পাকশালের ছোট্টো দাসীও দরজার পিছনে দাঁড়াবার অনুমতি পেয়েছে; এখন কি না সে পদ পেয়েছে, উপাধি পেয়েছে, পাক-পরিচারিকা হয়েছে! যে যত ভালো পারে সেজেগুজে এসেছে; সবার চোখ রয়েছে ছাই রঙের ক্ষুদে পাখিটার উপর। মাথা নেড়ে সম্রাট তাকে গান শুরু করার ইশারা দিলেন।

অমনি সে যে কি মধুর গান ধরল, সম্রাটের দুচোখ জলে ভরে এল, গাল বেয়ে সে জল গড়িয়ে পড়ল। তার পর পাখি আরো মিষ্টি গলায় গান গাইতে লাগল, যারা শুনল তাদের সকলের মনের মূলে গিয়ে নাড়া দিল। সম্রাট এত খুশি হলেন যে, তখনি হুকুম করলেন, "নাইটিঙেলকে এখনি আমার সোনার চটিজোড়া দেওয়া হোক, গলায় ঝুলিয়ে রাখুক।" নাইটিঙেল কিন্তু ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে, সম্রাটের কাছ থেকে তার যথেষ্ট পুরস্কার লাভ হয়ে গেছে।

"সম্রাটের চোখে জল দেখলাম, তার চাইতে বেশি আর কি পেতে পারি? সম্রাটের চোখের জলের যে অনেক দাম।" এই বলে মিষ্টি মধুর সুরে সে আবার গান ধরল।

সভায় যত মহিলা ছিলেন, তাঁরা বললেন, "বাঃ, দিব্যি খোস্ কায়দা চালল দেখছি!" এই বলে যে যার একগাল করে জল মুখে নিয়ে, কথা বলার সময়, নাইটিঙেলের মতো গলা নাড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। মনের ইচ্ছা তাঁরাও একেকটি নাইটিঙেল বনবেন! এমন-কি, চাকর-দাসীরা পর্যন্ত স্বীকার করল তারা বড়ো খুশি হয়েছে। কে না জানে যে এ কথার অনেক দাম, কারণ তাদের খুশি করা বড়ো শক্ত। বাস্তবিক, নাইটিঙেল পাখির সে কি বোল-বোলা! স্থির হল এখন থেকে সে রাজ-সভাতে বাস করবে, তার আলাদা খাঁচা হবে, দিনে দুবার আর

রাতে একবার তাকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে উড়ে বেড়াতে দেওয়া হবে। বারোজন বান্দা ঠিক হল নাইটিঙেল পাখির পায়ে রেশমি সুতো বেঁধে তার এক মাথা ধরে রাখবে। বলা বাহুল্য সুতো কখনো হাত ফস্কাত না।

শহরময় কেবল সেই আশ্চর্য পাখির গল্প! দুজনের দেখা হলেই একজন বলত 'নাইট', অন্যজন বলত 'ইঙেল' তার পর দুজনেই দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ত, পরস্পরের মনের কথা বুঝতে তাদের বাকি থাকত না। এমন-কি, নগরবাসীদের এগারোটি ছেলেমেয়ের নাইটিঙেলের নামে নামকরণ পর্যন্ত হয়ে গেল।

একদিন সম্রাটের কাছে প্রকাণ্ড এক পার্সেল এল, তার উপরে লেখা 'নাইটিঙেল'।

সম্রাট বললেন, "এই দেখ, আমাদের সুদূর-খ্যাত পাখির বিষয়ে আরেকটা নতুন বই!" কিন্তু পার্সেল খুলে দেখা গেল, বই নয়, একটা বাক্সের মধ্যে একটা ছোটো যন্ত্র। যন্ত্রটি হল ক্ষুদে একটি কলের নাইটিঙেল, সত্যিকার নাইটিঙেলের মতো করেই তাকে গড়বার চেষ্টা হয়েছে; তার সারা গায়ে হীরে, চুনী, নীলা বসান। চাবি দিলেই কলের পাখি সত্যিকার, নাইটিঙেলেরই একটি গান গায়, আর গাইবার সময় সোনা রুপো দিয়ে তৈরি ঝকঝকে ল্যাজটি একবার ওঠে, একবার নামে।

সবাই একবাক্যে বলল, "খাসা! চমৎকার! অতুলনীয়!" যে লোকটা পাখি এনেছিল তাকে অমনি উপাধি দেওয়া হল, 'প্রধান রাজকীয় নাইটিঙেল আনয়ক'।

সম্রাট হুকুম দিলেন সত্যি পাখি আর নকল পাখি একসঙ্গে গাইবে। কিন্তু সে গান ভালো জমল না; সত্যিকার পাখি গাইল নিজের মনের মতো করে আর নকল পাখি গাইল চাকায় ঘোরা সুরে।

কারিগর বলল, "নকল পাখির কোনো দোষ নেই, ও তো ঠিক তাল রেখে নিয়ম মাফিক গান গায়।"

কাজেই তখন থেকে নকল পাখি একাই গাইত! সত্যি পাখির মতোই তার গান হত নিখুঁত। তার উপর কি চমৎকার দেখতে! মণি-মানিক্যের মতো পালকগুলি ঝলমল করে।

ঐ একটিমাত্র গান তেত্রিশবার গেয়েও পাখি ক্লান্ত হয় না। সভার সবাই-ও আরো বারে বারে শুনতে রাজি। সম্রাটের ইচ্ছা এবার সত্যিকার নাইটিঙেল কিছু গাক। কিন্তু কোথায় সে? কেউ খেয়াল করে নি কখন সে খোলা জানলা দিয়ে উড়ে গেছে তার সাধের সবুজ বনে।

সম্রাট বললেন, "এর মানে কি?" সভাসদরা পাখিকে গালি-মন্দ করতে লাগল, সবাই বলল, "পাখি বড়ো নেমকহারাম।" তার পর বলল, "সে যাই হোক, ভালো পাখিটাই তো থেকে গেছে!" এই বলে তারা চৌত্রিশতম বারের মতো সেই একই গান শুনল। শুনল তবু সুরটি ঠিকমতো শেখা হল না, বড়ো কঠিন। কারিগর নিজের পাখির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, বলল, সত্যিকার নাইটিঙেলের চেয়ে তার কলের পাখি সবদিক দিয়ে শত গুণে ভালো।

কারিগর বলল, "কারণ বুঝলেন, সত্যিকার পাখি কখন কি করে বসে তারই-বা বিশ্বাস কি, কিন্তু আমার এই নকল পাখি ধরা-বাঁধা নিয়মমাফিক চলে। গাইবেও ঐ একইভাবে, একটুও ইদিক-উদিক হবে না। এ তো সহজেই প্রমাণ করা যায়। যন্ত্র-পাতিগুলি সব খুলে ফেলা যায়, কলকব্জা সবাই দেখতে পাবে, কোন্ চাকা কোথায় থাকে, কে কেমন ঘোরে, এক চাকা লেগে আরেক চাকা কেমন চলে।"

সবাই বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই, আমাদেরও সেই মত!"

কারিগর তখন পরের রবিবার সাধারণ লোকদের পাখি দেখাবার অনুমতি চাইল। সম্রাট বললেন, "নিশ্চয়ই, ওরাও গান শুনুক।" তাই শুনল্ল ওরা তার পরের রবিবার, শুনে সবাই সে কি খুশি, যেন সবাই মিলে চা খাচ্ছে! চা খেতে পেলেই চীন দেশের লোকদের ফুর্তি লাগে। শুধু সেই যে জেলে, যে সবার আগে সত্যিকার নাইটিঙেলের গান শুনেছিল, সে বলল, "হুঁ, শুনতে বেড়ে, প্রায় সত্যিকার পাখিটারই মতো, কিন্তু কি যেন একটা বাদ পড়ে যাচ্ছে, ঠিক বুঝতে পারছি না, কি।"

সত্যিকার নাইটিঙেলকে সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসন দেওয়া হল।

সম্রাটের শয্যার পাশে রেশমি গদীর উপরে নকল পাখিব জায়গা হল। পাখির চারিদিকে তার পাওয়া কত উপহাব, সোনাদানা, রতন, মণি! তাকে সম্মানিত পদ আর উপাধি দেওয়া হল, 'মহামান্য রাজরাজেশ্বর মধুরেণ সমাপয়েৎ গায়ক'।

কারিগর তার পাখি সম্বন্ধে পঁচিশ খণ্ডের বই লিখল, তাব মধ্যে চীন ভাষার যত দুর্বোধ্য খটমট, লম্বা লম্বা কথা ছিল, সব পুরে দিল। কাজে কাজেই সবাই বলল, তারা বই পড়েছে এবং সব বুঝতে পেরেছে, নইলে যে মুস্কিল. ওরা কত মুখ্যু সব প্রমাণ তো হয়েই যাবে, উপরন্তু হয়তো বেতও খেতে হবে।

এক বছর এইভাবে চলল। সম্রাট, সভাসদরা আর চীন দেশের সব লোকদের নকল পাখির গানের পদ আর সুর মুখস্থ হয়ে গেল। ঠিক সেইজন্যেই গানটা তারা অমন উপভোগ করত, তারাও যে সঙ্গে গাইতে পারত! রাস্তার ছোকরারাও গান ধরত, 'চ্চি চ্চি চ্চি চ্চি ক্ক ক্ক ক্ক ক্ক!' সম্রাটও গাইতেন, 'চ্চি চ্চি চ্চি চ্চি ক্ক ক্ক ক্ক!'

এমন সময় একদিন সন্ধেবেলায় সম্রাট বিছানায় শুয়ে আছেন, পাখি গলা ছেড়ে গান গাইছে—এমন সময় পাখির

পেটের মধ্যে টং করে শব্দ হল, তার পরেই কু-র-র-র করে কি যেন ছেড়ে গেল। চাকাগুলো এলোমেলো ঘুরতে লাগল। পাখি চুপ!

সম্রাট তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে প্রধান বদ্যিকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু সে এসেই-বা করবেটা কি? তখন এক ঘড়ি-তৈরিওলাকে আনা হল। অনেক শলা-পরামর্শ চেষ্টাচরিত্র করে পাখিটাকে তো কোনোমতে সারান হল। কিন্তু ঘড়ি-তৈরিওলা বলে গেল পাখিকে যেন বেশি গাওয়ান না হয়, কলকব্জার খুঁটি ক্ষয়ে গেছে, ও আর নতুন করে তৈরিও করা যাবে না, অন্তত ঠিক সুরে গান গাইবার মতো করে তো নয়ই।

দেশ জুড়ে হাহাকার উঠল। এখন থেকে নকল পাখি সারা বছরে মাত্র একবার গান গায়, তাতেও আবার অসুবিধা কত। অবিশ্যি কারিগর বড়ো-বড়ো কথায় ভরা ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দিয়ে বলল যে, পাখির কিচ্ছু হয় নি, আগের মতোই ভালো আছে; অগত্যা সকলকেই মেনে নিতে হল যে পাখির কিচ্ছু হয় নি।

এমনি করে পাঁচ বছর কেটে যাবার পর সমস্ত দেশের উপর শোকের ছায়া নেমে এল। সম্রাটের বড়ো অসুখ, শোনা গেল তাঁর বাঁচার আশা নেই। নতুন সম্রাট নির্বাচিত হল, দেশের লোকরা প্রাসাদের বাইরে পথে দাঁড়িয়ে, প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল সম্রাট কেমন আছেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, "দুঃস্!" বলেই মাথা নাড়লেন। চমৎকার করে সাজান খাটে সম্রাট শুয়ে আছেন, হাত পা ঠাণ্ডা, মুখে রক্তের লেশ নেই। সভাসদদের ধারণা হল তিনি ইতিমধ্যে মারাই গিয়েছেন; সবাই নতুন সম্রাটকে অভিনন্দন জানাতে ছুটল।

সম্রাট কিন্তু মরেন নি। অবিশ্যি নিশ্বাস একরকম বন্ধ হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে বুকের উপর কিসের বোঝা। চোখ খুলে দেখেন, মৃত্যু এসে বুকে চেপে বসেছে! তার মাথায় সম্রাটের মুকুট, এক হাতে সোনার তলোয়ার, অন্য হাতে সম্রাটের কারুকার্য করা পতাকা। খাটের চারধারের পুরু মখমলের পরদার তলা দিয়ে অদ্ভুত দেখতে কাদের মাথা উঁকি মারছে, কারও মুখ বেজায় বিটকেল, কারও মুখ কি কোমল, কি সুন্দর! সারা জীবন ধরে সম্রাট যত মন্দ কাজ, ভালো কাজ করেছেন, তারাই এখন ওরকম চেহারা ধরেছে! তারা সবাই এখন ওঁর দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে আর বুকের উপরে বসে আছে মৃত্যু।

তারা ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছিল, 'এ কথা জানতে?' 'সে কথা মনে আছে?' তার পর সবাই মিলে তাঁকে এমনি দোষ দিতে লাগল যে, তাঁর সারা কপালে ঘাম দেখা দিল।

সম্রাট বলে উঠলেন, "এমন ব্যাপার তো আমার আদৌ জানা ছিল না! কোথায় গেল বাজনদাররা, চীন দেশের বড়ো ঢাক বাজুক, এদের কথা চাপা পড়ে যাক!"

তারা কিন্তু থামল না, বলেই চলল আর মৃত্যু চীনে কায়দায় মাথা নেড়ে সব কথায় সায় দিতে লাগল। সম্রাট বললেন, "কোথায় গান-বাজনা? ওগো আমার এত আদরের কলের পাখি, অনুনয় করছি একটি গান কর! তোমাকে কত সোনাদানা ধনরত্ন দিয়েছি, তোমার গলায় আমার সোনার চটি ঝুলিয়েছি, একবারটি গাও, গাও একবার!"

কিন্তু পাখি তবু চুপ করে রইল। কাছে পিঠে কেউ নেই কে-বা চাবি ঘোরাবে, আর চাবি না দিলে কেমন করে গাইবে? কোটরে বসা চোখ দিয়ে মৃত্যু রাজার দিকে চেয়ে রইল! চারদিক চুপচাপ; সে কি ভয়ংকর রকম চুপ।
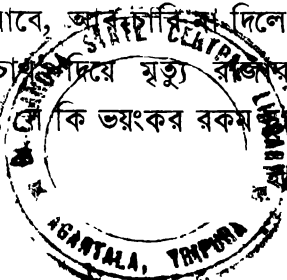
হঠাৎ জানলা দিয়ে মধুর গান শোনা গেল। সত্যিকার ছোটো নাইটিঙেল বাইরে গাছের ডালে বসে গাইছে! সম্রাটের গুরুতর অসুখের খবর তার কানে গেছে; সে এসেছে তাঁকে সান্ত্বনার কথা, আশার কথা শোনাতে। যেমন পাখি গাইতে লাগল, ভুতুড়ে চেহারাগুলো ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল, সম্রাটের ক্ষীণ দেহের শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত আরো জোরে বইতে লাগল। স্বয়ং মৃত্যু কান পেতে গান শুনে বলল, "গাও, গাও, ছোটো নাইটিঙেল, আরো গাও।"

"বল, আমাকে ঐ সুন্দর সোনার তলোয়ারটি দেবে? ঐ রঙচঙে পতাকা দেবে, সম্রাটের মুকুট দেবে?"

একটা গানের বদলে মৃত্যু তখন তাকে সব দিয়ে দিল। আর নাইটিঙেল পাখি গলা খুলে গাইতে লাগল। কি না গাইল পাখি, নীরব শান্তি ভরা সমাধিস্থানের কথা, সেখানে সাদা গোলাপ ফোটে; মাধবীফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করে; সেখানকার কচিশ্যামল ঘাস যারা মারা গেছে তাদের প্রিয়জনের চোখের জলে ভেজা। তাই শুনে তার নিজের বাগানের জন্য মৃত্যুর মন কেমন করে উঠল, একটা ঠাণ্ডা সাদা ছায়ার মতো খোলা জানলা দিয়ে সে উড়ে চলে গেল।

সম্রাট বললেন, "ছোটো পাখি, তোমাকে শত-শত ধন্যবাদ। রাজ্য থেকে তোমাকে তাড়িয়ে দিলাম আর তুমি কি-না গান গেয়ে আমার বিছানার চারপাশ থেকে বিকট মুখগুলো তাড়ালে, বুকের উপর থেকে মৃত্যুকে নামালে। কি দিয়ে তোমাকে পুরস্কৃত করি বল তো!"

নাইটিঙেল বলল, "সম্রাট, আপনি তো আমার পুরস্কার দিয়েইছেন। সেই প্রথমবার যখন আপনাকে গান শুনিয়েছিলাম, ঠিক তখনকার মতো আজ আবার আপনার চোখে জল

দেখলাম। ও কি আমি ভুলতে পারি? গায়কের কাছে ঐ চোখের জল যে অমূল্য রত্নের মতো, তাতে কি আরাম, কি আনন্দ! কিন্তু এখন আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। যখন ঘুম থেকে উঠবেন, শরীর কেমন তাজা, সুস্থ মনে হবে। আমি গান গেয়ে আপনাকে ঘুম পাড়াচ্ছি।"

পাখি গাইতে লাগল, সম্রাটও মধুর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। কি মৃদু, কি সুন্দর সে ঘুম; তাতে শরীর সারে।

জানলা দিয়ে ঘরে রোদ এলে, সম্রাটের ঘুম ভাঙল। অনুচররা কেউ ফিরে আসে নি; সবাই ভেবেছে সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে। শুধু নাইটিঙেল পাখি তখনো বসে বসে গান গাইছে।

সম্রাট বললেন, "পাখি, তুমি সর্বদা আমার কাছে থেকো। যখন ইচ্ছা হবে তখন গান গেও। ঐ নকল পাখিটাকে হাজার টুকরো করে ভেঙে ফেলি।"

নাইটিঙেল বলল, "তা করবেন না, সম্রাট। ওর যথাসাধ্য ও করেছে, ওর যত্ন করুন! প্রাসাদে আমার থাকা হবে না, কিন্তু যখন খুশি আমাকে আসতে অনুমতি দিন। সন্ধ্যাবেলায় জানলার কাছে গাছের ডালে বসে আপনাকে গান শোনাব, তাতে আপনার আনন্দও হবে, কত বিষয়ে চিন্তাও করবেন। আমি সুখের কথা গাইব, দুঃখের কথাও গাইব; ভালো মন্দ যে কথা আপনাকে জানতে দেওয়া হয় না, সব আমি গান গেয়ে শোনাব। আপনার এই ছোটো গানের পাখি জেলেদের কুঁড়ে ঘরে যাবে; চাষীদের কুটিরে যাবে; তারা আপনার কাছ থেকে আপনার সভাঘর থেকে কত দূরে থাকে তাদের সবার কাছে যাবে। আপনার মুকুটের চেয়েও আপনার হৃদয়টিকে আমি বেশি ভালোবাসি। কিন্তু মুকুটেরও কি সুন্দর পবিত্র ভাব। আমি আসব, এসে গান শোনাব। কিন্তু একটি কথা দিতে হবে সম্রাট।"

সম্রাট বললেন, "যা চাও তাই হবে।" তার পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বহুমূল্য সাজ-আভরণ নিজের হাতে পরে, সম্রাটের গৌরবে দেখা দিলেন, সোনার কাজকরা ভারী তলোয়ারটি বুকের কাছে তুলে ধরলেন।

পাখি বলল, "কথাটি হল, আপনার ছোটো পাখির কথা কাউকে জানতে দেবেন না, তা হলেই সব মঙ্গলমতো চলবে।" এই বলে নাইটিঙেল উড়ে গেল।

তার পর মৃত সম্রাটকে দেখবার জন্য অনুচররা এল। সম্রাট বললেন, "সুপ্রভাত!"

সম্রাটের নতুন পোশাকের কথা

অনেককাল আগে এক সম্রাট ছিলেন, তিনি এতই সাজতে-গুজতে ভালোবাসতেন যে তার সব টাকা-কড়ি কাপড়-চোপড় কিনতেই শেষ হয়ে যেত। এদিকে সেপাই-সান্ত্রীদের কি হাল হল তাই নিয়ে এতটুকু মাথা ঘামাতেন না। থিয়েটারে কিম্বা শিকারে যদি-বা যেতেন, তাও শুধু লোককে তাঁর নতুন পোশাক-আশাক দেখাবার জন্য। দিনের মধ্যে ঘড়ি-ঘড়ি তিনি সাজ বদলাতেন। অন্য রাজা-রাজড়ার বিষয়ে যেমন বলা হয়, 'মহারাজ মন্ত্রণাসভায় বসেছেন।' এঁর বিষয়ে তেমনি লোকে বলত, 'সম্রাট কাপড় ছাড়ার ঘরে বসে আছেন!'

মস্ত শহরে তাঁর রাজধানী, সেখানে আমোদআহ্লাদে লোকের সময় কাটত, কাজেই রাজসভায় নিত্যনতুন আগন্তুক আসত। একবার দুটো মহা দুষ্টু জোচ্চোর এসে বলল, তারা কাপড় বোনে, সে এমনি চমৎকার সব রঙের আর জমকালো সব নক্সার কাপড় যে ভাবা যায় না। তার উপর সে কাপড়ের নাকি একটা আশ্চর্য গুণ আছে, যারা নিজেদের পদের অযোগ্য, কিম্বা যারা আহাম্মুক, তারা কেউ ও-কাপড় চোখেই দেখতে পায় না।

শুনেই সম্রাটের মনে হল, 'তবে তো ঐ কাপড়ের খাসা পোশাক হয়! সেরকম পোশাক আমার যদি থাকত, অমনি

টের পেতাম আমার রাজ্যে কারা কারা তাদের পদের অযোগ্য, কারা কারা আহাম্মুক, কারা চালাক। তা হলে এখনি ঐরকম কাপড় আমার জন্যে বোনা হোক।'

তখন দুই তাঁতীকে ডেকে মেলা টাকা-কড়ি দেওয়া হল, যাতে কাজ শুরু করতে দেরি না হয়। কয়েক দিন কাটল। তার পর সম্রাট ভাবলেন, 'এবার তা হলে একবার গিয়ে দেখতে হয় কাপড় বোনার কতদূর হল।' সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, যারা আহাম্মুক, কিম্বা যারা নিজেদের পদের অযোগ্য, তারা কেউ তো ও কাপড় চোখে দেখতে পাবে না। সম্রাটের একটু যেন কেমন কেমন লাগল।

মনে মনে বললেন, 'তাই বলে আমার নিজের কোনো ভয় নেই, কিন্তু ব্যাপারটাতে নাক গলাবার আগে, আর কাউকে পাঠিয়ে দেখাই উত্তম বলে মনে হচ্ছে।'

এদিকে শহরসুদ্ধ সব্বাই ঐ কাপড়ের আশ্চর্য গুণের কথা শুনেছিল। আর সকলের মনেই বেজায় কৌতূহল, তাদের পাড়ার লোকেরা সবাই চালাক, না বোকা, না কি!

খানিক চিন্তা করে সম্রাট বললেন, "বুড়ো মন্ত্রীমশাই তো খুব বিশ্বাসী লোক, তাকেই পাঠান যাক। কাপড়ের গুণ তাঁর মতো আর কে-ই বা বুঝবে? তা ছাড়া ওঁর কত বুদ্ধি বিবেচনা, ওঁর মতো যোগ্য ব্যক্তি আর কোথায় আছে!"

অগত্যা বুড়ো মন্ত্রীমশাই গেলেন যে-ঘরে সেই দুই ধড়িবাজ বসে শূন্য তাঁতে প্রাণপণে কাজ করছিল। তাই না দেখে বুড়ো মন্ত্রীর চক্ষু চড়কগাছ। 'এর মানেটা কি? তাঁতে এক চিলতে সুতোও দেখতে পাচ্ছি না কেন।' তাই বলে অবিশ্যি মুখে কিছু বললেন না।

দুই জোচ্চোর খুব খাতির করে তাঁকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা

করল নক্সা পছন্দ কি না, রঙ ভালো হল কি না। এই-সব জিজ্ঞাসা করে, আর শূন্য তাঁতের দিকে দেখায়! বেচারা মন্ত্রী-মশাই খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেও তাঁতে কিছু দেখতে পেলেন না। অবিশ্যি তার একটা উত্তম কারণও ছিল, যেহেতু তাঁতে কিছুই ছিল না যে দেখবেন!

মন্ত্রী ভাবলেন, 'অ্যাঁ! এও কি সম্ভব যে আমি একটা আহাম্মুক? আগে তো কখনো সেরকম মনে হয় নি। আর তাই যদি হয়েই থাকি, সে কথা তো কাউকে জানান চলবে না। নাকি আমি আমার পদের অযোগ্য? তাও তো লোকের কাছে বলা যায় না। নাঃ, কাপড়টা যে চোখে দেখতে পাচ্ছি না, সে কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করব না।'

কাজের ভান করতে করতে এক ব্যাটা বলল, "কই, মন্ত্রী-মশাই, কাপড় পছন্দ হল কি না, কিছু বলছেন না যে?" চোখে চশমা এঁটে তাঁতের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রী বললেন, "বাঃ! চমৎকার হয়েছে! যেমনি নকশা, তেমনি রঙ! যাই, সম্রাটকে এখনি বলে আসি যে আমার মতে কাপড় বড়োই উৎকৃষ্ট।"

দুষ্টু লোক দুটো বলল, "তা হলে আমরা অতিশয় বাধিত হই।" এই বলে সেই নেই-কাপড়ের রঙের নাম, নকশার বিবরণ, ইনিয়ে-বিনিয়ে বিস্তারিত বলল। মন্ত্রীমশাই কান খাড়া করে সব শুনে নিলেন যাতে সম্রাটের কাছে হুবহু বর্ণনা দিতে পারেন। শেষে তাঁতীরা আরো কিছু রেশমী সুতো, সোনার তার চেয়ে নিল, কাজ শেষ করতে নাকি ও-সব লাগবে। যা পেল তার সবটাই অবিশ্যি পত্রপাঠ নিজেদের থলিতে ভরে ফেলল। তার পর শূন্য তাঁতে আবার খুব যত্ন করে কাজে বসে গেল।

এর পরে সম্রাট আরেকজন সভাসদকেও পাঠিয়েছিলেন, কদ্দূর কি হল, কবে নাগাদ শেষ হবে, এই-সব জেনে আসতে। সে লোকটারও মন্ত্রীমশায়ের দশা হল। ঘুরে ফিরে তাঁত পরীক্ষা করে সেও খালি কাঠামো ছাড়া কিছুই ছাই দেখতে পেল না। লোকদুটোর রকম-সকম দেখে মনে হল যেন তারা কতই কাপড় বুনছে। তারা বলল, "কি মশায়, মহামান্য মন্ত্রী-বরের মতো আপনারও কি কাপড় পছন্দ হল?" এই বলে আবার তারা কাপড়ের মন-গড়া রঙ আর নকশার বর্ণনা দিল।

সভাসদ ভাবল, 'আহাম্মুক নই, এটা ঠিক। তবে কি আমি আমার এই লাভের পদের যোগ্য নই নাকি? সে তো বড়োই অদ্ভুত কথা! যাই হোক গে, কাউকে কিছু বলা হবে না।' তখন সে-ও ঐ অ-দেখা কাপড়ের তারিফ করে বলল যে, "রঙ নকশা, দুই-ই খাসা।" তার পর সম্রাটের কাছে ফিরে গিয়ে

বলল, "সম্রাট বাহাদুর, ওরা যে কাপড় বুনছে, তার তুলনা নেই।"

সম্রাট নিজের খঁরচায়-ফরমায়েসী কাপড় করাচ্ছেন, শহর-সুদ্ধ সবাই তাই নিয়ে বলাবলি করতে লাগল।

এতদিন পরে সম্রাটের শখ হল তাঁতে-চড়া অবস্থাতে তিনিও ঐ বহুমূল্য কাপড় দেখে আসবেন। কয়েকজন বাছাই করা সভাসদ সঙ্গে নিয়ে—তাঁদের মধ্যে আগে যাঁরা কাপড় দেখে তারিফ করেছিলেন সে দুই মহোদয়ও ছিলেন—সম্রাট গেলেন জোচ্চোর দুটোর কাছে। যেই তারা টের পেল স্বয়ং সম্রাট এসেছেন, অমনি তারা যেন কতই-না কাজে ডুবে রইল। অবিশ্যি আসলে একটা সুতোও চালান হল না। আগেকার দুই মহোদয় বললেন, "কি অপূর্ব কাজ দেখেছেন? একবার একটু তাকিয়ে দেখুন, সম্রাট, কি-বা নকশার চাতুরি, কি-বা রঙের বাহার!" এই বলে তাঁরাও সেই শূন্য কাঠামো দেখাতে লাগলেন। মনে মনে তাঁদের ধারণা—আর সবাই নিশ্চয়ই কারিগরদের অপূর্ব কাজ দেখতে পাচ্ছে।

সম্রাট এদিকে মনে মনে বললেন, 'এ আবার কি হল? আমি যে ছাই কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে। তবে কি আমি একটা আহাম্মুক, নাকি আমার পদের অযোগ্য? এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে?'—"ওহে, খাসা কাপড় বুনেছ! তোমাদের শিল্পকর্ম আমি সমূহ অনুমোদন করছি।" এই বলে প্রসন্ন হেসে সম্রাট চোখ বাগিয়ে শূন্য তাঁতটি দেখতে লাগলেন। দু-দুজন সভাসদ যে জিনিসের এত প্রশংসা করল, সেই জিনিস তিনি মোটে চোখেই দেখতে পাচ্ছেন না, এ কথা তো কোনো-মতেই স্বীকার করা যায় না।

এদিকে অনুচররাও তাকিয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল,

যদি কিছু দেখতে পায়, কিন্তু সে গুড়ে বালি! তা হোক গে, তবু তারা একবাক্যে বলে উঠল, "আহা! কি সুন্দর!" সবাই মিলে সম্রাটকে পরামর্শ দিল যে, কয়েকদিন পরেই শোভাযাত্রা হবে, তখন সম্রাট যেন এই নতুন পোশাক পরে বাহার দেন। চার দিক থেকে রব উঠল, 'চমৎকার! খাসা! এমন হয় না!' সকলের মনেই যেন একটা অস্বাভাবিক রকমের ফুর্তি, সম্রাটেরও।

ধড়িবাজ দুটোকে তিনি সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়ে ভূষিত করলেন। জামার বোতামে আঁটবার জন্য রঙ-চঙে রেশমী ফিতে আর 'সম্ভ্রমশালী তন্তুবায়' উপাধি দান করে ফেললেন।

শোভাযাত্রার আগের দিন দুই জোচ্চোর ষোলোটা বাতি জ্বেলে, সারারাত জেগে কাটাল, যাতে সবাই দেখতে পায় সময়-মতো সম্রাটের পোশাক শেষ করতে তারা কত-না ব্যস্ত! ভাব দেখাতে লাগল যেন এই তাঁত থেকে কাপড় নামাল, এই শূন্যে কাঁচি চালিয়ে জামা কাটা হল, এই বিনি-সুতোর ছুঁচ দিয়ে সেই জামা সেলাই হল! অবশেষে তারা বলল, "এই দেখুন মশাইরা, সম্রাটের পোশাক প্রস্তুত!"

তার পর সভার হোমরা-চোমরাদের নিয়ে সম্রাট এলেন। তাঁতীরা শূন্যে খালি হাত তুলে যেন কত কি দেখাল। সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, "এই নিন সালোয়ার, এই গায়ের শাল, এই ধরুন জোব্বা! সমস্ত কাপড়-চোপড় মাকড়সার জালের মতো হাল্কা, গায়ে দিলে মনে হবে কিছুই পরা হয় নি। সেই-খানেই তো কাপড়ের আসল গুণ!"

সভাসদরা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই, তা তো বটেই!" যদিও কেউ একগাছি সুতো পর্যন্ত চোখে দেখতে পাচ্ছিল না। তখন লোক দুটো বলল, "এবার সম্রাট যদি

অনুগ্রহ করে আয়নার সামনে এসে কাপড় ছাড়েন, তা হলে নতুন পোশাক পরিয়ে দিই।”

সম্রাট অমনি কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেললেন; আর জোচ্চোর দুটো তাঁকে নতুন পোশাক পরাবার ভান করতে লাগল। সম্রাটও এ-পাশ ও-পাশ ঘুরতে ফিরতে লাগলেন, যেন আয়নায় তাঁর নতুন পোশাকের বাহার দেখছেন।

সবাই চ্যাঁচাতে লাগল, ‘বাঃ, বাঃ, নতুন পোশাক পরে সম্রাটকে কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে! গায়ে কেমন খাপে খাপে বসেছে! আহা, কি নকশা, কি রঙ! একেই বলে রাজার যোগ্য পোশাক!’

প্রধান উদ্‌গাতা ঘোষণা করলেন, “শোভাযাত্রার সময় হল! সম্রাটের ছত্রধররা অপেক্ষা করছে!”

সম্রাট বললেন, “আমিও প্রস্তুত। আমার নতুন পোশাক গায়ে ঠিক লেগেছে তো?” এই বলে আরেকবার আয়নার সামনে ঘুরলেন ফিরলেন, যেন পোশাক দেখছেন।

শয়ন-মন্দিরের যাঁরা কর্মাধ্যক্ষ, তাঁদের কাজ সম্রাটের পোশাকের মাটিতে লুটান ঝালরটি তুলে ধরা। তাঁরা কেউ ছাই কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, তবু মাটি খামচে কি যেন তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলেন। তাঁরা কেউই মানতে রাজি নন যে, হয় তাঁরা আহাম্মুক, নয় তাঁদের পদের অযোগ্য।

এইভাবে রাজধানীর রাজপথ দিয়ে, উঁচু রাজছত্রের নীচে, সম্রাট শোভাযাত্রা করে চললেন। যারা পথে দাঁড়িয়ে ছিল আর যারা পথের ধারের জানলায় ভিড় করেছিল, তারা সবাই গলা ছেড়ে চ্যাঁচাতে লাগল, ‘সম্রাটের নতুন পোশাকের কি বাহার! আহা, ঝালরটি কি চমৎকার! শালের ঝুলটি কি মানিয়েছে!’ এক কথায় বলতে গেলে কেউ মানতে রাজি

নয় যে, পোশাক-টোশাক কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। মানলেই তো সবাই জানবে হয় তারা আহাম্মুক, নয় তাদের পদের অযোগ্য! সম্রাটের এত কাপড়-চোপড়ের কোনোটাই এবারের মতো আলোড়নের সৃষ্টি করে নি, এটা নিশ্চিত!

হঠাৎ একটা ছোটো ছেলে বলে উঠল, "ও কি! সম্রাটের যে খালি গা!" তার বাপ বলল, "শোন, শোন, সরল মুখের

কথা শোন !” অমনি কথাটা চার দিকে রটে গেল। অবশেষে সবাই বলতে লাগল, “আরে তাই তো! সম্রাটের যে খালি গা!” ততক্ষণে সম্রাট নিজেও বুঝেছেন কথাটা ঠিক, বেজায় বিরক্তও হয়েছেন। তবু তাঁর মনে হল যে, তাই বলে শোভা-যাত্রা বন্ধ করা যায় না। আর শয়ন-মন্দিরের কর্মাধ্যক্ষরাও অতি যত্ন-সহকারে ঝালরটি তুলে নিয়ে চললেন, অবিশ্যি ঝালর বা পোশাক-টোশাক আসলে কিছুই ছিল না।

কদাকার হাঁস-ছানার কথা

তখন পাড়াগাঁয়ে কি সুন্দর সময়! গ্রীষ্মকাল, গম পেকে হলুদ, যবের রঙ সবুজ, সবুজ মাঠের ধারে খড়ের গাদা, লাল লম্বা ঠ্যাং নিয়ে সারস চার দিকে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে আর বিড়্ বিড়্ করে মায়ের কাছে শেখা মিশরী বুলি ঝাড়ছে! খেত মাঠ ঘিরে ঘন বন। পাড়াগাঁ কি যে সুন্দর! একটা প্রকাণ্ড পুরনো বাড়ির উপর উষুম-উষুম রোদ পড়েছে, বাড়ির চারধারে গভীর খাল। বাড়ির দেয়াল থেকে জলের কিনারা পর্যন্ত বড়ো-বড়ো পাতা নিয়ে বুনো ঝোপ এমনি উঁচু হয়ে উঠেছে যে তার মধ্যে একটা ছোটো ছেলে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেও ঠাওর হয় না।

কি জঙ্গল জায়গাটাতে, যেন ঘন বনের মধ্যিখানটি! এদিকে কেউ বড়ো-একটা আসে না, সেইজন্যেই একটা হাঁস বেছে বেছে এইখানে বাসা বেঁধেছিল। এখন সে ডিমে বসে তা দিচ্ছিল, কিন্তু প্রথম প্রথম যে ফুর্তি লাগছিল, এখন আর সেরকম লাগছে না, কাঁহাতক এক জায়গায় এতক্ষণ ঠায় বসে থাকা যায়! দেখা করতেও বড়ো একটা কেউ আসে না, ছাই! ওর সঙ্গে গল্প না করে বরং সবাই মজা করে খালে-বিলে সাঁতরে বেড়াচ্ছে!

শেষপর্যন্ত ডিমগুলো সত্যি ফুটল। একটার পর একটা ক্ষুদে মুণ্ডু দেখা দিল। হাঁস বলল, “প্যাঁক-প্যাঁক!” অমনি বাচ্চাগুলো যেমন তেমন করে উঠে পড়ে, সবুজ পাতার নীচে থেকে উঁকি মেরে দেখতে লাগল!

একটা বাচ্চা বলল, “আরি বাপ! পৃথিবীটা কী বড়ো!” মা-হাঁস বলল, “এইটুকু দেখেই পৃথিবী ভাবলি নাকি? আরে, এ বাগানের ওধারের সীমানার ওপারে অনেক দূর পর্যন্ত, একেবারে পাদ্রীর মাঠ অবধি পৃথিবীটা ছড়িয়ে আছে! অবিশ্যি আমি নিজে অদ্দূর যাই নি। ওরে, তোরা সবাই আছিস্ তো?”

বলেই হাঁস উঠে পড়ল। “কই, না তো, সবাই তো হেথা নেই। সবার বড়ো ডিমটাই যে বাসায় রইল! কি জ্বালা? এ আর কত দিন চলবে, বাপু। আমি তো একেবারে হাঁপিয়ে উঠলাম।” এই বলে মা-হাঁস আবার গিয়ে বাসায় উঠল। বুড়ি-হাঁস দেখা করতে এসে বলল, “কিগো, চলছে কেমন?” মা-হাঁস বলল, “এই একটা ডিমের জন্যেই যা দেরি হচ্ছে; এ যে আর ফোটেই না! কিন্তু অন্য বাচ্চাগুলোকে যদি একবার দেখতে! জন্মে কখনো আমি এমন সুন্দর হাঁসের ছানা দেখি নি!”

বুড়ি-হাঁস বলল, “ওটা নির্ঘাৎ পেরুর ডিম। আমি নিজে একবার ঐরকম ঠকেছিলাম; তার পর বাচ্চাগুলোকে নিয়ে সে যে কি ঝামেলা! জলে যেতে ভয় পেত! হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই জলের ধার কাছে নিয়ে যেতে পারতাম না। কত ডাকাডাকি বকাবকি করতাম, কোনো ফল হত না। দেখি তো একবার ডিমটাকে। হুঁ, যা বলেছি! ও পেরুর ডিম না হয়ে যায় না! ওটা থাক্ গে, তুমি বরং অন্যগুলোকে সাঁতার শেখাও।”

মা-হাঁস বলল, “আরেকটু বসেই দেখি-না, এমনিতেই এত

দিন ঠায় বসে আছি, ফসল-কাটার শেষপর্যন্তই নাহয় এখানে কাটালাম !”

“যা ইচ্ছা কর ! তাতে আর আমার কি !” এই বলে বুড়ি-হাঁস হেলেদুলে চলে গেল।

শেষপর্যন্ত বড়ো ডিমটা ফুটল। বাচ্চাটা ‘চ্চিক্, চ্চিক্’ শব্দ করে খোলার ভিতর থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল। কিন্তু মাগো ! কি মস্ত আর কি কদাকার দেখতে ! মা-হাঁস তার দিকে তাকিয়ে রইল। শেষটা বলল, “এটা কি ষণ্ডা-গুণ্ডা রে বাবা ! অন্যগুলোর একটাও তো একটুও এমন ধারা নয়। তবে কি এটা একটা পেরুর পুরুষ-বাচ্চা নাকি ? বেশ, একটু বাদেই দেখা যাবে। তবে জলে ওকে নামতেই হবে ; নিজের হাতে ঠেলেঠুলে নামাতে হয় তো তাই সই।”

পরদিন চমৎকার দিন করেছিল ; সমস্ত সবুজ পাতার উপর নরম গরম রোদ। এমন সময় মা-হাঁস সব কটা ছানাপোনা নিয়ে খালের দিকে চলল। সেখানে পৌঁছেই টুপ করে মা জলে
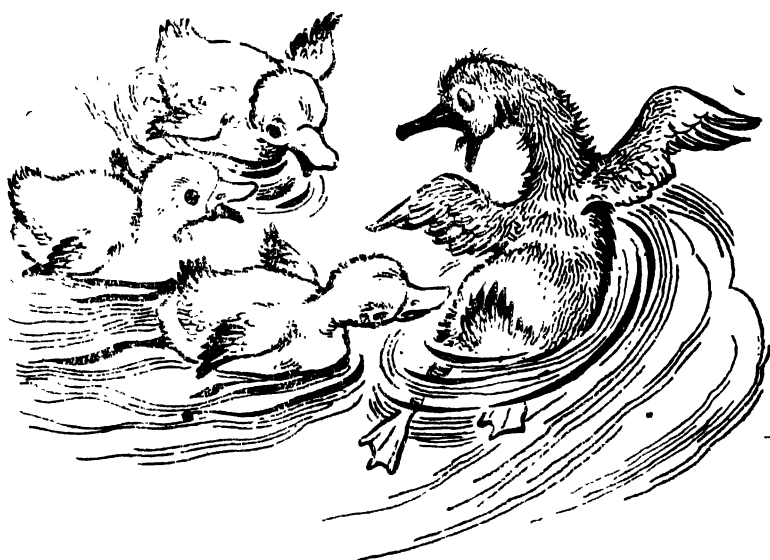
নামল। তার পর প্যাঁক-প্যাঁক করে ডাক দিতেই, বাচ্চাগুলোও একটার পর একটা জলে ঝাঁপ দিল। প্রথমে মাথাগুলো জলের নীচে তলিয়ে গেল, তার পরেই আবার ভেসে উঠল, সবাই দিব্যি সহজে সাঁতার দিতে লাগল। সব কটা বাচ্চাই, কদাকার ছাই রঙেরটাও। মা-হাঁস বলল, "মোটেই পেরু নয়; আহা! একবার খালি তাকিয়ে দেখতে হয় বাছার কি চমৎকার ঠ্যাং নাড়ার ঢঙ, কেমন সোজা হয়ে ভাসা! এটা আমার নিজের ছানা, ভালো করে নজর দিলে বোঝা যায় যে দেখতেও খাসা! প্যাঁক-প্যাঁক! আয় আমার সঙ্গে, তোদের দুনিয়া দেখাই চল্। কিন্তু কাছে কাছে থাকিস বাছারা, নয়তো কে কোথায় মাড়িয়ে দেবে; তাছাড়া বেড়াল সম্বন্ধে সাবধান!"

যে উঠোনে পাতি-হাঁসরা থাকত, ওরা সেখানে গিয়ে পোঁছল। গিয়ে দেখে কি-না একটা বান-মাছের কাঁটা নিয়ে দুই পরিবারে ঝগড়া বেধেছে। সেটাকে শেষে বেড়ালে নিল।

মা-হাঁস নিজেও মাছ-পোড়া ভালোবাসত, ঠোঁট মুছে সে বলল, "দেখলি তো বাছারা, এই হল দুনিয়ার দস্তুর। এখন পা চালা দিকি, ঐ যে হোথা বুড়ি-হাঁস, ওকে নমো করিস্। এখানে যত পাখি দেখছিস্, ও-ই হল সবার সেরা, হিস্পানী বংশ ওদের, তাইতে অমন হোমরা-চোমরা চেহারা, অমন আদব-কায়দা। ওর ঠ্যাঙে কেমন লাল ন্যাকড়া বাঁধা দেখেছিস? সবাই বলে ঐটে নাকি ভারি সুন্দর, ওর চাইতে বড়ো সম্মান হাঁস-জগতে আর হয় না।"

উঠোনের অন্য হাঁসরা ওদের দিকে চেয়ে থেকে, জোরে জোরে বলাবলি করতে লাগল, "ঐ দেখ, আঁরেক গুষ্টি এলেন! যেন এখানে এমনিতেই যথেষ্ট লোক নেই! আরে ছি! ছি! ঐটা কি কদাকার গো! ওটাকে থাকতে দেব না!" যেই-না

বলা, অমনি একটা হাঁস সেই বাচ্চাটার দিকে তেড়ে গিয়ে, দিল তার গলায় এক কামড়। মা-হাঁস বলল, "ওকে কিছু বল না, ও কারো কোনো ক্ষতি করছে না।"

"তা হতে পারে, কিন্তু ব্যাটা বেজায় বড়ো আর দেখতে কি অদ্ভুত!" ঠ্যাঙে লাল ন্যাকড়া বাঁধা বুড়ি-হাঁস বলল, "ঐটে বাদে মা-লক্ষ্মীর ছেলেমেয়েরা সবাই ভালো দেখতে, ঐটে তেমন সুবিধার হয় নি। ওটাকে আরেকবার ডিম থেকে ফুটিয়ে তুলতে পারলে বেশ হত।"

মা-হাঁস বলল, "দেখতে সুন্দর নয় সে কথা ঠিক, কিন্তু বড়ো লক্ষ্মী ছেলে, অন্যগুলোর মতোই সাঁতার কাটতে পারে, বরং ওদের চেয়েও ভালো কাটে! মনে হয় সময়কালে ও-ও অন্যদের মতোই হয়ে উঠবে, তখন হয়তো আরো ছোটো দেখাবে।" এই বলে মা বাচ্চাটার গলা চুলকিয়ে দিল, সারা গায়ে ঠোঁট বুলিয়ে দিল। তার পর আবার বলল, "তা ছাড়া ও হল পুরুষ-বাচ্চা, আমার বিশ্বাস ওর গায়ে খুব জোর হবে, কাজেই গায়ের জোরেই দিব্যি চালিয়ে নেবে!"

বুড়ি-হাঁস বলল, "বাঃ, অন্যগুলি তো ভারি সুন্দর। এসো, এখানে গুছিয়ে বস আর মাছের মুড়োটুড়ো পেলে, আমাকে দিতে পার।"

কাজেকাজেই ওরা বেশ গুছিয়ে বসল।

কিন্তু ঐ যে বেচারা সবার শেষে ডিম থেকে ফুটে বেরিয়েছিল আর দেখতে বেজায় কদাকার ছিল, তাকে সমস্ত হাঁস মুরগিরা কামড়িয়ে, ঠুকরিয়ে, জ্বালিয়ে খেত। এদিকে পেরুদের দলের পাণ্ডা, জন্মেইছিল ঘোড়সওয়ারদের মতো পায়ের গোড়ালিতে কাঁটা পরে, সে তো পাল-তোলা জাহাজের মতো ফুলে ফেঁপে, রাগে মুখ লাল করে, বাচ্চাটার দিকে গটমট করে

এগিয়ে এল। সে বেচারা কি যে করবে ভেবেই পেল না ; তার চেহারাটা এত বিশ্রী বলে সে এমনিতেই বেজায় অপ্রস্তুত !

এইভাবে তো প্রথম দিনটি কাটল ; তার পর থেকে দিনে দিনে অবস্থা আরো খারাপ হতে লাগল। ভাইবোনরাও ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত, খালি খালি বলত, "ওরে বিটকেল ! তোকে বেড়ালে নেয় না কেন !" মা পর্যন্ত বলত, "বাছা, তুই যদি দূরে কোথাও চলে যেতিস্, তবেই যেন ভালো হত।"

হাঁসরা ওকে কামড়াত, মুরগিরা ঠোকরাত, যে মেয়েটা ওদের খাবার দিত, সে ওকে লাথি মারত। বেচারা ছুটে বেড়ায় ঝোপে গিয়ে ঢুকল ; সেখানকার ছোটো পাখিরা ওকে দেখে ভয়েই আধমরা ! হাঁসের ছানা ভাবল, 'এর কারণ, আমি বড়ো বিশ্রী দেখতে !' এই মনে করে সে ছুটছে তো ছুটছে। শেষটা একটা মস্ত জলা জায়গাতে এসে পৌঁছল। সেখানে কতগুলো বুনো হাঁস থাকত। সেইখানেই সে সারারাত পড়ে রইল, শরীরে কি যে ক্লান্তি, কোথাও এতটুকু আরাম নেই। সকালে বুনো হাঁসরা উঠে পড়েই তাদের নতুন সঙ্গীটিকে দেখতে পেল। তারা জানতে চাইল, "বলি, তুমি কে ?" হাঁসছানা তাদের সঙ্গে যতটা পারে ভদ্রভাবেই কথা বলল।

ওরা বলল, "তুমি সত্যিই বড়ো কদাকার হে, অবিশ্যি তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না, যদি-না আমাদের বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে চাও।"

হাঁস বেচারা বিয়ে-থার কথা কখনো ভাবেও নি। তার একমাত্র ইচ্ছা ঐখানে নল-খাগড়ার মধ্যে পড়ে থাকবে আর বিলের জল খাবে। তাই সে রইল পুরো দুটি দিন। তৃতীয় দিন দুটি ছাই রঙের বুনো হাঁস এসে উপস্থিত। তারা খুব বেশি দিন ডিম ফুটে বেরোয় নি, কাজেই বড়ো বেয়াদব।

তারা বলল, "ওরে ব্যাটা শোন্, তোর চেহারাটি এমনি হতকুচ্ছিৎ যে তোকে আমাদের বেড়ে পছন্দ! আসবি নাকি আমাদের সঙ্গে? কাছেই আরেকটা বিল আছে, সেখানে কয়েকটা লক্ষ্মী মিষ্টি বুনো হাঁস থাকে। যেখানে যত হাঁস হিশ্‌শ্‌ হিশ্‌শ্‌ করে ডাক ছাড়ে, তাদের সক্কলের মধ্যে ওদের চেয়ে সুন্দর আরেকটি বার কর দিকিনি! এবার তোর কপাল খুলে যাবে রে, ব্যাটা, তা কুচ্ছিৎ হোস্, আর যাই হোস্!"

ঠিক সেই সময় দুম্ করে একটা বন্দুকের শব্দ হল আর দুটো হাঁসই মরে পা ছড়িয়ে নল-খাগড়ার বনের মধ্যে পড়ল। দুম্ করে আবার বন্দুকের শব্দ হল, এক ঝাঁক বুনো হাঁস অমনি জল ছেড়ে উঠে পড়ল। তার পরেই আবার বন্দুকের আওয়াজ।

সেদিন শিকারীদের মস্ত এক দল বেরিয়েছিল। চারধারে এখানে ওখানে শিকারীরা লুকিয়ে বসেছিল; কেউ কেউ আবার গাছেও চড়েছিল। গাছগুলোর ডালপালা লম্বা হয়ে বিলের জলের উপরে ঝুলছিল। এক পাল কুকুর কাদার মধ্যে নেমে, চারদিকে নল-খাগড়ার বন ভেঙে, নুইয়ে, জল ছিটিয়ে, পাখি খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হাঁসের ছানা বেচারি তো ভয়েই আধমরা! ডানার তলায় মুণ্ডু লুকোবে ভেবে যেই না মাথা ঘুরিয়েছে, অমনি একটা হিংস্র চেহারার কুকুর তার একবারে কাছে এসে দাঁড়াল! কুকুরটার এতখানি জিব বেরিয়ে আছে, দু চোখ যেন আগুনের ভাঁটা! হাঁসের ছানাকে দেখেই সে তো প্রকাণ্ড বড়ো এক হাঁ করল, দুই পাটি এই ধারাল সাদা দাঁত দেখা গেল আর তার পরেই জল ছপ্‌ ছপ্‌ করতে করতে কুকুরটা চলে গেল! হাঁসের বাচ্চাকে কিচ্ছু বলল না!

ফোঁস্ করে নিশ্বাস ছেড়ে হাঁসের ছানা বলল, "বাবা! ভাগ্যিস্ আমি এমনি কদাকার যে কুকুরেও আমাকে খায় না!"

নল-খাগড়ার বনে বন্দুক ছোঁড়া চলতে লাগল, বাচ্চা হাঁস চুপ করে শুয়েই রইল। বেলা পড়ে যাবার আগে গুলির শব্দ থামল না ; থামলে পরও বেচারা নড়বার-চড়বার সাহস পেল না। কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পর সে চার দিকে একবার তাকিয়ে দেখেই, জলা জায়গাটা ছেড়ে প্রাণপণে ছুট লাগাল। সেকি দৌড়, খেতের উপর দিয়ে, মাঠের মধ্যে দিয়ে, যদিও এমনি জোরে বসাতা বইছিল যে তার মুখে দৌড়নোই এক ব্যাপার !

বিকেলের দিকে হাঁসের ছানা ভাঙাচোরা ছোট্টো একটা কুঁড়ে-ঘরের সামনে পৌঁছল, সেটার বড়োই দুরবস্থা ; যেন কোন দিকে হেলে পড়বে ভেবে না পেয়ে, কোনোমতে খাড়া হয়ে আছে। হাঁস দেখল দরজার একটা কব্জা কোথায় উড়ে গেছে আর পাল্লাটা এমনি ট্যারা হয়ে ঝুলে আছে যে, দরজার আর দেয়ালের মাঝখানে একটু ফাঁক দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে একটা বাচ্চা হাঁস বেশ গলে যেতে পারে। এদিকে বাইরে ঝড়ের ঘনঘটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখে, সে গুঁড়িশুঁড়ি মেরে ঘরের ভিতরে সেঁদিয়ে গেল।

ঐ ঘরে তার হুলো-বেড়াল আর মুরগি নিয়ে এক বুড়ি থাকত। বেড়ালটাকে বুড়ি বলত তার ছেলে ; সে পিঠ ফুলো করে গলার মধ্যে গরর্-গরর্ শব্দ করতে পারত। মুরগিটার ঠ্যাংগুলো বেজায় বেঁটে, তাই বুড়ি তার নাম দিয়েছিল 'ঠ্যাং-নাটা খুকু'। মুরগি খুব ভালো ডিম দিত আর বুড়িও তাকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসত।

ঘরে নতুন অতিথি দেখে পরদিন সকালে বেড়াল ম্যাও-ম্যাও ডাক ছাড়ল আর মুরগিও কঁক-কঁক করতে লাগল। চার দিকে তাকিয়ে, বুড়ি বলল, "আবার কি হল ?" বুড়ি চোখে

ভালো দেখত না, বাচ্চা-হাঁসকে দেখে মনে করল বুঝি মস্ত মোটা হাঁস, পথ হারিয়ে চলে এসেছে। তাই বুড়ি বলল, "বাঃ, বেড়ে দাঁও মারা গেল! ওটা যদি ছেলে হাঁস না হয় তো দিব্যি হাঁসের ডিম খাওয়া যাবে! দেখাই যাক-না।" কাজেই তিন সপ্তাহ ধরে হাঁসকে পরখ করা হল, কিন্তু ডিম-টিম দেখা গেল না।

এখন হয়েছে কি, ঐ বেড়ালটাই ছিল ও-বাড়ির কর্তা আর মুরগি ছিল গিন্নি। কিছু বলতে হলে তারা সর্বদাই বলত, "আমরা

আর পৃথিবীটা হেনা-তেনা,” কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, তারা নিজেরা শুধু যে অর্ধেক পৃথিবী তাই নয়, ওদের অর্ধেকটাই বেশি ভালো! বাচ্চা-হাঁস ভাবত এ বিষয়ে কারো কারো অন্য মতও থাকতে পারে, কিন্তু মুরগি সে কথা মানবে কেন?

মুরগি জিজ্ঞাসা করল, “এই ডিম পাড়তে পারিস্?” “না।” “তা হলে মুখে কুলুপ দে!”

বেড়াল বলল, “পিঠ কুলো করতে পারিস্? গরর্ গরর্ শব্দ করতে পারিস্?” “না।” “বেশ, তা হলে গুরুজনরা যখন কিছু বলেন, তখন মতামতের কথা তুলবি নে!”

কাজেই হাঁসের ছানা আর কি করে, রেগেমেগে এক কোণে একলা বসে রইল। সে যাই হোক, হঠাৎ তার খোলা হাওয়া আর ঝকঝকে রোদের কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে পড়তেই আবার জলে সাঁতরে বেড়াবার জন্য এমনি প্রবল ইচ্ছা হল যে, কথাটা মুরগিকে না বলে পারল না।

মুরগি বলল, “তোর হয়েছেটা কি? কাজকর্ম নেই কি-না, তাই যত-সব বাজে খেয়াল পুষছিস্। হয় ডিম পাড়্, নয় তো গরর্-গরর্ শব্দ কর্, তা হলেই ও-সব ভুলে যাবি।”

বাচ্চা-হাঁস বলল, “কিন্তু সাঁতার কাটতে কি ভালোই যে লাগে! জলের তলায় ডুব দিলে, মাথার ওপর যখন দু পাশের জল আবার একসঙ্গে মিলে যায়, তখন কি ভালোই-না লাগে।” মুরগি বলল, “বলিহারি তোর ভালোলাগার ছিরি! আমার মতে তুই একটা পাগল! আমার কথা নাহয় বাদ দিলি, বেড়ালকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ্-না, ওর মতো বুদ্ধিমান জানোয়ার তো কোথাও দেখি নি, ওকেই জিজ্ঞেস কর্ সাঁতার কাটতে, কি জলের তলায় ডুব দিতে, ওর ভালো লাগে কি না! নাহয় গিন্নিমাকেই শুধোস্, তাঁর চেয়ে তো কারো বেশি বুদ্ধি নেই।

তুই কি সত্যি ভাবিস্ যে সাঁতার কাটলে, কিম্বা মাথার ওপর দুপাশের জল একসঙ্গে মিললে, তাঁর খুব মজা লাগবে ?"

বাচ্চা-হাঁস বলল, "তুমি আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পার নি।"

"কি বললি ? না, তা বুঝব কেন ! তবে কি তুই ভাবিস্ যে বেড়ালের চেয়ে, কিম্বা গিন্নিমার চেয়ে—আমার কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম—তোর বেশি বুদ্ধি ? ও-সব কথাকে মনেও স্থান দিস্ না, বাছা, বরং যে দয়া পাচ্ছিস্, তার জন্য কৃতজ্ঞ থাক্। একটা গরম ঘরে জায়গা পাস্ নি আর এমন সব লোকের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পাচ্ছিস্ না, যাদের কাছ থেকে কিছু শেখা যায় ? কিন্তু তুই এমনি আহাম্মুক যে তোর সঙ্গে মেশাই দায় ! বিশ্বাস কর, তোর ভালো মনে করেই বলছি। অপ্রিয় সত্য বলি বটে, কিন্তু তাই দিয়েই তো প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়। এবার আয় দিকিনি, একবার একটু কষ্ট করে হয় গরর্ গরর্ শব্দ করতে, নয়তো ডিম পাড়তে শেখ্।"

হাঁসের ছানা বলল, "ভাবছি আবার দুনিয়া দেখতে বেরিয়ে পড়ি।" মুরগি বলল, "যাই যা-না।"

কাজেই বাচ্চা-হাঁস বেরিয়ে পড়ল। কখনো সে জলের উপরে সাঁতার কাটত, কখনো জলের নীচে ডুব দিত, কিন্তু বেচারা এমনি কদাকার দেখতে যে, সব জন্তু-জানোয়ার ওর পাশ কাটিয়ে চলে যেত। এমনি করে হেমন্তকাল এল, গাছের পাতা হলদে হল, পাটকিলে হল, তার পর হাওয়ায় উড়ে গেল, বাতাস তাদের নাচিয়ে ফিরতে লাগল। হাওয়াটা বেজায় ঠাণ্ডা হল ; মেঘগুলো শিলের আর বরফের বোঝায় ভারি হয়ে উঠল ; ঝোপের উপর দাঁড়কাক বসে হেঁড়ে গলায় ডাকতে লাগল। বাচ্চা-হাঁস বেচারির কোথাও একটু আরাম পাবার জো রইল না।

একদিন সন্ধেবেলায়, ঠিক সূর্য ডোবার সময়, ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে এক ঝাঁক বড়ো-বড়ো পাখি আকাশে উড়ল। হাঁসের ছানা এমন সুন্দর জিনিস আর কখনো দেখে নি। পাখিগুলোর পাখনা ছিল ধবধবে সাদা, লম্বা পাতলা গলা। 'ওরা হল রাজহাঁস। অদ্ভুত একটা ডাক ছেড়ে, দীর্ঘ সুন্দর ডানা মেলে, এ দিকের ঠাণ্ডা জায়গা ছেড়ে, ওরা সমুদ্রের ওপারের গরম দেশে উড়ে চলে গেল। কত উঁচু দিয়ে উড়ে গেল ওরা, কী বিষম উঁচু দিয়ে। বিশ্রী দেখতে বাচ্চা-হাঁসটার মনের ভাবও কেমন অদ্ভুত হয়ে গেল। গম-পেষার কলের চাকার মতো, জলের উপর পাক খেয়ে সে কেবল ঘুরতে লাগল আর গলা লম্বা করে, তারা যেদিকে গেছে সেদিকে দেখতে লাগল আর তার গলার

ভিতর থেকে, এমনি জোরে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরিয়ে এল যে তাই শুনে নিজেরই ভয় ধরে গেল! আহা, ওরা সব পাখির সেরা পাখি, ওদের কথা হাঁসের ছানা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। কী সুখী ওরা! বাচ্চা-হাঁস ওদের নামও জানত না, কোথায় ওরা যাচ্ছে তাও জানত না। তবু তাদের এমন ভালো লাগল, যেমন আর কখনো কাউকে লাগে নি। একটুও হিংসা হল না; অমন রূপ যে তার নিজের কখনো হতে পারে, এ কথা সে ধারণাও করতে পারত না। উঠোনের সেই হাঁসরা যদি তাকে থাকতে দিত, তা হলে সে খুশি হয়ে সেখানেই থেকে যেত।

তার পর শীত এল, সে যে কি ঠাণ্ডা, কি ঠাণ্ডা! বাচ্চা-

হাঁসকে কেবল চরকি দিয়ে সাঁতরে বেড়াতে হত, যাতে তার চারদিকের জল না জমে যায়। তবু রোজ রাতে দেখত বরফের মাঝখানে খোলা জলের জায়গাটুকু ক্রমেই ছোটো হয়ে আসছে। প্রাণপণে তাকে ঠ্যাং ছুঁড়তে হত, নইলে ওর চারপাশের সব জলটাই জমে বরফ হয়ে যাবে। শেষটা একেবারে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে, শীতে জমে আড়ষ্ট হয়ে, বরফের উপর বেচারা শুয়ে পড়ল।
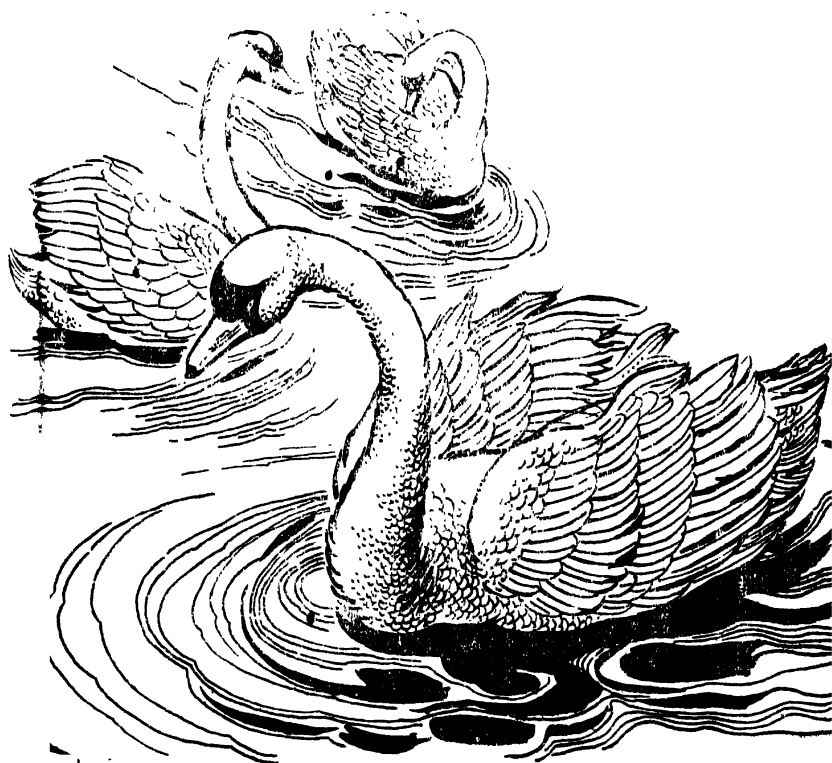
পরদিন ভোরে ঐ পথ দিয়ে যাবার সময়, একজন চাষী ওকে ওভাবে দেখতে পেয়ে, নিজের পায়ের কাঠের জুতো দিয়ে বরফ ভেঙে টুকরো টুকরো করে, হাঁসের ছানাকে তুলে ঘরে নিয়ে এসে, তার বৌয়ের কাছে দিল।

দেখতে দেখতে বাচ্চা-হাঁস সুস্থ হয়ে উঠল। চাষীর ছেলে-মেয়ের তো ওর সঙ্গে খেলা করার ভারি ইচ্ছা; কিন্তু হাঁস ভাবল ওরা বুঝি ওকে জ্বালাতন করতে এসেছে তাই ভয়ের চোটে এক লাফে সে দুধের বালতির মধ্যে গিয়ে পড়ল। সব দুধ পড়ে গিয়ে ঘর ভেসে গেল। চাষীর বৌ চেঁচিয়ে, হাততালি দিয়ে উঠল। হাঁস তখন সেখান থেকে ধড়্‌ফড়্ করে মাখনের গামলায় ঢুকল, তার পর সেখান থেকে উঠে ময়দার পিপেতে পড়েই, আবার বেরিয়ে এল।

তখন বৌ চ্যাচাতে চ্যাচাতে তাকে চিমটের বাড়ি মারার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলেমেয়েও রেষারেষি করে হাঁস ধরবার চেষ্টা করতে লাগল। তাদের সে কী হাসি আর চ্যাচামেচি! ভাগ্যিস্ দরজাটা খোলা ছিল, ছুটে বেরিয়ে এসে হাঁস ঝোপঝাড়ের ভিতর ঢুকে নতুন পড়া নরম বরফের উপর যেন স্বপ্নের ঘোরে শুয়ে পড়ল।

ঐ শীতকালে হাঁসের ছানাকে যে কত অসুবিধা কত কষ্ট সইতে হয়েছিল, সে কথা বলতে গেলে বড়োই দুঃখের ব্যাপার

হয়ে দাঁড়াবে। শেষে একদিন সে একটা বিলের ধারে নল-খাগড়ার ঝোপের মধ্যে শুয়ে ছিল। এমন সময় টের পেল আবার রোদে গরমের আমেজ লেগেছে, লার্ক পাখিরা গান গাইছে, সুন্দরী বসন্তকাল আবার ফিরে এসেছে। তখন বাচ্চা-হাঁস আবার ডানা ঝাপটাতে লাগল। আগের চাইতে এখন ডানায় কত বেশি জোর হয়েছে; সেই ডানায় ভর করে হাঁস তাড়াতাড়ি সাঁতরিয়ে চলল আর কিছু টের পাবার আগেই দেখল যে একটা মস্ত বাগানের ধারে এসে পৌঁছেছে। সেখানে আপেল গাছ ফুলে ভরে আছে, লতাগাছ খালের জলের উপর দীর্ঘ সবুজ ডালপালা ঝুলিয়ে দিয়েছে চারদিক তার ফুলের সুগন্ধে ম-ম করছে। সেখানকার সব কিছু সুন্দর, বসন্তকালের নতুন প্রাণে কেমন ভরপুর।

কুঞ্জের মধ্যে থেকে তিনটি সুন্দর সাদা রাজহাঁস বেরিয়ে এল। কি সগর্বে তারা পাখনার বাহার দেখাতে লাগল আর আলতোভাবে জলের উপর সাঁতরে বেড়াতে লাগল। হাঁসের বাচ্চা সেই অপরূপ প্রাণীদের চিনতে পারল, অদ্ভুত এটা কি দুঃখে তার মন ভরে উঠল।

সে বলল, "রাজার মতো পাখি, ওদের কাছে উড়ে যাব নাকি! আমার মতো একটা কদাকার পাখি ওদের কাছে গেলে, আস্পর্ধা দেখে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে; কিন্তু তাতে কিই-বা এসে যায়। হাঁসের কামড়, মুরগির ঠোক্কর, যে মেয়েটা পাখিদের খাবার দেয় তার লাথি খাওয়া, তার পর শীতকালে এত কষ্ট পাওয়ার চাইতে, ওদের হাতে মরাই ভালো।"

এই ভেবে সে উড়ে জলে নেমে, সেই সুন্দর পাখিগুলোর দিকে সাঁতরিয়ে চলল। তারাও ওকে দেখতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল। হাঁসের ছানা বেচারা বলল, "আমাকে শুধু

মেরে ফেল।" বলে মাথা নিচু করে মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু জলের মধ্যে এ কি দেখছে সে! দেখছে নিজের ছায়া, কিন্তু সে তো একটা মোটা, কদাকার, ছাই রঙের পাখির ছায়া নয়, রাজহাঁসের ছায়া।

রাজহাঁসের ডিম ফুটে যে পাখি বেরিয়েছে, সে পাতিহাঁসের উঠোনে জন্মালেও কিছু এসে যায় না।

বড়ো রাজহাঁসরা ওর চারদিকে সাঁতরিয়ে বেড়াতে লাগল, ওর গায়ে ঠোঁট বুলিয়ে দিতে লাগল। ওর মনে আনন্দ আর ধরে না।

বাগানের মধ্যে কয়েকটি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে ছুটোছুটি করছিল। তারা শস্যের দানা আর রুটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে জলে ফেলল। তার পর সবার ছোটোটি বলে উঠল, "আরে, একটা নতুন হাঁস যে!" অন্যরাও চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, তাইতো, একটা নতুন রাজহাঁস এসেছে যে!" আনন্দে হাততালি দিয়ে তারা মা-বাবাকে কথাটা বলবার জন্য ঘরের মধ্যে চলে গেল। তার পর জলে আরো রুটি আর কেক ফেলা হল। সবাই বলল, "নতুন রাজহাঁসটাই সবচেয়ে ভালো, কত কম বয়স, কি সুন্দর দেখতে!" বুড়ো রাজহাঁসরা এসে ওর সামনে মাথা নিচু করল। ছোটো রাজহাঁস লজ্জা পেয়ে, ডানার মধ্যে মাথা গুঁজল। তার বড়ো আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু তাই বলে অহংকার হচ্ছিল না। মন যাদের ভালো হয়, তারা কখনো অহংকার করে না।

তার মনে পড়ে গেল আগে সবাই তাকে যেমন টিটকিরি দিত আর তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত; এখন শুনল সবাই বলছে যেখানে যত সুন্দর পাখি আছে, তার মধ্যে ও-ই নাকি সব-চাইতে সুন্দর। লতাগাছগুলি তার দিকে ডালপালা নামিয়ে

দিল, সূর্য তার নরম-গরম উজ্জ্বল রোদ দিতে লাগল। হাঁস তার পালক ঝাড়ল, সুন্দর সরু গলাটি লম্বা করল আর মনের খুশিতে বলে উঠল, "যখন আমি একটা কদাকার হাঁসের ছানা ছিলাম, সবাই আমাকে ঘেন্না করত; তখন কি স্বপ্নেও এত সুখের কথা ভাবতে পারতাম!"

ছোটো জলকন্যার কথা

অনেক অনেক দূরে বিশাল সাগরের মাঝখানে, যেখানে জলের রঙ সুন্দরী অতসী ফুলের মতো নীল আর স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, সমুদ্র সেখানে এত গভীর যে জলের তলা থেকে উপরে পৌঁছতে হলে, একটার উপরে একটা অনেকগুলো গির্জার চুড়ো চাপাতে হয়। সেইখানে জল-মানুষরা থাকে।

যেখানে সবচাইতে গভীর জল, সেইখানে জল-রাজের প্রাসাদ। তার দেওয়ালগুলো প্রবালের, সরু খিলান দেওয়া জানলা হলুদ স্ফটিকের। ছাদ আস্ত-আস্ত ঝিনুক দিয়ে তৈরি, তার উপর দিয়ে ঢেউ বয়ে গেলে সেগুলি একবার খোলে একবার বন্ধ হয়। ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো জ্বলজ্বল করে, তাতে আরো সুন্দর দেখায়। ঐ মুক্তোর একটিকে তুলে যদি মাটির জগতের কোনো রাজার মুকুটে বসান যেত, তার কাছে আর-সব মণি-মাণিক্যকে তুচ্ছ মনে হত।

ঐ প্রাসাদে জল-রাজ থাকতেন। অনেকদিন আগেই তাঁর রানী মারা গেছেন, বুড়ি মা সংসার দেখেন। মোটের ওপর বুড়ি ভারি বুদ্ধিমতী, তবে বংশ আর উঁচু পদ নিয়ে বড়ো অহংকার। বুড়ি রানীর ল্যাজে বারোটা ঝিনুক শোভা পেত, সমুদ্রের তলার আর কোনো অধিবাসী ছটার বেশি পরার অনুমতি পেত না।

এটুকু ছাড়া বুড়ি রানীর অশেষ প্রশংসা করা উচিত। ছয় নাতনিকে তিনি কতই-না ভালোবাসতেন। তারা দেখতে বড়ো সুন্দর। তাদের মধ্যে সবার ছোটোটি সবচাইতে রূপসী। গোলাপের পাপড়ির মতো মোলায়েম তার গায়ের চামড়া, মাঝ-সমুদ্রের মতো গাঢ় নীল তার চোখ। তবে অন্যান্য জল-কন্যাদের মতো তারও পা ছিল না; তার বদলে শরীরের তলার দিকে ছিল মাছের মতো ল্যাজ। সারাদিন রাজকুমারীরা রাজবাড়ির মস্ত-মস্ত ঘরে খেলা করে বেড়াত। ওদের ঘিরে দেয়াল জুড়ে কি সুন্দর সব ফুল ফুটত। হলদে স্ফটিকের জানলা খুলে দিলে, মাছগুলো সাঁতরিয়ে ঘরে ঢুকত ঠিক যেমন করে আমাদের জগতে পাখিরা উড়ে এসে ঘরে ঢোকে। মাছরা সোজা রাজকুমারীদের কাছে যেত, তাদের হাত থেকে খাবার খেত, তাদের আদর করলে কিছু বলত না।

রাজবাড়ির সামনে সে যে কী চমৎকার বাগান ছিল! সেখানে টকটকে লাল আর গাঢ় নীল গাছ ছিল, সে গাছের ফল সোনার মতো ঝকঝকে, আর ফুল দেখলে উজ্জ্বল সূর্যের কথা মনে হত। বাগানেই মাটির বদলে ছিল চকচকে নীল বালি, গন্ধকে আগুন ধরলে যেমন রঙ দেখায়। সব কিছুর উপরে অপূর্ব একটা নীল আভা ছড়িয়ে থাকত, তাই দেখে হঠাৎ কেমন মনে হত এ তো সাগরের তলা নয়, এ যেন শূন্যে অনেক উঁচুতে উঠেছি, উপরে আকাশ, নীচেতে আকাশ! জল যখন নিথর হয়ে থাকত, সূর্যকে মনে হত মস্ত একটা বেগনি ফুল তার গোল পাত্রটির মধ্যে থেকে রশ্মি ঝরে সমস্ত পৃথিবীতে আলো দিচ্ছে!

বাগানের মধ্যে প্রত্যেক রাজকন্যের নিজের একটুখানি জায়গা ছিল, সেখানে তারা ইচ্ছামতো চারা লাগাতে, বীজ বুনতে পারত। একজনের জায়গাটি ছিল ঠিক একটা তিমিমাছের

আকারে, আরেকজনেরটি জলকন্যার মতো ; কিন্তু সবার ছোটো যে রাজকুমারী তার বাগানটি ছিল সূর্যের মতো গোল আর তাতে যত ফুল ছিল, তাদের রঙ লাল, রাজকুমারীর চোখে সূর্য যেমন লাল।

ছোটো রাজকুমারী অন্যদের চাইতে একটু আলাদা রকম ছিল, খুব শান্ত, সব সময় কি যেন ভাবত। ডুবো-জাহাজ থেকে নানারকম ঝকঝকে চকচকে জিনিস এনে একবার বোনেরা যখন সাজগোজ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল, ছোটো রাজকুমারী তখন ডুবো-জাহাজে পাওয়া, শ্বেত পাথরে খোদাই করা সুন্দর একটি ছেলের মূর্তি ছাড়া আর কিছু নিল না। মূর্তিটি সে তার নিজের বাগানে রাখল ; তার পাশে লাল একটা গাছ পুঁতল, তার ঝোলা পাতা দেখে মনে হত গাছটি যেন কাঁদছে। দেখতে-দেখতে গাছ বেড়ে উঠল, উজ্জ্বল নীল মাটির উপর তার ডালপালা নুইয়ে পড়ল। সেখানকার ছায়াগুলো সদাই নড়ত-চড়ত আর বেগনি রঙের খেলা দেখাত, দেখে মনে হত ডালপালা আর শিকড়গুলো যেন এ ওকে আদর করছে।

সমুদ্রের উপরে ডাঙার জগতের মানুদের কথা শুনতে ছোটো রাজকন্যে যেমন ভালোবাসত, তেমন আর কিছু নয়। জাহাজ, শহর, মানুষ আর ডাঙার জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধে বুড়ি ঠাকুমা যা কিছু জানতেন, সব তাকে বলতে হত। রাজকন্যে যখন শুনল যে উপরের জগতে যে-সব ফুল ফোটে তাদের সে কি সুগন্ধ, তখন সে কী খুশিই-না হল। সমুদ্রের নীচেকার ফুলের তো গন্ধই নেই। তার উপর পৃথিবীর বনের রঙ নাকি সবুজ, সেখানকার গাছের ডালপালার মধ্যে যে-সব মাছ ধড়্ফড়্ করে উড়ে বেড়ায়, কি তাদের রঙের বাহার আর কী মিষ্টি সুরে জোরে জোরে তারা গান গায়! আসলে ঠাকুমা পাখির কথা বলে-

ছিলেন, কিন্তু পাখিকে বলেছিলেন মাছ, কারণ নাতনিরা তো কখনো পাখি দেখে নি, তাঁর কথা বুঝবে কি করে ?

ঠাকুমা বললেন, "তোর যখন পনেরো বছর বয়স হবে, তখন তুই সাগরের উপরে ভেসে উঠবার অনুমতি পাবি। তখন চাঁদের আলোতে, সাগরতীরের পাথরের ধাপে বসে দেখবি জাহাজ কেমন ভেসে যায়, কাকে বলে শহর, কাকে বলে মানুষ।"

পরের সালে বড়ো রাজকুমারীর পনেরো বছর বয়স হল। সে বোনদের কাছে কথা দিল যা দেখবে শুনবে, সব কথা ফিরে এসে তাদের বলবে। ঠাকুমা আর কতটুকু বলেন, আরো তো কত কি আছে, বোনেরা সে-সব শুনতে চায়।

কিন্তু ছোটো বোনের মতো আর কেউ সেই সুখের বয়সের জন্য অমন আগ্রহে অধীর হয়ে বসে থাকে নি। তাকেই সবচাইতে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে আর সেই ছিল সবচাইতে শান্ত আর ভাবুক প্রকৃতির। রাতে সে অনেক সময় খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে নির্মল নীল জলের ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখত। মাথার উপর দিয়ে ছায়া ভেসে গেলে, রাজকন্যে জানত ওটা হয় তিমিমাছ, নয়তো মানুষ বোঝাই জাহাজ। সে মানুষরা কেউ জানত না যে অনেক নীচে জলের তলায়, ছোটো এক জলকন্যা আকুল হয়ে তাদের জাহাজের খোলের দিকে সাদা সাদা হাত দুখানি বাড়িয়ে দিয়েছে।

সবার বড়ো বোন প্রথম বার সাগরের উপর থেকে ঘুরে এসে হাজাররকম গল্প করল। তার সবচাইতে ভালো লেগেছিল চাঁদের আলোয় বালির চরে বসে, সমুদ্র-তীরের শহরটিকে দেখতে। সেখানকার আলোগুলো তারার মতো জ্বলজ্বল করছিল, বাজনা বাজছিল। দূর থেকে লোকজন গাড়িঘোড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল, গির্জার উঁচু চুড়োগুলি দেখা যাচ্ছিল, ঘণ্টার শব্দ কানে আসছিল। ওখানে যাবার কোনো উপায় ছিল না বলেই ঐ-সব জিনিসের জন্য জলকন্যার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল।

কি মনোযোগ দিয়েই না ছোটো জলকন্যা দিদির কথাগুলো শুনেছিল। তার পরে যখন আবার রাতে খোলা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে, নীল জলের ভিতর দিয়ে সে উপরে তাকিয়ে দেখল, সেই মস্ত গমগম করা শহরটার কথা তার এত বেশি করে মনে পড়ল যে, মনে হল যেন গির্জার ঘণ্টার শব্দ তার কানে আসছে।

তার পরের বছর মেজো বোন ইচ্ছামতো সাঁতরে বেড়াবার অনুমতি পেল। সূর্য যেই ডুবুডুবু, সে জলের উপরে উঠে এল।

সূর্য ডোবা দেখে সে এমনি মুগ্ধ হল যে ফিরে গিয়ে বোনদের বলল যে, জলের উপরে উঠে ঐ সূর্য ডোবার চাইতে সুন্দর কিছু তার চোখে পড়ে নি। মেজো রাজকুমারী বলল, "সমস্ত আকাশের গায়ে সোনার রঙের ছোঁয়া লাগল, মেঘের সে রূপের কথা বলবার আমার সাধ্য নেই। এই লাল, এই ফিকে বেগনি, মাথার ওপর দিয়ে মেঘেরা ভেসে চলল। তার চাইতেও বেগে জলের ওপর দিয়ে ঠিক যেখানে সূর্য পাটে নামছে, সেই দিকে উড়ে গেল এক ঝাঁক বুনো রাজহাঁস। তাদের দিকে চেয়ে রইলাম, কিন্তু সূর্য দৃষ্টির নীচে নেমে গেল আর সমুদ্রের জলের ওপর থেকে, মেঘের কিনারা থেকে, ঝকঝকে গোলাপি আলোও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।"

তৃতীয় বোনের সাহস এদের চাইতে বেশি। যখন তার পালা এল, সে সাহসে ভর করে একটা নদীর মুখে ঢুকে পড়ল। সেখান থেকে সে দেখতে পেল ছোটো-ছোটো সবুজ পাহাড়, তাদের গায়ে গায়ে বন আর আঙুরের বাগান, তারই মাঝে মাঝে মাথা তুলে রয়েছে কত বাড়ি, কত প্রাসাদ। পাখির গান শুনতে পেল সে। সূর্যের সে কি তেজ! থেকে থেকেই তাকে জলের তলায় ডুব দিয়ে মাথা মুখ ঠাণ্ডা করতে হচ্ছিল। ছোটো একটা উপসাগরের তীরে দেখল এক দল ছোটো-ছোটো ছেলে-মেয়ে স্নান করছে, লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে। রাজকুমারীর ইচ্ছা করছিল ওদের খেলায় যোগ দেয়, কিন্তু ওকে দেখেই ছেলে-মেয়েরা বেজায় ভয় পেয়ে ডাঙার দিকে দৌড় দিল আর একটা ছোটো কালো জানোয়ার এমনি খেউ-খেউ করে ডাকতে লাগল যে শেষপর্যন্ত ও নিজেও ভয় পেয়ে, সমুদ্রের দিকে পালিয়ে বাঁচল। তবু ঐ সবুজ বন, গাছে ঢাকা ঐ শ্যামল পাহাড় ঐ ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েদের কথা কিছুতেই সে ভুলতে

পারছিল না। যদিও তাদের পাখনা নেই, তবু তারা নদীর জলে কেমন নির্ভয়ে সাঁতরে বেড়াচ্ছিল।

চতুর্থ বোনের অত সাহস ছিল না, সে খোলা সমুদ্রের উপরেই থেকে গিয়েছিল, তার পর ফিরে গিয়ে বোনদের বলেছিল এর চেয়ে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। দূর দিয়ে জাহাজ ভেসে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পাখি। আর দেখেছিল জলের মধ্যে শুশুকরা কেমন মনের খুশিতে খেলা করছে আর বিশাল বিশাল তিমিমাছরা আকাশে বাতাসে হাজার হাজার ঝলমলে জলের ফোয়ারা ছুঁড়ছে।

পঞ্চম বোনের জন্মদিন পড়ল শীতকালে। সে যখন জলের উপরে উঠল, দেখল সমুদ্রের রঙ সবুজ, তার উপর বড়ো-বড়ো বরফের চাংড়া ভাসছে। রাজকুমারী বলল, ওগুলো দেখতে মুক্তোর মতো, কিন্তু অনেক বড়ো, মানুষদের গির্জার চুড়োর চেয়েও বেশি উঁচু। রাজকুমারী একটা বরফের চাংড়ার উপর বসে, বাতাসে চুল মেলে দিয়েছিল। কিন্তু তাই-না দেখে, যেখানে যত জাহাজ ছিল সবাই পাল তুলে দিয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারল পালিয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলায় নৌকোর পালে পালে যেন আকাশ ছেয়ে গেল, প্রকাণ্ড বরফের টুকরোগুলো একবার করে ডুবতে আবার ভাসতে লাগল, তাদের গা থেকে লালচে আভা বেরুতে লাগল, মেঘ থেকে বিদ্যুতের ঝলক দেখা গেল, বাজ বার বার গর্জাতে লাগল। অমনি সব জাহাজ পাল গুটিয়ে ফেলল; তাদের পাটাতনে যারা ছিল তাদের সে কি ভয়! কিন্তু রাজকুমারী বরফের চাংড়ার উপরে বসে বসে বিদ্যুতের নীল ঝলকানি দেখেছিল।

প্রথমবার সমুদ্রের উপরে উঠে বোনেরা সবাই এতরকম নতুন নতুন সুন্দর জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার পর

সে-সব পুরনো হয়ে গেল, তখন জলের তলায় নিজেদের বাড়িটাকেই সবচাইতে ভালো বলে মনে হতে লাগল। কারণ নিজেদের বাড়িই তো মনের মতো জিনিসে ঠাসা থাকে।

সন্ধেবেলায় অনেক সময় পাঁচটি বোন হাত ধরাধরি করে সমুদ্রের অতল গভীর থেকে উঠে আসত। মানুষের গলার চাইতে তাদের গলার সুর অনেক বেশি মধুর। ঝড় আসছে দেখলে তারা জাহাজের সামনে গিয়ে সে যে কী মিষ্টি গান গাইত, সে আর কি বলব! সমুদ্রের তলায় যারা বাস করে তাদের সুখের জীবনের কথা গাইত, নাবিকদের বলত, ভয় পেয়ো না, নেমে এসো নীচে আমাদের কাছে। মাঝিরা ওদের কথার মানে বুঝত না, ভাবত বুঝি বাতাসের শন্-শন্।

সন্ধেবেলায় বোনেরা যখন সাঁতরিয়ে বেড়াত, ছোটো জলকন্যা তার বাবার প্রাসাদে একলা থাকত, এতটুকু নড়ত-চড়ত না, এক দৃষ্টে দিদিদের যাওয়ার পথে চেয়ে থাকত। যদি পারত, তা হলে হয়তো সে কাঁদত, কিন্তু জলকন্যারা কাঁদতে পারে না, তাই দুঃখ হলে মানুষের চাইতে শতগুণ বেশি কষ্ট পায়।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছোটো রাজকুমারী বলত, "ইস্, একবার আমার পনেরো বছর হলেই হয়! আমি ঠিক জানি জলের উপরের জগৎটাকে আর সেখানকার মানুষগুলোকে আমার বড়ো ভালো লাগবে।" অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এল।

ঠাকুমা বললেন, "এই তো এবার তোর পালা। কাছে আয়, তোকেও তোর দিদিদের মতো করে সাজিয়ে দিই।" এই বলে বুড়ি তার চুলে একটা সাদা ফুলের মালা জড়িয়ে দিলেন, সে ফুলের প্রত্যেকটি পাপড়ি আধখানা মুক্তো দিয়ে তৈরি। তার পর বুড়ি আটটি বড়ো-বড়ো ঝিনুককে বললেন

রাজকুমারীর লেজে ঝুলে থাকতে, তাতেই বোঝা যাবে কন্যার বংশ কত উঁচু।

ছোটো রাজকুমারী বলল, "কিন্তু ওতে যে বড়োই অসোয়াস্তি লাগছে ঠাকুমা।"

বুড়ি বললেন "আহা, সুন্দর দেখাতে হলে ঐরকম একটু-আধটু অসুবিধা সইতেই হয়।"

রাজকুমারী কিন্তু এই-সব জাঁকজমক ছেড়ে দিয়ে, ঐ ভারী মুকুটের বদলে তার নিজের বাগানের লাল ফুল পরলেই বেশি খুশি হত আর তাতে তাকে মানাতও ঢের বেশি। কিন্তু অত সাহস কোথায় পাবে? ওদের কাছে বিদায় নিয়ে, এক টুকরো ফেনার মতো সে ভেসে পড়ল।

যখন জলের উপরে পৌঁছল, তখন সূর্য সবে দিগন্তের নীচে নেমেছে, মেঘ থেকে ঝলমলে সোনালি আর গোলাপির ছটা বেরুচ্ছে, পশ্চিমের ফিকে আকাশে সন্ধ্যা-তারা জ্বলছে, কাঁচের আয়নার মতো নিথর সাগর। স্থির জলের উপরে তিনটি মাস্তুল তুলে প্রকাণ্ড একটা জাহাজ ভাসছিল। মাস্তুল থেকে অগুন্তি নিশান বাতাসে উড়ছিল; একটিমাত্র পাল তোলা ছিল। কোথাও এতটুকু বাতাস নেই; জাহাজের তক্তায়, সিঁড়িতে নাবিকরা চুপ করে বসেছিল। পাটাতন থেকে গান বাজনার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তার পর যেই অন্ধকার ঘনিয়ে এল, অমনি হঠাৎ শত-শত আলো জ্বলে উঠল।

ছোটো জলকন্যা সাঁতরিয়ে গেল জাহাজের কাপ্তানের ছোটো কুঠরির কাছে। ঢেউয়ের তুলুনির সঙ্গে যখন জাহাজটা একটু উঁচুতে উঠছিল তখন জানলার পরিষ্কার কাঁচের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতরটা দেখা যাচ্ছিল। রাজকুমারী দেখল চমৎকার সাজ-পোশাক পরা কয়েকজন মানুষ। তাদের মধ্যে সবচাইতে
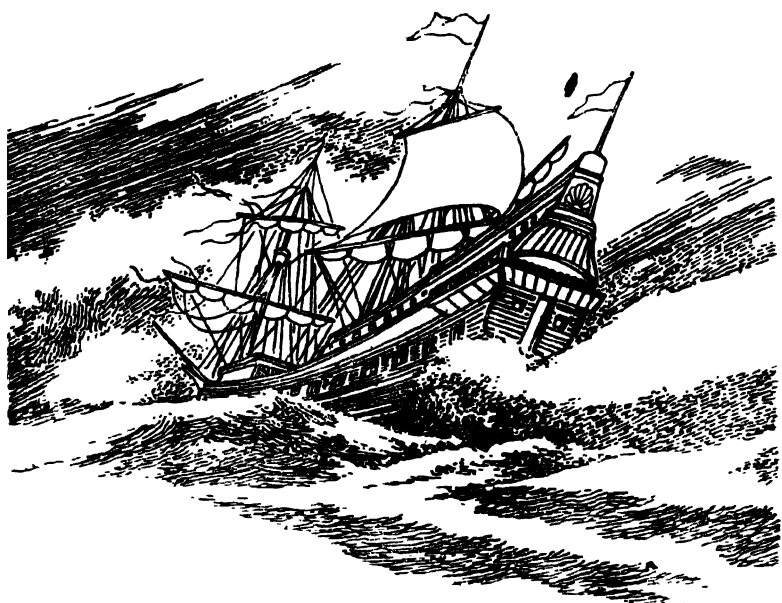
যে রূপবান, সে একজন রাজপুত্র, গভীর কালো তার চোখ। সেদিন তার ষোলো বছর পূর্ণ হল, জাহাজের লোকরা তাই মহা ধুমধাম করে তার জন্মদিনের উৎসব করছিল। নাবিকরা পাটাতনের উপরে নাচছিল, সেখানে রাজপুত্র দেখা দিতেই, হুস্ করে আকাশে একশো হাউই উঠল, রাত হল দিন। ভয়ের চোটে জলকন্যা জলের নীচে ডুব দিল। একটু বাদেই ছোট্টো মাথাটি তুলে দেখে যেন আকাশ থেকে ওর-ই উপর তারা ঝরে পড়ছে। এমন আলোর ফুলকি ঝরা আগে কখনো দেখে নি সে, মানুষরা যে এমন আশ্চর্য ক্ষমতা ধরে, তাও কখনো শোনে নি। মনে হল তার চারদিকে বড়ো-বড়ো সূর্য ঘুরছে, রঙ-চঙে মাছ সব শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর সাগরের স্বচ্ছ শান্ত বুকে সব কিছুর ছায়া পড়ছে। জাহাজে এত আলো যে, প্রত্যেকটি জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আহা, রাজপুত্রের আজ কী আনন্দ! নাবিকদের হাত ধরে নাড়ছে, তাদের সঙ্গে

গাল-গল্প, ঠাট্টা-তামাসা করছে আর রাতের নৈঃশব্দের সঙ্গে সঙ্গীতের মধুর সুর মিলে একাকার হচ্ছে।

এদিকে রাত বাড়ছে, কিন্তু জলকন্যা কিছুতেই ঐ আলোয় আলো জাহাজ আর ঐ পরমসুন্দর রাজপুত্রকে ছেড়ে যেতে পারছিল না। ছোটো কুঠরির জানলা দিয়ে সে ভিতরের দিকে তাকিয়েই ছিল, ঢেউয়ের দোলায় তার শরীরটা উঠছিল পড়ছিল। তার পর জাহাজের তলাটা ফেনিয়ে উঠল, ঘড়্‌ঘড়্‌ করে জল পাক দিয়ে উঠল, জাহাজ চলতে আরম্ভ করল। অমনি সব পাল তুলে দেওয়া হল। তার পর উঁচু-উঁচু ঢেউ উঠতে লাগল, আকাশে ঘোর কালো মেঘের ঘনঘটা, দূরে বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল। নাবিকরা বুঝল বড় আসছে, অমনি সব পাল নামিয়ে দিল। ঝোড়ো সমুদ্রের বুকে ঐ প্রকাণ্ড জাহাজ একটা হাল্‌কা নৌকোর মতো দোল খেতে লাগল। পর্বত প্রমাণ ঢেউ জাহাজের মাথা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল আর জাহাজ একবার তার নীচে তলিয়ে যায়, একবার তার মাথায় চড়ে! ছোটো জলকন্যার কাছে এ-সব বড়ো আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু নাবিকদের কথা আলাদা। বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজে মড়্‌মড়্‌ করে ফাটল ধরল, ঐ মোটা মাস্তুল তাও বেঁকে গেল, হুড়্‌হুড়্‌ করে খোলের ভিতরে জল ঢুকে পড়ল। নিমেষের জন্য জাহাজ ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল, তার পর নলখাগড়ার বোঁটার মতো বড়ো মাস্তুলটি ভেঙে পড়ল; জাহাজও তখুনি উলটিয়ে গেল, গব্‌গব্‌ করে খোলটি জলে ভরে গেল।

এতক্ষণ বাদে ছোটো জলকন্যা বুঝতে পারল জাহাজের মানুষদের এবার সমূহ বিপদ। নিজেকেও সাবধান হতে হয়, জাহাজ থেকে ছিঁড়ে-আসা কড়ি বরগা তক্তা ঢেউয়ের মাথায় ভাসছে।

চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার, চোখে কিছু ঠাহর হয় না। খানিক পরে ভয়ংকরভাবে বিদ্যুৎ চমকাল, তার আলোতে জাহাজ-ডুবির সর্বনেশে দৃশ্য দেখা গেল। জলকন্যার দুই চোখ তারই মধ্যে রাজপুত্রকে খুঁজে বেড়াতে লাগল, ঠিক সেই সময় টুপ করে জাহাজটি ডুবে গেল। প্রথমে তার বেজায় আনন্দ হল, ভাবল এবার তাহলে রাজপুত্রকে জলের তলায় তাদের বাড়িতে যেতে হবে। তার পরেই মনে পড়ল জলের নীচে তো মানুষেরা বাঁচে না। জল-রাজের প্রাসাদে যদি কখনো রাজপুত্র যায়, শুধু তার মরা দেহটিই যাবে।

'মরা! না, না, তাকে মরতে দেব না!' চারদিকে ভাঙা জাহাজের বরগা তক্তা ভাসছে, তারই মধ্যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে, জলকন্যা রাজপুত্রকে খুঁজতে লাগল। শেষপর্যন্ত পেলও তাকে; ততক্ষণে রাজপুত্রের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে এসেছে, অনেক কষ্টে শুধু নিজের মাথাটুকুকে জলের উপরে ভাসিয়ে রেখেছে। চোখদুটি বোজা। ডুবেই যেত নিশ্চয়, যদি-না জলকন্যা তাকে বাঁচাত। জলকন্যা তাকে জড়িয়ে ধরে, জলের উপরে তুলে নিয়ে, স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

খানিক পরেই দেখল শুকনো ডাঙা, পাহাড়ের উপরে বরফ ঝক্‌মক্ করছে। সমুদ্রের ধারে ধারে সবুজ বন, বনের কিনারায় একটা মন্দির, কিম্বা আশ্রম, জলকন্যা চিনতে পারল না কি। তার চারদিকে বাগান, সেখানে কলম্বী আর কাগজি লেবুর গাছ; সদর দরজা অবধি চলে গেছে লম্বা-লম্বা তালগাছের বীথি। ঐখানে একটা ছোটো উপসাগরের মতো হয়েছে, স্থির জল, কিন্তু বড়ো গভীর। উঁচু পাথরের পাড়ির নীচে শুকনো শক্ত বালি। সেইখানে জলকন্যা রাজপুত্রকে নিয়ে এল; দেখে মনে হয় বুঝি তার দেহে প্রাণ নেই। জলকন্যা তাকে

সামান্য গরম বালির উপর শুইয়ে, মাথাটিকে সাবধানে উঁচু করে রাখল, মুখটি রোদের দিকে ফিরিয়ে দিল।

সামনের মস্ত সাদা বাড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল, কয়েকজন অল্প-বয়সী মেয়ে বাগানে বেড়াবে বলে বেরিয়ে এল। জলকন্যা তীর থেকে সরে গিয়ে পাথরের আড়ালে লুকোল, সমুদ্রের ফেনা দিয়ে মাথাটি ঢেকে রাখল, যাতে কেউ তাকে না দেখতে পায়। সেখান থেকে রাজপুত্রকে সে দেখতে লাগল।

বেশিক্ষণ কাটে নি, এমন সময় একটি মেয়ে কাছে এল! রাজপুত্রকে ঐভাবে মরার মতো পড়ে থাকতে দেখে সে বেজায় ভয় পেল। তখনই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বোনদের ডাকতে ছুটে গেল। ছোটো জলকন্যা দেখল রাজপুত্র ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠেছে, তাই দেখে সকলে হাসছে, তাদের মনে যেমন সহানুভূতি, তেমনি আনন্দ। কিন্তু রাজপুত্র একবারও জলকন্যাকে খুঁজল না, সে তো জানেই না যে জলকন্যাই তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার পর যখন সবাই মিলে রাজপুত্রকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল, রাজকুমারীর এমনি মন খারাপ হয়ে গেল যে অমনি সে এক ডুবে তার বাবার প্রাসাদে ফিরে এল।

আগেও ছোটো রাজকুমারী ছিল বড়ো শান্ত আর ভাবুক এখন যেন আরো বেশি হল। বোনেরা জিজ্ঞাসা করত উপরের জগতে সেদিন কি দেখে এসেছিল, ছোটো জলকন্যা কোনো উত্তর দিত না।

সন্ধ্যাবেলায় অনেক সময় ছোটো রাজকুমারী ভেসে উঠে সেই জায়গাটাতে যেত, যেখানে সে রাজপুত্রকে রেখে এসেছিল। দেখত পাহাড়ের উপরের বরফ গলল, বাগানের ফল পাকল, কিন্তু রাজপুত্রের আর দেখা না পেয়ে, মনের দুঃখে ঘরে ফিরে

যেত। একমাত্র আনন্দ ছোটো বাগানে বসে সুন্দর মূর্তিটিকে দেখা; মূর্তির সঙ্গে রাজপুত্রের আশ্চর্য সাদৃশ্য। আর সে ফুলগাছের যত্ন করত না, গাছগুলি বেড়ে জঙ্গল হয়ে গেল; সিঁড়ি ঢেকে গেল; লম্বা বোঁটা আর পাকান শুঁয়োর সাহায্যে গাছের ডালপালার সঙ্গে তারা জড়িয়ে রইল। বাগানটাই হয়ে উঠল একটা কুঞ্জবন।

শেষপর্যন্ত মনের দুঃখ আর মনে গোপন করতে না পেরে, দিদিদের একজনকে একদিন সে সব কথা বলে ফেলল। সে অন্য বোনদের বলল, তারা বন্ধু-বান্ধবদের কাউকে বলল। তাদের মধ্যে ছিল আরেকজন জলকন্যা; রাজপুত্রকে তার খুব মনে ছিল, ঝড়ের দিনে জাহাজের উৎসব সে-ও নিজের

চোখে দেখেছিল। তার উপর সে জানত রাজপুত্রের দেশ কোথায়, সেখানকার রাজার কি নাম।

রাজকুমারীরা ছোটো বোনকে আদর করে বলল, "আয়, আমাদের সঙ্গে।" এই বলে তারা হাত ধরাধরি করে জল থেকে ভেসে উঠল একেবারে রাজপুত্রের প্রাসাদের সামনে। সে প্রাসাদ হলুদ পাথরে তৈরি। বাড়ি থেকে সমুদ্রের ধার অবধি শ্বেত পাথরের সিঁড়ি। বাড়ির মাথায় সোনালি রঙের গম্বুজ যেন সোনার মুকুট শোভা পাচ্ছে। বাড়ির চারদিকে থামের মাঝে মাঝে শ্বেত পাথরের মূর্তি, দেখে মনে হয় যেন সত্যিকার মানুষ। উঁচু জানলার স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে কেউ যদি দেখত, তার চোখে পড়ত জমকাল সব ঘর, তাতে রেশমী পরদা ঝুলছে, দেয়ালে সুন্দর করে আঁকা রঙিন ছবি মানুষ থাকবার এমন চমৎকার বাড়ি দেখে জলবাসিনী রাজকুমারীরা মুগ্ধ। সবচাইতে বড়ো ঘরগুলির একটার জানলা দিয়ে ওরা দেখে ঘরের মধ্যিখানে ফোয়ারা থেকে জল উঠছে একেবারে মাথার উপরে গম্বুজ অবধি। গম্বুজের ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি ঢুকে জলের উপরে নাচছে, জলের চারদিকে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে, আলো লেগে তারা ঝলমল করছে।

এতদিন পরে ছোটো রাজকুমারী জানতে পারল তার বড়ো প্রিয় রাজপুত্র কোথায় থাকে। এর পর থেকে প্রায় রোজ সন্ধ্যায় সে সেখানে যেত। বোনেরা সাহসে ভর করে যতদূর গিয়েছিল, ছোটো জলকন্যা প্রায়ই তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে যেত। এমন-কি কখনো কখনো একটা সরু খাড়ি ধরে শ্বেত পাথরের ঝোলান বারান্দার তলায় গিয়ে পৌঁছত। রাতে যখন চাঁদের আলো ফুটফুট করত, সেখান থেকে সে রাজপুত্রকে দেখত; রাজপুত্র মনে করত তার কাছে কেউ নেই।

মাঝে মাঝে একটা রঙ-চঙে নৌকো করে রাজপুত্র বেড়াত, মাথার উপর নানা রঙের নিশান উড়ত। জলকন্যা জলের ধারে সবুজ নল-বনে লুকিয়ে লুকিয়ে রাজপুত্রের গলার স্বর শুনত।

রাতে অনেক সময় বাতি-ঘরের আলোয় জেলেরা জাল ফেলে মাছ ধরত। জলকন্যা শুনতে পেত ওরা রাজপুত্রের কথা, তার নানান্ বীরত্বের কথা বলাবলি করছে। এই ভেবে তার ভারি আনন্দ হত যে, রাজপুত্রের প্রাণ তারই জন্যে বেঁচেছিল। মনে পড়ত, রাজপুত্রের মাথাটি কেমন তার বুকের উপর লুটিয়ে পড়েছিল, সে কেমন আস্তে একটা চুমো খেয়েছিল, কিন্তু রাজপুত্র সে কথা টেরও পায় নি, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

যতই দিন যায়, মানুষদের তার ততই ভালো লাগে, বড়ো ইচ্ছা করে, আহা, সে-ও যদি মানুষ হত! জলের মানুষদের জগতের চাইতে এদের জগৎটাকে অনেক বেশি বড়ো মনে হত। জাহাজে চড়ে মানুষরা যেমন সমুদ্রের উপরে ভেসে বেড়াতে পারে, আবার আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়ের শিখর অবধি চড়তে পারে। জলকন্যাদের চোখ যতদূর যায়, তার চাইতেও অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ওদের বনে ঢাকা রাজ্য!

অনেক জিনিস ছোটো রাজকুমারী বুঝতে পারত না, মনে হত কেউ বুঝিয়ে দিলে ভালো হয়, কিন্তু দিদিরাও ঠিক উত্তরটি বলতে পারত না। শেষপর্যন্ত বুড়ি রাজ-মাতাকেই জিজ্ঞাসা করতে হত, তিনি তো উপরের জগতের বিষয়ে অনেক কিছু জানতেন। সে জগৎকে তিনি বলতেন, 'সাগরের উপরের রাজ্য।'

একদিন ছোটো জলকন্যা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, ঠাকুমা, মানুষরা যদি ডুবে না যায়, তা হলে কি তারা চিরকাল বেঁচে

থাকে? আমরা যারা সাগরের তলায় বাস করি, আমাদের মতো ওরা মরে যায় না?”

ঠাকুমা উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আমাদের মতো ওরাও মরে যায়, এমন-কি, ওরা আমাদের চাইতে কম দিন বাঁচে। আমরা তো তিনশো বছর বাঁচি, কিন্তু মরে গেলে আমরা সমুদ্রের ফেনা হয়ে যাই, প্রিয়জনের কাছাকাছি একটা কবরের একটু ভাগও পাই না। আমাদের অমর আত্মা নেই, আমরা আবার জন্মাই না; ঘাস কেটে ফেললে যেমন চিরদিনের মতো শুকিয়ে যায়, আমরাও তেমনি মরে গেলে নিঃশেষ হয়ে যাই! মানুষদের কিন্তু আত্মা আছে; দেহ ধুলোর সঙ্গে মিশে গেলেও ওদের আত্মা বেঁচে থাকে। আমরা যেমন জল থেকে উঠে মুগ্ধ হয়ে মানুষদের বাড়িঘর দেখি, ওরাও তেমনি মরে গেলে আকাশ পারের অপূর্ব অজানা আবাসে উঠে যায়। সে জায়গা চোখে দেখবার আমাদের অধিকার নেই।”

ছোটো জলকন্যা বলল, “তা কেন? আমাদের কেন অমর আত্মা নেই? মরে যদি আকাশ পারের সেই স্বর্গে ঢুকবার অধিকার পাই, তা হলে আমি খুশি হয়ে এই তিনশো বছরের জীবনের বদলে একটিমাত্র দিন মানুষ হয়ে বাঁচতে চাই!”

ঠাকুমা বললেন, “ও কথা ভাবতে হয় না। এই যেমন আছি, এই ভালো। মানুষদের চেয়ে আমরা অনেক বেশি দিন বাঁচি আর অনেক বেশি সুখে থাকি।” ছোটো জলকন্যা কেঁদে বলল, “তবে কি আমাকে মরে গিয়ে ফেনার মতো সমুদ্রের উপরে আছড়ে পড়তে হবে, আর কোনোদিনও সুন্দর ফুল, আলোয় আলো সূর্য দেখতে পাব না! বল, ঠাকুমা, এমন কোনো উপায় নেই কি যাতে আমিও অমর আত্মা পাই?”

বুড়ি ঠাকুমা বললেন “না, বাছা, তবে এ কথাও সত্যি

যে, যদি কোনো মানুষ তোকে মা-বাপের চেয়েও বেশি ভালো-বাসে, সমস্ত প্রাণমন দিয়ে যদি সে তোকে ভালোবাসে, যদি পুরুতঠাকুর যখন তোদের দুজনার হাত এক সঙ্গে বেঁধে দেবেন, তখন সে প্রতিজ্ঞা করে যে, চিরদিন তোকে ছাড়া আর কাকেও মনে স্থান দেবে না, তা হলেই তার আত্মা তোর মধ্যেও প্রবাহিত হবে, আর তাই যদি হয়, তবেই তুই মানবজন্মের সুখের ভাগ পাবি। কিন্তু সে তো হবার জো নেই ; তার কারণ আমাদের দেহের যেটুকু আমাদের চোখে সবচাইতে সুন্দর, অর্থাৎ কিনা আমাদের ল্যাজটি, ওদের চোখে সেটিই হল সবচাইতে কুৎসিত, ওটিকে ওরা সইতে পারে না। ওদের চোখে সুন্দর দেখাতে হলে, দুটি আনাড়িপানা ঠেকো দরকার, তাকে ওরা বলে পা।”

ছোটো জলকন্যা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, মুখ ভার করে নিজের শরীরের আঁশে ঢাকা জায়গাটুকুর দিকে তাকিয়ে রইল ; শরীরের বাদবাকিটুকু কি ফরসা, কি সুন্দর !

বুড়ি ঠাকুমা বললেন, “আমরা কত সুখী রে, তিনশো বছর ধরে কেমন লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সাঁতরে কাটাতে পারি। সে তো অনেকদিন রে মানিক, তার পর মরে গিয়ে কেমন শান্তিতে ঘুমুব ! জানিস্, আজ সন্ধ্যায় রাজসভায় নাচ-গান হবে !”

রানীমা যে নাচের আসরের কথা বলছিলেন তেমন জমকাল ব্যাপার পৃথিবীতে কখনো দেখা যায় না। সভাঘরের দেয়ালগুলি স্ফটিক দিয়ে তৈরি, খুব পুরু, তবু কি স্বচ্ছ। দেয়ালে শত-শত বড়ো-বড়ো ঝিনুক বসান, কোনোটার রঙ গোলাপের মতো, কোনোটা ঘাসের মতো সবুজ। সবগুলি থেকে উজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে ; সেই আলোতে সভাঘর আলোয় আলোময়। কাঁচের মতো দেয়াল ভেদ করে সেই আলো জলের মধ্যে

কত দূরে ছড়িয়ে পড়েছে। অগুন্তি মাছ ভেসে বেড়াচ্ছে, ছোটো বড়ো লাল বেগনি সোনালি রুপোলি ; আলো লেগে তাদের গায়ের আঁশ ঝলমল করছে। সভাঘরের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে ঝিকমিকে নির্মল একটি জলের ধারা। সেই জলের ধারায় জল-মানবরা জলকন্যারা নাচছে আর মিষ্টি গলায় নাচের তালে তালে গান গাইছে।

ছোটো রাজকুমারী সবার চাইতে সুরেলা গলায় গান গাইল, সবাই হাত-তালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল। তাতে তার বড়োই আনন্দ হল। সে জানত সমুদ্রের নীচেই হোক, বা উপরের জগতেই হোক অমন মধুর কণ্ঠ কারও নেই। তবু খানিক বাদেই তার সমস্ত মন ভরে উঠল উপরের জগতের চিন্তায়। রাজপুত্রের কথা সে কিছুতেই ভুলে থাকতে পারত না ; একটা অমর আত্মা না থাকার দুঃখ রাখার জায়গা সে খুঁজে পেত না। রাজবাড়িতে সকলে আনন্দে মত্ত, শুধু ছোটো রাজকুমারী কাউকে না জানিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে, নিজের বাগানটিতে বসে চিন্তায় ডুবে রইল। সে বাগানের আজকাল কেউ যত্ন নেয় না।

হঠাৎ তার কানে এল জলের উপরে দূরে কোথায় শিঙা বাজছে। মনে মনে জলকন্যা বলল, 'যাকে আমি আমার মা-বাবার চেয়েও বেশি ভালোবাসি, সে এখন শিকারে বেরুল। ওকে এবং একটি অমর আত্মা পাবার জন্য আমি সব খোয়াতে রাজি। রাজবাড়িতে দিদিরা এখনো নাচ-গানে ব্যস্ত, এই বেলা যাই জাদুকরীর কাছে। এত-কাল তাকে কি ভয়ই-না করেছি, কিন্তু এখন সে ছাড়া কেউ আমাকে বুদ্ধিও দিতে পারবে না, সাহায্যও করতে পারবে না।'

ছোটো জলকন্যা বাগান ছেড়ে ফেনাভরা ঘূর্ণিজলের দিকে

চলল ; ঘূর্ণির ওপারে জাদুকরীর বাড়ি। এদিকে এর আগে সে কখনো আসে নি। এ পথে ফুল ফোটে না, সাগর তলার ঘাস গজায় না। অনেকখানি ন্যাড়া ধূসর বালি পার হয়ে সে ঘূর্ণিজলের কাছে পৌঁছল। ময়দা-পেষা কলের মতো সেখানকার জলগুলো কেবলই ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, নাগালে যা কিছু পাচ্ছে তাকেই ধরে পাক খাইয়ে অতল গভীরে ফেলে দিচ্ছে! জাদুকরীর এলাকায় পৌঁছতে হলে এই ভয়াবহ জায়গাটা পার হতে হয়। সেটি পেরিয়ে সামনে দেখে শ্যাওলাভরা একটা জলাভূমি টগবগ করে ফুটছে! জাদুকরী এ জায়গাকে বলত তার ঘাস-বিল।

তারও পরে বন, সেই বনে জাদুকরীর বাড়ি। বড়ো অদ্ভুত সে বাড়ি। তার চারধারের গাছপালা ঝোপঝাড় সব জ্যান্ত প্রাণী, দেখে মনে হয় যেন শত-শত মাথাওয়ালা সাপ না কেঁচো, মাটি থেকে গাছের মতো গজিয়েছে। তাদের ডালপালাগুলো পিছলা লম্বা হাতের মতো, আঙুলগুলোও যেন জোঁক। শিকড় থেকে মগ-ডাল অবধি সে গাছগুলো কেবলই নড়ছে চড়ছে, হাত বাড়াচ্ছে! যদি কিছু ঐ হাতে পড়ে, তার আর ছাড়া পাবার উপায় নেই।

সেই বিকট বনের দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল জলকন্যা ; ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করতে লাগল ; কাজ শেষ না করেই হয়তো সে ফিরে আসত, কিন্তু ঠিক সেই সময় রাজপুত্রের কথা, অমর আত্মার কথা মনে পড়ে গেল, আর ফিরে আসা হল না। অমনি মনে নতুন করে সাহস পেল। তখন জলকন্যা করল কি, লম্বা কোঁকড়া চুলগুলোকে এঁটে খোঁপা বেঁধে নিল, যাতে জন্তুগুলো না ধরতে পারে। তার পর বুকের উপরে হাত দুটিকে জড়ো করে নিয়ে জলের মধ্যে মাছ যেমন তীর বেগে ছুটে

ঘেড়ায়, তার চেয়েও বেগে ছুটে বীভৎস গাছগুলো পার হয়ে গেল। তাকে ধরবার জন্য তারা বৃথাই আঁকুপাকু করে হাত বাড়াল। পার হয়ে যাবার সময় রাজকুমারী দেখতে পেল প্রত্যেকটি বিকট হাতের মুঠির মধ্যে একটা কিছু ধরা রয়েছে, ছোটো-ছোটো আঙুলগুলো লোহার বাঁধনের মতো সেগুলোকে ধরে রেখেছে! কত ডুবে যাওয়া মানুষের সাদা কঙ্কাল, কত জাহাজের হাল, কত সিন্দুক, কত ডাঙার জানোয়ারের হাড়-গোড়, এমন-কি, ছোটো একটি মরা জলকন্যা, তাকে ডাল পালাগুলো ধরে, দম বন্ধ করে মেরেছে! কি ভয়ংকর দৃশ্যই-না দেখল হতভাগিনী রাজকুমারী!

সেই ভয়াবহ বন পার হয়ে জলকন্যা একটা শ্যাওলা-ঢাকা পিছল জায়গায় এল, সেখানে প্রকাণ্ড মোটা-মোটা সব গুগলি হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আর তারই মধ্যিখানে জাহাজডুবি

হয়ে প্রাণ হারান হতভাগ্য লোকদের হাড়-গোড় দিয়ে তৈরি একটা বাড়ি। বাড়ির সামনে জাদুকরী বসে একটা কোলাব্যাঙকে আদর করছিল, যেমন করে অনেকে পোষা পাখিকে আদর করে। কদাকার ভোঁদা গুগলিগুলোকে জাদুকরী বলত তার মুরগি-ছানা, ওর গায়ের চারদিকে তারা ঘুরে বেড়াত, বুড়ি কিছু বলত না।

ছোটো রাজকুমারীকে দেখেই জাদুকরী বলল, "তুমি কি চাও সে আমি ভালো করেই জানি। ঘোর বোকামি হলেও, সে ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হবে, ওগো রূপসী রাজকন্যে! অবিশ্যি তাতে তুমি দুঃখ ছাড়া আর কিছু পাবে না! ঠিক সময় বেছেই এসেছ যা-হোক; সূর্য-ডোবার পরে এলে, এক বছরের মধ্যে

তোমার জন্যে কিছু করতে পারতাম না। সাঁতরে যেও ডাঙার কাছে, তার পর সাগর-তীরে বসে, একটা ওষুধ দিচ্ছি, সেটি খেও! অমনি তোমার ল্যাজটি খসে শুকিয়ে মানুষরা যাকে পা বলে, তাই হয়ে যাবে। সে সময় কিন্তু বড়ো যন্ত্রণা পাবে, মনে হবে তোমার শরীরের মধ্যে ধারাল ছোরা চালান হচ্ছে। কিন্তু তার পরে যারাই তোমাকে দেখবে তারাই বলবে এমন সুন্দর মেয়ে কখনো দেখে নি। অপূর্ব লাবণ্যে ভরা থাকবে তোমার চলা-ফেরা, তোমার মতো হাল্কা পায়ে কেউ নাচতে পারবে না, কিন্তু পা ফেললেই মনে হবে বুঝি শান দেওয়া তলোয়ারের উপরে হাঁটছ, রক্ত ঝরছে। পারবে এত কষ্ট সইতে? পার তো তোমার ইচ্ছা পূরণ করি।"

কাঁপা কাঁপা গলায় রাজকুমারী বলল, "পারব।" মনে পড়ল রাজপুত্রের কথা, হয়তো অমর আত্মা পাবে সেই কথা। জাদুকরী বলল, "কিন্তু মনে রেখো, একবার মানুষের রূপ ধরলে আর কখনো জলকন্যা হতে পারবে না। আর কখনো বোনদের কাছে তোমার বাবার রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে পারবে না। তা ছাড়া রাজপুত্র যদি তোমাকে এতখানি ভালো না বাসে যে তোমার জন্য মা বাবাকে ছাড়তে পারে তার সব চিন্তাকে সব ইচ্ছাকে একা তুমি জুড়ে থাক আর যদি পুরুত এসে তোমাদের হাতে হাত মিলিয়ে বিয়ে না দেয়, তা হলে কিন্তু ঐ যে অমর আত্মাটি চাইছ, ওটি তোমার পাওয়া হবে না। যেদিন রাজপুত্র অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে, তার পর দিনই তোমার মৃত্যু হবে। দুঃখে তোমার বুক ফেটে যাবে, তুমি একটুখানি সমুদ্রের ফেনা হয়ে যাবে।"

যে মরতে বসেছে তারই মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল জল-

কন্যার মুখ, সারা গা কাঁপতে লাগল। তবু সে বলল, "সে সাহস আমার আছে।"

বুড়ি বলল, "তার উপরে আমি আছি, আমাকে দাম দিতে হবে। এত কষ্ট করব তোমার জন্যে, কাজেই যেমন তেমন দাম দিলেও চলবে না। সব সাগরবাসীদের মধ্যে তোমার গলার স্বরটি সবচাইতে মিষ্টি, হয়তো মনে ভেবেছ ঐ গলা দিয়েই রাজপুত্রের মন ভোলাবে, কিন্তু ঐটি আমার চাই। আমার এই জাদুর ওষুধের বদলে তোমার সেরা জিনিসটি আমাকে দিতে হবে, কারণ আমার নিজের গায়ের রক্ত না দিলে ওষুধে দো-ফলা তলোয়ারের ধারটি আসবে কেন?"

ছোটো রাজকুমারী বলল, "কিন্তু তুমি আমার গলার স্বরটি নিয়ে নিলে, রাজপুত্রকে মুগ্ধ করব কি দিয়ে?"

জাদুকরী বলল, "কেন, তোমার রূপ দিয়ে, তোমার কোমল লাবণ্যে ভরা চলা-ফেরা দিয়ে, তোমার ভাষাময় চোখ দুটি দিয়ে। এ-সব জিনিস দিয়ে মানুষদের দেমাকে ভরা মন ভোলান খুবই সহজ। কি হল? সব সাহস উবে গেল নাকি? ছোট্টো জিবটি এবার বের কর দিকিনি, কুচ করে কেটে আমার ওষুধের দাম উসুল করি।"

রাজকুমারী বলল, "বেশ, তাই হোক।" বুড়ি তখন কড়াই নিয়ে ওষুধ পাকাতে বসল। এক মুঠো ব্যাঙ আর গুগলী দিয়ে কড়াই মাজতে মাজতে জাদুকরী বলল, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মতো কিছু নেই বুঝলে?" তার পর নিজের বুক আঁচড়িয়ে কয়েক ফোঁটা কুচকুচে কালো রক্ত কড়াইতে ধরল, তার সঙ্গে কতরকম নতুন উপকরণ ঢালল। ওষুধের ধোঁয়া নানারকম বিকট আকার নিতে লাগল; গোঁ-গোঁ শব্দ বেরুতে লাগল, তার পর জাদুর ওষুধ বিশুদ্ধ জলের মতো টলটলে পরিষ্কার হয়ে গেল। ওষুধ তৈরি।

জাদুকরী বলল, "এই নাও ওষুধ।" এই বলেই রাজকুমারীর জিবটি কেটে নিল। বেচারি জলকন্যা অমনি বোবা হয়ে গেল, আর কথাও বলতে পারত না, গানও গাইতে পারত না।

জাদুকরী বলল, "আমার কুঞ্জবনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় জ্যান্ত গাছগুলো যদি তোমাকে ধরবার চেষ্টা করে তবে ওদের গায়ে কয়েক ফোঁটা ওষুধ ছিটিয়ে দিও, অমনি ওদের হাতগুলো হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।" অবিশ্যি তার দরকার হল না, জ্যান্ত গাছগুলো যেই দেখল জলকন্যার হাতে ওষুধের শিশিটি তারার মতো জ্বলজ্বল করছে, অমনি তারা সরে গেল। সেই ভয়ংকর বনের মধ্যে দিয়ে, জলাভূমি পার হয়ে, ফেনায় ভরা ঘূর্ণিজলের উপর দিয়ে, রাজকুমারী নিরাপদে চলে এল। যখন জলকন্যা রাজপুত্রের প্রাসাদের কাছে এসে, বড়ো চেনা ঘাটের শ্বেত পাথরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল, তখনো সূর্য ওঠে নি। শিশির আশ্চর্য ওষুধ খাবার সময় সে দেখল আকাশে তখনো চাঁদ রয়েছে। সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়ে যেন একটা ধারাল ছোরা চলে গেল, রাজকুমারী অচেতন হয়ে পড়ে গেল। সূর্য ওঠার সময় তার চেতনা ফিরে এল, সমস্ত অঙ্গে সে কি নিদারুণ ব্যথা। কিন্তু তাকিয়ে দেখল পাশে দাঁড়িয়ে তার এত ভালো-বাসার পাত্র সেই তরুণ রাজকুমার, তার ঘন কালো চোখ দিয়ে কি যেন জানতে চাইছে।

গভীর লজ্জায় চোখ নামাতেই জলকন্যা দেখল কোথায় তার সেই লম্বা মাছের ল্যাজটি, তার জায়গায় দুখানি কী সুন্দর পা। পরনে কিছু নেই, লম্বা ঘন চুলের গোছা দিয়ে রাজকুমারী গা ঢাকতে চেষ্টা করল। রাজপুত্র শুধোল, "কে তুমি? কি করে এখানে এলে?" উত্তরে রাজকুমারী মৃদু হেসে, দুটি উদ্ভাসিত নীল চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। হায়, তার

কথা বলার সাধ্য ছিল না। তখন রাজপুত্র তার হাত ধরে রাজবাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। পা ফেলতেই মনে হল যেন শান দেওয়া তলোয়ারের উপরে হাঁটছে ; খুশি হয়েই সে ব্যথা বইল। রাজকুমারী হেঁটে চলল, শরীর যেন বাতাসের মতো হাল্কা, চলা-ফেলার কী সুললিত ছন্দ।

রাজবাড়িতে পৌঁছলে পর তাকে দামী দামী মসলিন আর রেশম পরান হল। তার মতো রূপসী সেখানে কেউ ছিল না, কিন্তু সে কথাও কইতে পারত না, গানও গাইতে পারত না। রেশম আর সোনার কিংখাবের পোশাক পরে ক্রীতদাসীরা রাজা, রানী, রাজপুত্রের সামনে গান গাইল। একজনের গলা বড়ো মিষ্টি। তার গান শুনে রাজপুত্র হাততালি দিয়ে তারিফ করল। রাজকুমারীর সে কী দুঃখ, ওর নিজের গলার স্বর যে আরো বেশি মধুর ছিল। সে ভাবল, 'হায়, উনি যদি জানতেন ওঁর জন্যেই আমি চিরকালের মতো আমার গলার স্বরটি দিয়ে দিয়েছি !'

ক্রীতদাসীরা নাচতে শুরু করল। তখন রূপসী রাজকন্যাও উঠে এসে সুন্দর সাদা দুই বাহু তুলে নাচ ধরল। সে কি নাচ ! এতটুকু নড়লেই দেহের সুষমা, চলনের লাবণ্য উপচিয়ে পড়ে। যে দেখে সে চোখ ফেরাতে পারে না। ক্রীতদাসীদের মধুর গানের চেয়েও রাজকন্যার দুই চোখের নীরব ভাষা তাদের হৃদয়ের মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছল। সবাই মুগ্ধ হল, বিশেষ করে রাজপুত্র। সে বলল, "এ আমার বড়ো আদরের কুড়িয়ে পাওয়া ধন।"

বারেবারে রাজকুমারী নাচ দেখাল, প্রতি পদক্ষেপে সে কি অসহ্য বেদনা! শেষে রাজপুত্র বলল, "তুমি সদাই আমার কাছে থেকো।" সেই ব্যবস্থাই হল। রাজপুত্রের নিজের মহলে, তার শোবার ঘরের লাগোয়া ঘরে, মখমলের গদি বিছিয়ে

রাজকুমারীর শোবার জায়গা হল। রাজপুত্র তার জন্যে পুরুষদের মতো পোশাক করাল, তাই পরে সে তার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে বলে। সুগন্ধে বনভূমি ম-ম করত, সবুজ শ্যামল গাছের ডালপালা তাদের গায়ে স্পর্শ করত, নতুন পাতার আড়ালে পাখিরা আনন্দে গান গাইত। রাজপুত্রের সঙ্গে জলকন্যা খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠত, কচি পায়ে রক্ত ঝরত, রাজকুমারী হাসত আর ভালোবাসার ধন রাজপুত্রের পায়ে পায়ে পাহাড়-চুড়োয় গিয়ে উঠত। সেখান থেকে দেখতে পেত নীচে মেঘেরা লুকোচুরি খেলছে, পাখির ঝাঁক ভিন দেশে উড়ে যাচ্ছে।

রাতে যখন রাজবাড়ির সকলে ঘুমিয়ে থাকত, রাজকুমারী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসত, শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে, অগাধ জলে পা ডুবিয়ে শীতল করতে চাইত। তখন সাগর-তল-বাসী তার সেই-সব প্রিয়জনদের কথা মনে পড়ত।

একদিন সে সাগরের জলে পা ধুচ্ছে, এমন সময় একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে, তার দিদিরা সবাই গান গাইতে গাইতে উঠে এল। সে গান বড়ো করুণ। ছোটো জলকন্যা হাতছানি দিয়ে তাদের কাছে ডাকল। তাকে দেখেই তারা চিনল, কত দুঃখের কথাই-না তাকে বলল, তার অভাবে তার বাপের বাড়ির সবাই কত কাতর। তার পর থেকে দিদিরা রোজ রাতে তাকে দেখতে আসত। একদিন বুড়ি ঠাকুমা এলেন, কত কাল তিনি উপরের জগৎ দেখেন নি। মাথায় মুকুট পরে, তাদের বাবা জলরাজ নিজে এলেন একদিন তাকে দেখতে। কিন্তু তাঁদের বয়স হয়েছে, ডাঙার কাছে কেউ এলেন না, ছোটো রাজকুমারীর সঙ্গে কথা বলা হল না।

ছোটো রাজকুমারীর উপর রাজপুত্রের টান দিনে দিনে বাড়তে লাগল। কিন্তু রাজকুমারীকে তার মনে হত মিষ্টি একটি

ছোটো মেয়ে, তাকে বিয়ে করার কথা স্বপ্নেও কখনো মনে হয় নি। কিন্তু বিয়ে না হলে তো সে অমর আত্মা পাবে না, বিয়ে না হলে তাকে যে এক মুঠো ফেনা হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ভেসে বেড়াতে হবে!

রাজপুত্র তাকে আদর করে, যখন সুন্দর কপালে চুমো খেত, জলকন্যার চোখ দুটি জিজ্ঞাসা করত, 'তুমি কি আমাকে সবার চেয়ে বেশি ভালোবাস?'

রাজপুত্র বলত, "হ্যাঁ, তোমার মতো ভালো আর কেউ নেই, তোমাকেই সব চেয়ে বেশি ভালোবাসি। তুমিও আমাকে কত ভালোবাস। তোমাকে দেখে আমার আরেকটি মেয়ের কথা মনে পড়ে, তাকে একবার মাত্র দেখেছি, আর হয়তো দেখা হবে না। জাহাজে ছিলাম হঠাৎ ঝড় উঠে জাহাজডুবি হল। ঢেউগুলো আমাকে নিয়ে তীরে আছড়ে ফেলল পবিত্র এক মন্দিরের সামনে। সেখানে কয়েকজন মেয়ে দিনরাত সাধন-ভজন নিয়ে থাকে। ওদের মধ্যে যে সবার ছোটো সে আমাকে সাগর তীরে দেখতে পেয়ে, আমার প্রাণ বাঁচাল। একটিবার মাত্র তাকে দেখেছি, কিন্তু তার মুখখানি আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে, তাকে ছাড়া আর কাউকে আমি ভালোবাসতে পারব না। তবে সে তো মন্দিরে উৎসর্গ করা। তুমি তার মতোই দেখতে। মনে যাতে সান্ত্বনা পাই তাই তোমাকে পেলাম, তোমাকে কখনো কাছ-ছাড়া করব না।"

বুক-ভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জলকন্যা ভাবল, 'হায়, উনি জানেনও না যে আমিই ওঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলাম।' একদিন সভাসদরা বলাবলি করতে লাগল, "পাশের রাজ্যের রাজার মেয়ের সঙ্গে আমাদের রাজপুত্রের বিয়ে হবে। তাই ঐ চমৎকার জাহাজ সাজান হচ্ছে। সবাই জানে রাজপুত্র বিদেশে বেড়াতে

যাচ্ছে, কিন্তু আসলে রাজকন্যেকে দেখতে যাচ্ছে। এ ধরনের কথা শুনলে ছোটো জলকন্যার হাসি পেত; আর কেউ না জানুক সে তো রাজপুত্রের মনের কথা জানত।

একদিন রাজপুত্র বলল, "আমাকে যেতেই হবে ; গিয়ে সেই সুন্দরী রাজকন্যেকে দেখে আসতে হবে। মা-বাবার বড়ো সাধ। অবিশ্যি তাই বলে সে মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনতে কেউ আমাকে বাধ্য করতে পারবে না। তাকে ভালোবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব, তার তো আর তোমার মতো মন্দিরের সেই রূপসীর সঙ্গে সাদৃশ্য থাকতে পারে না। বিয়ে যদি করতেই হয়, ওরে আমার কুড়িয়ে-পাওয়া মুখ-চোরা ধন, চোখ যার কথা বলে, তার চেয়ে বরং তোমাকেই আমার বেশি পছন্দ! এই বলে রাজপুত্র তাকে চুমো খেয়ে, চুলে হাত বুলিয়ে, বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করল। আর জলকন্যার মনের মধ্যে ফুটে উঠল মানব-জন্মের সুন্দর আর অনন্ত আনন্দের মধুর এক ছবি। চমৎকার সুসজ্জিত জাহাজে করে ওরা পাশের রাজ্যের রাজার কাছে যাচ্ছে; দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, এমন সময় রাজপুত্র বলল, "ও আমার মিষ্টি মেয়ে, মুখে যার কথা নেই, তুমি সাগর দেখে ভয় পাবে না তো?" তার পর রাজপুত্র তাকে সমুদ্রের ঝড়ের কথা বলল, সাগর-জল তখন কেমন খ্যাপা হয়ে ওঠে, গভীর জলের মাছদের কথা বলল, ডুবুরীরা সমুদ্রের তলায় কি অদ্ভুত সব জিনিস দেখতে পায়, সে কথা বলল। জলকন্যা শুধু একটু হাসল। অগাধ সাগরের তলার কথা সে যেমন জানে, ডাঙার মানুষদের ছেলেমেয়েরা কি করেই-বা জানবে?

রাতে চারদিকে চাঁদের আলো ফুটফুট করত, জাহাজের সবাই ঘুমে আচ্ছন্ন, পাটাতনে একা বসে ছোটো রাজকুমারী জলের নীচে চেয়ে দেখত। জাহাজের খোল যে ফেনার রেখা

এঁকে যাচ্ছিল, ওর মনে হচ্ছিল তার ভিতর দিয়ে যেন বাবার প্রাসাদ, ঠাকুমার রুপোলি মুকুট দেখতে পাচ্ছে। তার পর দেখল যেন দিদিরা জলের উপরে ভেসে উঠে ওর দিকে হাত বাড়াচ্ছে মুখে তাদের কী করুণা! ছোটো রাজকুমারী তাদের দিকে মাথা নেড়ে, হেসে, জানাতে চাইল যে সে যেমনটি চেয়েছিল সব ঠিক তেমনি হবে। ঠিক সেই সময় জাহাজের ছোকরা চাকর এসে দেখা দিল, আর দিদিরা এমনি হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল যে, সে ভাবল বুঝি ঢেউয়ের মাথায় যা দেখল সে শুধু ফেনা ছাড়া আর কিছু নয়।

পরদিন সকালে রাজার জমকাল রাজধানীর বন্দরে এসে জাহাজ পৌঁছল। কেউ ঘণ্টা বাজাল; কেউ শিঙায় ফুঁ দিল; পতাকা উড়িয়ে, তলোয়ারের ঝলক দিয়ে, সেনাদল শহরের মাঝখান দিয়ে মিছিল করে চলল। মহা ধুমধাম হল, রোজ-রোজ নতুন ধরনের উৎসব, নাচ-গান, ভোজের পর ভোজ। তবে রাজকন্যা তখনো শহরে এসে পৌঁছয় নি। অনেক দূরে কোনো আশ্রমে তাকে পাঠান হয়েছিল লেখা-পড়া আর রাজ-বংশের যোগ্য নানা বিদ্যা শিখতে। অবশেষে একদিন সে রাজবাড়িতে ফিরে এল।

তার সঙ্গে দেখা হবামাত্র রাজপুত্র বলে উঠল, "এ যে সে-ই! যখন মরার মতো সমুদ্রের ধারে পড়েছিলাম, এ-ই তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল?" রাজকন্যার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। রাজপুত্র তাকে আলিঙ্গন করল।

কুড়িয়ে-পাওয়া বোবা মেয়েকে রাজপুত্র বলল, "আজ আমার কত সুখ! যা কখনো আশা করি নি, শেষে তাই হল। আমার সুখে তুমিও সুখী হও, আমাকে যারা ঘিরে থাকে, তাদের মধ্যে কেউ আমাকে তোমার মতো ভালোবাসে না।" বুক ভরা

নীরব বেদনা নিয়ে জলকন্যা রাজপুত্রের হাতে চুমো খেল। মন্দিরের ঘণ্টা আবার বেজে উঠল, বর-কনে পরস্পরের হাতে হাত দিয়ে পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করল ; তাদের বিয়ে হয়ে গেল। রেশম আর সোনালি জরির পোশাক পরে, বিয়ের কনের লুটান আঁচলের কোণা ধরে, তার পিছনে ছোটো জলকন্যা দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু তার কানে সেই সুগম্ভীর বাজনা পৌঁছয় নি, তার চোখ দুটিও সেই পবিত্র অনুষ্ঠানের কিছুই দেখতে পায় নি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এবার জীবন শেষ হয়ে গেল, ইহলোক পরলোক দুই-ই খোয়া গেল। সেদিনই সন্ধ্যায় বর-কনে জাহাজে উঠল ; কামান ছোঁড়া হল, বাতাসে পতাকা উড়ল, পাটাতনের মাঝখানে বেগনি আর সোনালি কিংখাবের চমৎকার চাঁদোয়া তোলা, তার তলায় কী জমকাল, কী নরম, কী আরামের সব কুরশি-কেদারা। এইখানে রাজপুত্র আর রাজকন্যা রাত কাটাবে। অনুকূল বাতাসে পাল ভরে উঠল, নীল জলের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে জাহাজ ভেসে চলল।

যেই অন্ধকার নামল, রঙিন বাতি ঝোলান হল, পাটাতনে নাচ-গান শুরু হল। ছোটো জলকন্যার মনে পড়ে গেল, প্রথমবার জলের উপরে উঠে এই দৃশ্যই সে দেখেছিল! আজকের উৎসবও তেমনি জমকাল। তাকে আজ নাচে যোগ দিতে হল, পাখির মতো হাল্কাভাবে জাহাজের কাঠের মেঝের উপর সে যেন ভেসে বেড়াতে লাগল। সবাই তার প্রশংসা করল, এমন অপূর্ব ললিত ভঙ্গিতে আগে কখনো সে নাচে নি। ছোটো-ছোটো পা দুটিতে সে কী নিদারুণ যন্ত্রণা, কিন্তু আর সে বোধ ছিল না, হৃদয়ের বেদনা তার শত গুণ বেশি।

যার জন্য ঘরবাড়ি প্রিয়জন ছেড়ে এসেছে, আজ সন্ধ্যায় এই তার সঙ্গে শেষ দেখা। এরই জন্য তার অমন সুন্দর কণ্ঠ

গেছে, এরই জন্য রোজ কি অসহ্য বেদনাই-না সয়েছে, অথচ সে ঘুণাক্ষরে কিছু টের পায় নি। ভালোবাসার মানুষটি যে বাতাসে নিশ্বাস ফেলে, আজ সন্ধ্যার পর আর সে বাতাস দিয়ে সে বুক ভরবে না। আর কোনো সন্ধ্যায় ঘন নীল সমুদ্র দেখবে না, তারা ভরা আকাশ দেখবে না। এর পর শুধু অসীম রজনী, আর সে কিছু ভাববেও না, স্বপ্নও দেখবে না। জাহাজে সে কী আনন্দ! বুক ভরা মরণের চিন্তা নিয়ে, জলকন্যা সকলের সঙ্গে মাঝরাতের পর অবধি হাসল, নাচল। তার পর রাজপুত্র তার রূপসী কনেকে চুমো খেয়ে, সুন্দর করে সাজান শিবিরে শুতে গেল।

চারদিক নিস্তব্ধ; হাল ধরে মাঝি একলা দাঁড়িয়ে। শুভ্র বাহুতে ভর দিয়ে ছোটো জলকন্যা ভোরের অপেক্ষায় পুব দিকে চেয়ে রইল। সে জানত যে প্রথম সূর্যের আলো দেখা গেলেই, সে ফেনা হয়ে যাবে। দেখলে দিদিরা জল থেকে ভেসে উঠেছে। মুখগুলি তাদের মরার মতো সাদা, লম্বা চুল আর পিঠে লুটোচ্ছে না, সব ছোটো করে কাটা।

তারা বলল, "চুলগুলো জাদুকরীকে দিয়ে এসেছি, যাতে সে তোমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদের সাহায্য করে। এই নাও ছুরি। সূর্য ওঠার আগে রাজপুত্রের বুকে বসিয়ে দাও। ওর গরম রক্ত তোমার পায়ে পড়লেই পা দুটি আবার লম্বা মাছের ল্যাজ হয়ে যাবে, তুমিও আবার জলকন্যা হয়ে যাবে, সমুদ্রের ফেনা হয়ে যাবার আগে তিনশো বছর বাঁচবে। তাড়াতাড়ি কর। সূর্য ওঠার আগে হয় তাকে, নয় তোমাকে মরতে হবে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সূর্য উঠবে, তার পর আর তোমার গতি নেই! এই বলে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

যেখানে রাজপুত্র আর রাজকন্যা ঘুমিয়ে ছিল, জলকন্যা তার বেগনি পরদা সরাল। তার পর ঝুঁকে পড়ে রাজপুত্রের কপালে চুমো খেল, আকাশের দিকে চেয়ে দেখল ভোরের আলো ক্রমে ফুটে উঠছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাজপুত্র তার কনের নাম উচ্চারণ করল, তাকে ছাড়া স্বপ্নেও আর কারও চিন্তা নেই! হতভাগিনী জলকন্যার হাতের ছুরি কাঁপতে লাগল। হঠাৎ সেটিকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে আর একবার ভালোবাসার মানুষটিকে দেখল, চোখের দৃষ্টি ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছিল। তার পর জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিল।

বুঝতে পারল শরীরটা আস্তে আস্তে গলে গিয়ে ফেনা হয়ে যাচ্ছে; জল থেকে সূর্য উঠল, কোমল গরম কিরণগুলি জলকন্যার গায়ে পড়ল, সে যে মরে যাচ্ছে সে কথা প্রায় টেরই পাচ্ছিল না। তখনো অপূর্ব গৌরবময় সূর্য দেখতে পাচ্ছিল। মাথার উপর হাজার হাজার জলের মতো স্বচ্ছ সুন্দর ওরা কারা ভেসে বেড়াচ্ছে? বাতাসে তৈরি তাদের কি মধুর গলার স্বর, মন শান্তিতে ভরে যায়। ও তাদের ভালো করে দেখতে পাচ্ছিল না; ডাঙার মানুষদের তাদের স্বর শুনবারও সাধ্য নেই। ওরা এত হাল্কা যে ডানা ছাড়াই চারদিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল ছোটো জলকন্যা চেয়ে দেখল ওর নিজেরও তাদের মতো হাল্কা দেহ হয়েছে, সমুদ্রের ফেনার উপর থেকে ধীরে ধীরে সে কেমন আকাশে ভেসে উঠছে!

ছোটো জলকন্যা বলল, "ওরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?" ওদেরই মতো মধুর তার স্বর।

কে একজন উত্তর দিল, "তুমি কি বাতাসের মেয়েদের কথা বলছ? জলকন্যাদের অমর আত্মা থাকে না, মানুষের ছেলের ভালোবাসা পেলে তবেই সেই স্বর্গীয় গুণটি লাভ করে।

মানুষের সঙ্গে মিলন হলে, তবে সে অমর হয়। বাতাসের মেয়েদেরও অমর আত্মা থাকে না, কিন্তু ভালো কাজ করলে তারা অমর হয়। গরম দেশের শুকনো হাওয়ায় মানুষরা অবসন্ন হয়ে পড়ে, আমরা সেখানে যাই ; আমাদের শীতল নিশ্বাসে তারা সুস্থ হয়। আমরা বাতাসে ছড়িয়ে থাকি ; ফুলের সুগন্ধ দিয়ে বাতাসকে মধুর করে রাখি, সমস্ত পৃথিবীতে আনন্দ আর স্বাস্থ্য ছড়াই। তিনশো বছর এভাবে কাটালে আমরা অমর হই, মানুষরা যে সীমাহীন আনন্দ ভোগ করে, তার ভাগ পাই।

"আর তুমি, দুঃখিনী জলকন্যা, মনের বাসনা পূর্ণ করতে গিয়ে কত-না দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছ, তাই তুমি বাতাসের অপার্থিব জগতে আসতে পেরেছ। তিনশো বছর ভালো কাজ করলে, তুমিও অমর আত্মা লাভ করবে।"

স্বচ্ছ বাহু দুটি জলকন্যা সূর্যের দিকে তুলে ধরল, জীবনে এই প্রথম তার চোখের পাতা জলে ভিজে এল।

এদিকে জাহাজে সকলে জেগে উঠে উৎসবের আনন্দে মেতেছে। জলকন্যা রাজপুত্রকে আর রূপসী রাজকন্যাকে দেখতে পেল। ওরা ওকে খুঁজে পায় নি। মনের দুঃখে ফেনায় ভরা জলের দিকে ওরা চেয়েছিল, যেন বুঝতে পেরেছিল ও জলে ঝাঁপ দিয়েছে! অদৃশ্যভাবে রাজপুত্রের কপালে একটি চুমো খেয়ে, জলকন্যা জাহাজের মাথার উপরকার শান্ত গোলাপি মেঘের অনেক উপরে উড়ে চলে গেল। "তিনশো বছর পরে আমরা স্বর্গলোকে পৌঁছব।" এক বোন কানে-কানে বলল, "তারও আগে পৌঁছান যায়। যেখানেই মানুষের ঘরে ছেলেমেয়ে আছে, আমরা সেখানে যাই; কেউ আমাদের দেখতে পায় না। যদি কোথাও দেখি লক্ষ্মী ছেলেমেয়ে মা-বাবাকে সুখী করে তাঁদের ভালোবাসার যোগ্য হয়ে উঠছে, আমাদের তিনশো বছরের মেয়াদ থেকে এক বছর কমে যায়। যদি দেখি বেয়াড়া দুষ্টু ছেলেমেয়ে, আমরা করুণভাবে কাঁদি আর এক-এক ফোঁটা চোখের জলে আমাদের মেয়াদ একদিন করে বেড়ে যায়।"

সত্যিকার রাজকন্যার কথা

এক রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর রাজকন্যা বিয়ে করার বড়ো শখ। তাই বলে যে-সে রাজকন্যা হলে চলবে না, সত্যিকার রাজকন্যা হওয়া চাই। সেইরকম পাত্রীর খোঁজে গোটা পৃথিবী ঢুঁড়ে ফেলা হল, কিন্তু সব জায়গায় একটা না একটা খুঁত বেরিয়ে পড়ে! রাজকন্যা অনেক দেখা হল, কিন্তু তারা যে সত্যিকার রাজকন্যা, তাই-বা কি করে বলা যায়? রাজপুত্রের ধারণা হয়ে গেল যে, সব পাত্রীরই একটা-না-একটা কিছু যেমনটি হওয়া উচিত, তেমনটি নয়।

শেষপর্যন্ত তিনি নিজের প্রাসাদে ফিরে এলেন। মন বড়ো খারাপ। এত সাধ, সত্যিকার রাজকন্যা বিয়ে করেন, তা সে হল কই?

একদিন সন্ধেবেলায় ভীষণ ঝড় উঠল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল, বাজ পড়ল, আকাশ থেকে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামল, চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার হয়ে এল, তারই মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল সদর দরজায় কে যেন জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। রাজপুত্রের বাবা, বুড়ো-রাজা, নিজে গিয়ে দোর খুললেন।

বাইরে একজন রাজকন্যা দাঁড়িয়ে। ঝড়বৃষ্টির মাঝে পড়ে তার যা অবস্থা! চুল থেকে ঝরনা বইছে, জামা-কাপড় ভিজে গায়ে

লেপটে রয়েছে। সে বলল সে একজন সত্যিকার রাজকন্যা। বুড়ি রানী-মাও মনে মনে বললেন, 'আচ্ছা, সে দেখা যাবে'খন!' তাঁর মতলবখানি তিনি ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলেন না। নিঃশব্দে শোবার-ঘরে গিয়ে, খাট থেকে সমস্ত বিছানাপত্র নামিয়ে, তক্ত

উপর তিনটি মটর-দানা রাখলেন। তার উপর কুড়িটা তুলোর গদী চাপালেন, তার উপর আরো কুড়িটা পালকের তোষক রাখলেন।

ঐ বিছানায় রাজকন্যা রাত কাটালেন।

পরদিন সকালে, রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হল, "কেমন ঘুম হল ?" রাজকন্যা বলল, "কিসের ঘুম ! সারা রাত চোখের দু পাতা এক করতে পারলে, তবে তো ঘুম ! বিছানার মধ্যে কি ছিল তা জানি না, কিন্তু মনে হল শক্ত কিছু। বাবা ! সারা গায়ে কালশিটে পড়ে গেছে আর সে কি ব্যথা !"

তখন স্পষ্ট বোঝা গেল যে এ মেয়ে সত্যিকার রাজকন্যা না হয়ে যায় না, নইলে কে আর কুড়িটা তুলোর গদী আর কুড়িটা পালকের তোষকের মধ্যে দিয়ে তিনটি ক্ষুদে মটর-দানার অস্তিত্ব টের পাবে ? এমন সূক্ষ্ম বোধশক্তি সত্যিকার রাজকন্যা ছাড়া আর কারই-বা থাকতে পারে ?

রাজপুত্রও নিশ্চিন্ত হলেন যে, অবশেষে একজন সত্যিকার রাজকন্যা পাওয়া গেছে। কাজেই তাকে বিয়ে করে ফেললেন। মটর-দানা তিনটিকে নিয়ে অন্যান্য অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য জিনিসের সঙ্গে একটা সিন্দুকে রাখা হল। এতদিনে যদি না হারিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সেখানেই তারা এখনো আছে।

রাজকন্যার কেমন মিহি বোধশক্তি বল তো ?

লাট্টু আর বলের কথা

একটা দেরাজের ভিতরে অনেকরকম খেলনার সঙ্গে একটা লাট্টু আর একটা বল পাশাপাশি রাখা ছিল।

বলকে লাট্টু বলল, "এতই যখন আমাদের কাছাকাছি রাখা হয়, তখন আমরা বর-কনে হয়ে যাই-না-কেন ?"

বলটা মিহি মরক্কো চামড়ার তৈরি। তার ধারণা সে একজন হাল ফ্যাশানের বিবি। তা সে লাট্টুর কথা শুনবে কেন ? পরদিন খেলনাগুলোর মালিক দেরাজের কাছে এল। আসলে সে একটি ছোটো ছেলে। লাট্টুর গায়ে সে লাল, হলুদ রঙ মাখাল আর পেটের মাঝখান দিয়ে একটা পিতলের পেরেক ঠুকে দিল। তার পর যখন লাট্টুটাকে ঘোরাল, কি চমৎকার দেখতে লাগল !

লাট্টু তখন বলকে বলল, "একবার আমার দিকে তাকাও দিকিনি। এখন কিরকম মনে হচ্ছে ? বর-কনে হব নাই-বা কেন, বল ? দিব্যি মানাবে দুজনাকে ! তুমি লাফাতে পার, আমি ঘুরতে পারি। আমাদের যদি বিয়ে হয়, আমাদের মতো মানিকজোড় খুঁজে পাওয়া দায় হবে।"

বল বলল, "তোমার তাই মনে হয় বুঝি? জান, আমার মা-বাবা ছিলেন মরক্কো চামড়ার চটি আর আমার গায়ের মধ্যে কর্ক আছে!"

লাট্টু বলল, "তা হতে পারে, তবে আমার গায়েও মেহগনি কাঠ আছে; মোড়লমশাই নিজের হাতে আমাকে গড়েছেন; তাঁর নিজের র‍্যাঁদা আছে; আমাকে গড়তে গিয়ে তিনি সে কি খুশি!"

বল বলল, "ঠিক বলছ তো?"

লাট্টু বলল, "মিথ্যা বললে যেন আর না ঘুরি!"
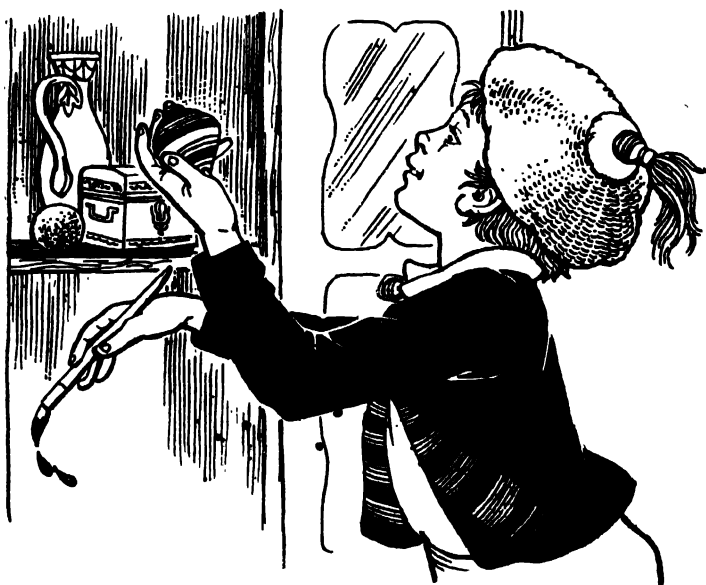
বল বলল, "কথাবার্তা তোমার মন্দ নয়, কিন্তু আমি তো আর স্বাধীন নই। একটা শ্যামা পাখির সঙ্গে আমার বিয়ের কথা একরকম পাকা হয়ে আছে। যেই আমি আকাশে উঠি, পাখিটাও অমনি বাসা থেকে মুণ্ডু বের করে বলে, 'আমাকে বিয়ে করবে?' মনে মনে তাকে কথা দিয়েই ফেলেছি, তার সঙ্গে পাকা কথার কি তফাত গা? তবে একটা কথা বলে রাখি, তোমাকেও আমি কখনো ভুলব না।"

লাট্টু বলল, "তাতে তো আমার ভারি সুবিধা হল! এর পর এ বিষয়ে আর কোনো কথা হয় নি।

তার পর দিন বলটাকে বের করা হল। লাট্টু তাকে পাখির মতো আকাশে উড়ে যেতে দেখল, সে এত উঁচুতে যে চোখ অতদূর যায় না। অবিশ্যি আবার বল ফিরে এল। কিন্তু যতবার নেমে মাটি ছোঁয়, ততবার লাফিয়ে আরো উঁচুতে ওঠে! এর কারণ, হয় প্রেম, নয় ওর গায়ের ভিতরে সেই কর্ক!

নয় বারের বার বল আর ফিরে এল না। ছেলেটা কত খুঁজল, কিন্তু কোথাও তাকে পেল না। সে গেল তো গেলই!

লাট্টু মনে মনে বলল, 'আমি বেশ জানি বলটা কোথায় গেছে। নিশ্চয়ই শ্যামা পাখির বাসায়। সেখানে নিশ্চয় বিয়ের বাদ্যি বাজছে।' লাট্টু যতই এ-সব কথা ভাবে, বলকে ততই সুন্দরী বলে মনে হয়। ওর সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না বলে যেন ওর ভালোবাসাটাও দ্বিগুণ বেড়ে যায়! ওর চাইতে বলের আরেকজনকে বেশি পছন্দ, তাই-বা সে কেমন করে ভোলে! লাট্টু ঘোরে, গুন্ গুন্ শব্দ বেরোয়, কিন্তু মন পড়ে থাকে তার আদরের বলটির কাছে। কল্পনার চোখে তাকে দিনে দিনে বেশি ভালোবাসার পাত্রী বলে মনে হয়। এইভাবে কয়েক বছর কাটল। লাট্টুর ভালোবাসা এতটুকু টস্‌কাল না।

এখন লাট্টুর যৌবন গিয়েছে। একদিন কিন্তু তার সারা গায়ে সোনালি রঙ লাগান হল, অমনি আগের চাইতেও বেশি করে রূপ খুলে গেল। এখন সে হয়েছে গিল্টি করা লাট্টু, যেমনি খাসা ঘোরে, তেমনি গুন্ গুন্ শব্দ করে, তার গুণের আর অন্ত নেই। এমন সময় হঠাৎ একদিন বড়ো বেশি উঁচু লাফ দিয়ে ফেলে, সে-ও হল অদৃশ্য! ওরা কত খুঁজল, মাটির নীচের গুদোমঘরটি পর্যন্ত বাদ দিল না। তবে গেল কোথায়?

নালার মুখে একটা পিপে বসান ছিল, তাতে যত রাজ্যের ফালতু জিনিস জমা হত, বাঁধাকপির বোঁটা, আঁস্তাকুড়ের ময়লা, ঝাঁটার ধুলো, এই-সব। তারই মধ্যে লাট্টু গিয়ে পড়ল।

লাট্টু বলল, "হায়, হায়, এখানে পড়ে থেকে থেকে আমার এমন খাসা গিল্টি করা রঙ যাবে জ্বলে! আর কি বাজে সব আবর্জনার মধ্যেই-না পড়া গেছে!" এই বলে সে তাকিয়ে দেখে কি বিশ্রীরকম গা ঘেঁষে পড়ে আছে লম্বা একটা বাঁধাকপির বোঁটা আর কতকটা আপেলের মতো দেখতে, অদ্ভুত একটা গোল জিনিস। ওটা কিন্তু মোটেই আপেল নয়; ওটা আসলে একটা পুরনো বল, অনেক বছর নালায় পড়ে থেকে থেকে জলে ভিজে একাকার!

বলটা গিল্টি করা লাট্টুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, "ভাগ্যি ভালো, এতদিন পর কথা বলার একটা সঙ্গী পাওয়া গেল; জান, আমি মরক্কো চামড়া দিয়ে তৈরি; একজন অল্প-বয়সী মহিলা আমাকে নিজের হাতে সেলাই করেছেন; আমার শরীরে কর্ক আছে। কিন্তু কেউ আর এখন আমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। একটা শ্যামা পাখির সঙ্গে আমার বিয়ে হয় হয়, এমন সময় নালার মধ্যে পড়ে গেলাম! সেখানে পাঁচ বছর পড়ে রইলাম; শেষটা জলে ধুয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছি। একজন অল্পবয়সী মেয়ের পক্ষে এমন অবস্থায় পড়াটা কি সর্বনাশ বল দিকি!"

লাট্টু কোনো উত্তর দিল না। তার বহু দিনের হারান সঙ্গিনীর কথা মনে পড়ে গেল। এর কথা শুনে শুনে মনে হতে লাগল—তবে এই নির্ঘাৎ সেই!

এমন সময় বাড়ির দাসী এসে পিপেটা উলটে ফেলতে গিয়ে

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "কি মজা! এই তো সেই গিল্টি করা লাট্টুটা।"

তখন লাট্টুকে আবার খেলাঘরে নিয়ে আসা হল। সবাই তাকে নিয়ে আবার খেলতে লাগল আর তারিফ করতে লাগল। কিন্তু বলের কথা কেউ কিছুই বলল না। এমন-কি, লাট্টু নিজেও আর কোনোদিনও তার সেই পুরনো ভালোবাসার কথা মুখেও আনল না। ততদিনে ভালোবাসাটা নিশ্চয় একবারে কেটে গেছিল। আর তা হবে নাই-বা কেন? পাঁচবছর বৃষ্টির জল যাবার নালায় শুয়ে থেকে থেকে বলের সেই রূপ-জৌলুস কোথায়? তার পর পিপের মধ্যে আঁস্তাকুড়ের ময়লার মাঝখানে যখন তার দেখা মিলল, তখন তাকে চেনাই দায়!

ঘোড়া-গমের কথা

একরকম গম আছে যা মানুষে বড়ো খায় না, কিন্তু গোরু-ঘোড়া খুব খায়। তাকে অনেকে ঘোড়া-গম বলে থাকে। ঝড়ের পর যদি ঘোড়া-গমের খেতের মধ্যে দিয়ে যাও, দেখবে সব কালোয় কালো, যেন আগুনে জ্বলে গেছে। চড়াই পাখির কাছে যেমন যেমন শুনেছি, তেমন বলছি, কেন এবং কিসের জন্য এমন হয়। শস্য আর ঘোড়া-গমের খেতের পাশে একটা বুড়ো উইলোগাছ ছিল, কারণটা চড়াই তার কাছে শুনেছিল। ফল ধরেছে বলে শস্য গাছ কি খুশি আর কৃতজ্ঞও বটে, যতই তাদের শীষগুলি ভরে ওঠে ততই তারা মাটির দিকে মাথা নোয়ায়। ঘোড়া-গমের বেজায় দেমাক, সদাই মাথা উঁচু করে খাড়া হয়ে থাকে।

সে বলে, "শস্যের যত সোনালি শীষ, আমারও তত সোনালি শীষ, তার উপর দেখতে আমি ঢের ভালো। আমার ফুলগুলো আপেলফুলের মতো সুন্দর। বলি, 'ওহে বুড়ো উইলো, আমার চাইতে সুন্দর কাউকে দেখেছ কখনো ?' " শুনে উইলো-গাছ খালি মাথা নাড়ল।

ঘোড়া-গম বলল, "আরে, এ গাছটা কি বোকা রে ! এত বুড়ো-হাবড়া, ওর মগজের মধ্যে ঘাস গজিয়েছে !"

ঠিক সেই সময় ভীষণ ঝড় উঠল। খেতের যত ছোটো ফুল ছিল, তারা সবাই পাপড়ি মুড়ে, ক্ষুদে-ক্ষুদে মাথাগুলো নোয়াল। ঘোড়া-গম দেমাক করে খাড়া রইল।

সব ফুলরা বলল, "আমাদের মতো মাথা নিচু করে থাক গো।"

ঘোড়া-গম বলল, "মোটেই না।"

বুড়ো উইলোগাছ বলল, "ফুলের পাপড়ি মুদে, পাতা মুড়ে থাক। বিদ্যুতের ঝলকানির দিকে তাকিও না, তা হলে একেবারে স্বর্গের মধ্যিখানটা দেখতে পাবে! বিদ্যুৎ দেখলে মানুষরা পর্যন্ত অন্ধ হয় আর আমরা হলাম গিয়ে মাটির আগাছা, মাথা তুলে দেখার মতো আস্পর্ধা করলে, আমাদের কি অবস্থা হবে বল দিকিনি?"

তাকে ধিক্কার দিয়ে ঘোড়া-গম বলল, "মাটির আগাছা বৈকি? আমি মাথা তুলে ভগবানের স্বর্গের মধ্যিখানটা দেখে নেব!"

গর্ব ভরে ঘোড়া-গম আকাশের দিকে চাইল। অমনি মনে হল সমস্ত পৃথিবীটাতে বুঝি আগুন লেগেছে।

ঝড় থেমে গেলে, বৃষ্টির পর চারদিকটাকে কি মধুর মনে হ'ল! ফুলরা আবার নিশ্বাস ফেলে বাঁচল, শস্যগাছ বাতাসে দুলতে লাগল। শুধু ঘোড়া-গমের গাছগুলো শুকিয়ে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে মাটিতে লুটিয়ে রইল। বাতাস লেগে বুড়ো উইলোগাছ মাথা নাড়তে লাগল, অমনি মস্ত এক ফোঁটা বৃষ্টির জল তার পাতা থেকে ঝরে মাটিতে পড়ল! মনে হল যেন গাছটা কাঁদছে।

চড়াইরা চিপ্‌চিপ্‌ করে বলল, "ও কি, কাঁদছ কেন? ফুলপাতার সুগন্ধ পাচ্ছ না? তবে কেন কাঁদছ বুড়ো উইলো-

গাছ?” তখন উইলোগাছ ওদের কাছে খুলে বলল ঘোড়া-গমের কি দশা হয়েছে। একদিন সন্ধেবেলায় চড়াইদের কাছে গল্প শুনতে চেয়েছিলাম, তারা আমাকে যা বলেছিল, তাই এখন তোমাদের কাছে বললাম।

ডেজি ফুলের কথা

শহর থেকে দূরে, খোলা-মেলা জায়গায়, পথের ধারে একটি ফুল-ঘর। তার সামনে ফুলে ভরা ছোটো বাগান, চারধার ঘিরে সাদা কাঠের বেড়া, বেড়ার খুঁটির মাথায় সবুজ মুটকি বসান। বেড়ার বাইরে তাজা সবুজ ঘাসে ঢাকা খানিকটা ঢালু জমি। সেখানে একটি ডেজি ফুল ফুটে ছিল। বাগানের জমকাল ফুলের উপরেও যেমন উজ্জ্বল উষুম-উষুম রোদ পড়ত, বাগানের বাইরে ছোটো ডেজি ফুলের উপরেও তেমনই পড়ত! ডেজি ফুল তাই দিনে দিনে বেড়ে উঠে, একদিন তার সব পাপড়ি মেলে ধরল।

তার একবারও মনে হল না যে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে, কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না; মনে মনে সে ভারি খুশি। সূর্য রোদ দেয়, তার দিকে সে মুখ ফিরিয়ে দেখে, আকাশে উড়তে উড়তে লার্ক পাখি গান গায়, তাই শোনে। নিজে গাইতে পারে না বলে এতটুকু দুঃখ নেই। ভাবে, 'আহা সব দেখতে পাচ্ছি, শুনতে পাচ্ছি, গায়ের উপর রোদ পড়ছে, বাতাস আমাকে চুমো খাচ্ছে। আহা, আমার কি সৌভাগ্য!'

বেড়ার মধ্যে জমকাল দেখতে, কাঠের মতো আড়ষ্ট কতকগুলো ফুল, তাদের সুবাস যেমন কম, দেমাক তেমন

বেশি। গোলাপের চাইতেও যাতে বড়ো দেখায়, তাই পিওনি ফুলরা পাপড়ি ফুলিয়ে বসে আছে। টিউলিপের কি খাসা রঙ আর সে কথা নিজেরাও ভালো করেই জানে তাই মোমবাতির মতো ঠায় খাড়া হয়ে আছে, যাতে সবার চোখে লাগে।

বেড়ার বাইরের ছোটো ফুলটাকে তারা গ্রাহ্যই করল না। ডেজি কিন্তু তাদের দিকে আরো ভালো করে দেখতে লাগল, ভাবল, 'আহা, কি জমকাল, কি সুন্দর ওরা! ঐ চমৎকার
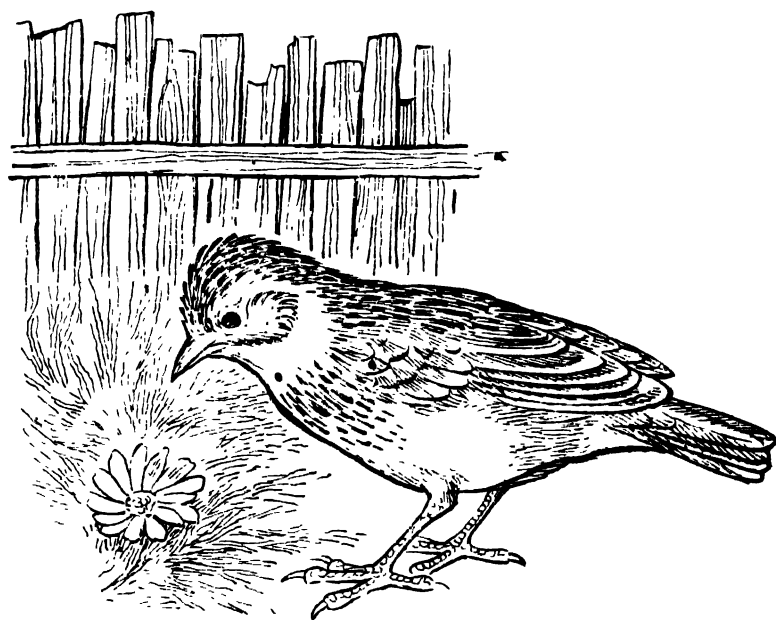
পাখিটা নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে দেখা করতে নেমে আসবে! আমি কি সুখী, ওদের এত কাছে থাকতে পাই, ওদের রূপ দেখতে পাই!" ঠিক সেই সময় আকাশ থেকে লার্ক পাখিটা সত্যি সত্যি নেমে এল। কিন্তু সে পিওনিদের কাছে, কিম্বা টিউলিপ-দের কাছে মোটেই গেল না, এল সোজা উড়ে যেখানে ঘাসের মধ্যে ছোট্টো ডেজি বেচারি লুকিয়ে ছিল। বেজায় আনন্দের

চোটে ডেজির তো প্রাণপাখি প্রায় খাঁচা ছাড়া, তার উপর এমনই অবাক হয়ে গেল যে কি যে মনে করবে ভেবে পেল না!

ছোটো পাখিটা ঘাসের উপর লাফাতে লাগল, গাইতে লাগল, "আহা, এ ঘাসটি কি নরম! আর কি মিষ্টি ছোটো ফুলটি ফুটেছে, সোনালি বুকটি তার, রুপোলি তার সাজ!" ডেজি ফুলের হলুদ কেশরকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সোনার তৈরি, আর তার চারধারের ছোটো সাদা পাপড়িগুলোকে মনে হচ্ছে যেন রুপোর তৈরি।

ছোটো ডেজি ফুলটির কি আনন্দ। এত আনন্দের কথা কেউ ভাবতে পারে না! পাখি এসে ঠোঁট দিয়ে তাকে চুমো খেল, তাকে গান শোনাল, তার পর নীল আকাশে আবার উড়ে চলে গেল। নিজেকে সামলে নিতে ফুলটার সিকি ঘণ্টা লাগল। খানিকটা লজ্জা পেয়ে, আবার বেজায় খুশি হয়ে, সে বাগানের ফুলদের দিকে চেয়ে দেখল। সে যে আজ কত সম্মান কত আনন্দ পেয়েছে, সে কথা নিশ্চয় তারা বুঝতে পেরেছে, নিশ্চয় জানতে পেরেছে আজ সে কত সুখী। কিন্তু দেখে কি-না টিউলিপরা দুগুণ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রাগের চোটে তাদের মুখ সব টক্‌টকে লাল! আর পিওনিরা এমনিতেই মোটা-মাথা, ভাগ্যিস তারা কথা বলতে পারে না, নইলে সেদিন ডেজি বেচারিকে বেশ দু-চারটে কড়া কথা শুনতে হত! এমনিতেই সে বুঝতে পারল ওরা ভারি চটেছে, ওর নিজেরও তাতে খুব খারাপ লাগল।

একটু পরে একটি চক্‌চকে ধারাল ছুরি হাতে নিয়ে একটি মেয়ে বাগানে এল। সে টিউলিপদের কাঁছে গিয়ে কুছ্‌কুছ্‌ করে একটার পর একটাকে কেটে নিল। ডেজির বুক থেকে একটা নিশ্বাস বেরিয়ে গেল, "কি ভীষণ! এবার আর ওদের

কিছু বাকি রইল না।" ফুল নিয়ে মেয়েটি চলে গেল। ডেজি ফুল বড়ো খুশি যে সে বেড়ার বাইরে ঘাসের মধ্যে গজিয়েছে, কেউ তার আদর করে না! সূর্য ডুবে গেলে, পাতাগুলি মুড়ে ডেজি ফুল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রোদের আর সেই সুন্দর পাখিটার স্বপ্ন দেখতে লাগল।

পর দিন সকালে যখন ঝরঝরে শরীরে, খুশি মনে ছোটো ফুলটি সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় আর পরিষ্কার নীল বাতাসে তার সাদা-সাদা পাপড়িগুলোকে মেলে ধরল, তখন আবার পাখিটার গান শুনতে পেল। আজ কিন্তু গানটাকে কেমন করুণ শোনাল। হায়, হায়, পাখির দুঃখের যথেষ্ট কারণও ছিল। কে তাকে ধরে খোলা জানলার ধারে খাঁচায় পুরে রেখেছে! তখন কি গান গাইল পাখি? সে গাইল অবাধ স্বাধীনতার আনন্দের কথা, মাঠে মাঠে কচি সবুজ শস্যের কথা, সীমাহীন খোলা আকাশে ডানায় ভর করে ভেসে বেড়ানোর কথা। তার মনে সে কি দুঃখ, ঐ ছোট্টো খাঁচায় তাকে কয়েদী হয়ে থাকতে হচ্ছে!

ছোটো ডেজি ফুলের বড়ো ইচ্ছা তাকে সাহায্য করে, কিন্তু কিভাবে করা যায়? কিছুই ভেবে পেল না, তাই চারদিকটা যে কি সুন্দর, সূর্যের আলো যে কি কোমল কি গরম এ-সব সে ভুলে গেল। হায়, সেই বন্দী পাখি ছাড়া আর কোনো কথা তার মনে রইল না। হঠাৎ বাগান থেকে দুটি ছোটো ছেলে বেরিয়ে এল। একজনের হাতে একটা ছুরি, যে মেয়েটা টিউলিপ ফুল কেটেছিল তার ছুরিটার মতোই বড়ো আর ধারাল। ওরা সোজা ডেজি ফুলের কাছে এল, সে তো ভেবেই পেল না ওরা কি চায়।

একটা ছেলে বলল, "এই তো এখান থেকে লার্ক পাখির

জন্য মাটির চাবড়া কেটে নেওয়া যায় !" এই বলে ডেজি ফুলকে মাঝখানে রেখে, তার চারদিকে অনেকখানি গভীর করে খুঁড়ে মাটির চাবড়া তুলে নিল।

অন্য ছেলেটা বলল, "ফুলটা ছিঁড়ে ফেলে দাও।" ডেজি বেচারা ভয়ে কাঁপতে লাগল। সে তো জানে যে ছিঁড়ে ফেললেই সে মরে যাবে ; লার্কের খাঁচায় তাকে রাখা হবে, তার বাঁচার বড়ো ইচ্ছা।

প্রথম ছেলেটা বলল, "না, ফুল থাক, কি সুন্দর দেখতে বল তো।" কাজেই ফুল ছেঁড়া হল না, মাটির চাবড়াসুদ্ধ লার্কের খাঁচায় তাকে রাখা হল।

পাখি বেচারি স্বাধীনতা হারিয়ে বিলাপ করত, খাঁচার

লোহার গরাদে ডানা ঝাপটাত। ফুল তো আর কথা বলতে পারে না, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সে পাখিকে এতটুকু সান্ত্বনা দিতে পারত না। এইভাবে সারা সকাল কাটল।

লার্ক বলল, "এখানে জল নেই। ওরা সবাই বেরিয়ে গেছে, আমার কথা ভুলে গেছে। এক ফোঁটা জল নেই যে পান করব, গলা শুকিয়ে জ্বালা করছে। আমার দেহে বরফ আর আগুন ; বাতাস ভারি হয়ে আসছে। হায়, আমাকে এবার মরতে হবে এই কোমল গরম রোদ, এই শ্যামল সবুজ খেত, সব ছেড়ে যেতে হবে।" শরীর শীতল করবার জন্য ঘাসের মধ্যে সে ঠোঁট ঢুকিয়ে দিল। দিতে গিয়েই ডেজি ফুলের উপর চোখ পড়ল ; তাকে নমস্কার করে পাখি বলল, "হায় রে ছোটো ফুল, তুমিও এখানে শুকিয়ে যাবে। অত বড়ো পৃথিবীটা আমার ছিল, তার বদলে ওরা তোমার চারপাশের ঐ সবুজটুকু আমাদের দিয়েছে। আমার কাছে প্রত্যেকটি ঘাসের ফলক যেন সবুজ মাঠের মতো, তোমার প্রতিটি সাদা পাপড়ি যেন সুগন্ধে ভরা এক-একটি ফুল। হায় রে, তোমাকে দেখে খালি মনে পড়ছে আমি কি হারালাম!"

ডেজি ভাবল 'আহা, যদি ওকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলতে পারতাম। সন্ধে হয়ে গেল, তবু পাখি বেচারিকে এক ফোঁটা জল দিতে কেউ এল না। পাতলা ডানা দুটি মেলে সে ফুলের দিকে ঝুঁকে পড়ল, মুক্তি বার বাসনায় তার বুক ভেঙে গেল। ফুল-ও আজ রাতে পাতা মুড়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারল না। শরীরে গ্লানি, মনে দুঃখ নিয়ে সে মাটিতে নুয়ে পড়ল

তার পরদিন সকালের আগে ছেলেরা বাড়ি ফিরল না এসে যখন দেখল পাখি মরে গেছে, তাদের সে কি কান্না

সুন্দর লাল রঙের একটা বাক্সে পাখির দেহটি ভরে, তাকে মাটিতে পুঁতে দিল। তার পর কবরটাকে ফুল দিয়ে সাজাল। পাখি বেচারার রাজার যোগ্য সমাধি হল। যখন সে বেঁচে ছিল, সুন্দর গান গাইত, তখন তার কথা ভুলে গেল। খাঁচার ভিতর সে যে কী কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখে চলে গেল আর যেই না বেচারা চোখ বুজল, অমনই তার কি সম্মান, তার জন্য কত বিলাপ!

আর ডেজি ফুলের কি হল? ডেজি ফুলসুদ্ধ ঘাসের চাবড়াটাকে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হল। পাখির জন্য তার এত সহানুভূতি পাখিকে সান্ত্বনা দেবার তার এত ইচ্ছা ছিল, তবু তার কথা কেউ একটু মনেও করল না।

টিনের সেপাইয়ের কথা

এক সময়, পঁচিশটা টিনের সেপাই ছিল ; তারা সবাই ভাই-ভাই, কারণ সবাই একটা পুরনো টিনের হাতা গালিয়ে তৈরি। সবার হাতে বন্দুক, সবাই তক্তার মতো খাড়া দাঁড়িয়ে, সকলের লাল আর নীল সৈনিকের পোশাক, সবাই দেখতে ভারি মজাদার। পৃথিবীতে জন্ম নেবার পর, যেই ওদের বাক্সের ঢাকনি খোলা হল, অমনি প্রথম যে কথা ওদের কানে গেল, তা হল, 'টিনের সেপাই !' একটি ছোটো ছেলে আনন্দে হাততালি দিয়ে ঐ কথা বলল। সেপাইগুলোকে সে জন্মদিনে উপহার পেয়েছিল। তার পর সে টেবিলের উপরে তাদের সাজিয়ে রাখল।

সেপাইদের মধ্যে এক-চুল তফাত নেই। শুধু একটা অন্যদের চাইতে একটু অন্যরকম, কারণ তার মোটে একটা ঠ্যাং। ওকেই কিনা সবার শেষে তৈরি করা হয়েছিল, টিনে কুলোয় নি বলে। সে যাই হোক, অন্যরা দুঠ্যাঙে যেমন মজবুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত ওর এক ঠ্যাঙেও ও তেমনি মজবুত হয়ে দাঁড়াত। আমার মনে হয় ওরই জীবনের নানান ঘটনা তোমাদের শোনাবার যোগ্য।

যে টেবিলে টিনের সেপাইরা সাজানো ছিল, তাতে আরো কয়েকটা খেলনাও ছিল। তার মধ্যে সবচাইতে সুন্দর হল পীচ-

বোর্ডের তৈরি চমৎকার একটা দুর্গ। দুর্গের ক্ষুদে-ক্ষুদে জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে দেখা যেত। দুর্গের সামনে, একটা ছোট্টো আয়নার চারদিকে ভিড় করে ছিল কয়েকটা ক্ষুদে গাছ। আয়নাটাকে একটা দীঘি মনে করতে হবে। কয়েকটা মোমের রাজহাঁস ঐ দীঘির জলে সাঁতার কাটত, জলে তাদের ছায়া দেখা যেত।

এ-সবই খুব চমৎকার সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মধ্যে সবচাইতে সুন্দর জিনিস হল ছোট্টো একটি মেয়ে। সে দুর্গের খোলা দরজার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকত। সেও পীচবোর্ড কেটে তৈরি, কিন্তু তার পরনে ছিল খাঁটি মসলিনের জামা, তার কাঁধের উপর চাদরের মতো করে ফেলা ছিল একটুখানি ফিকে নীল রেশমী ফিতে, আর সেই ফিতের ঠিক মধ্যিখানে ছিল একটা ঝক্‌ঝকে সোনার ডানা। এই ক্ষুদে মহিলাটি হল একজন নর্তকী, তাই সে হাত দুটিকে বাড়িয়ে ধরেছিল, আর একটা পা এত উঁচুতে তুলে রেখেছিল যে টিনের সেপাই সেটিকে দেখতে না পেয়ে ভাবত ঐ মেয়েটিরও বুঝি তারই মতো মোটে একটি পা।

সে মনে মনে বলত, 'ঐ তো ঠিক আমার বউ যেমন হওয়া উচিত। মুস্কিল হল, ওর বংশ বড়ো উচু। ও থাকে দুর্গে আর আমি থাকি শুধু একটা বাক্সে। তার উপর বাক্সটা একা আমারও নয়, ওর মধ্যে আমরা পঁচিশজন থাকি; ওখানে তো আর বউ আনা যায় না। সে যাই হোক গে, ওর সঙ্গে আলাপ করতে দোষ কি!' এই-সব ভেবে টেবিলের উপরে রাখা একটা নস্যির কৌটোর পিছনে গিয়ে টিনের সেপাই দাঁড়াল। এই জায়গাটা থেকে পাতলা ছোট্টো মহিলাটিকে একেবারে সামনা-সামনি দেখা যেত। সে তখনো এক পায়েই দাঁড়িয়ে ছিল, অথচ টাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল না।

সন্ধেবেলা সব টিনের সেপাইদের বাক্সে ভরে, বাড়ির লোকেরা শুতে গেল। তখন খেলনাগুলোর পালা, তারা এবার খেলা শুরু করল। তারা খেলা করতে লাগল যেন এ-ওর বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছে, যেন যুদ্ধ হচ্ছে, নাচের আসর বসেছে। টিনের সেপাইরা বাক্সের ভিতর থেকে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ করতে লাগল, তাদেরও বেরিয়ে এসে খেলা করার ইচ্ছা, কিন্তু বাক্সের ঢাকনিটাকে কিছুতেই খুলতে পারছিল না। বাদাম ভাঙার জাঁতিটা ডিগবাজি খাচ্ছিল, শ্লেট-পেনসিলটা শ্লেটের উপর বেচাকেনা খেলছিল। সব মিলিয়ে এমনি হট্টগোল শুরু হয়ে গেল যে ক্যানারি পাখিটার ঘুম ভেঙে গেল, অমনি সেও কথা বলতে আরম্ভ করল, অবিশ্যি সে সর্বদা ছড়া কেটে কথা বলত। মাত্র দুজন নিজেদের জায়গা থেকে এতটুকু নড়ল না; তারা হল সেই ছোট্টো টিনের সেপাই আর সেই সুন্দরী নর্তকী। সে সব সময় ঐ এক সুন্দর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকত, এক পায়ের আঙুলে ভর করে, হাত বাড়িয়ে। এদিকে সেপাইয়ের কথা আর কি বলব, সে সারাক্ষণ তার এক পায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত আর সুন্দরী মেয়েটির উপর থেকে কখনো চোখ ফেরাত না।

রাত বারোটা বাজল। অমনি খট্‌ করে নস্যির কৌটোর ঢাকনি খুলে গেল। কৌটোর ভিতরে নস্যি ছিল না; তার বদলে ছোট্টো একটা কালো রঙের জাদুকর লাফিয়ে উঠল; ওটা আসলে একটা খেলনা, ওকে 'জ্যাক্-ইন-দি-বক্স' বলে। জাদুকর বলল, "ও হে টিনের সেপাই, চোখদুটো সামলাও!"

কিন্তু টিনের সেপাই ভাব দেখাতে লাগল যেন কিছু শুনতেই পায় নি।

জাদুকর বলল, "আচ্ছা! কাল অবধি অপেক্ষা করেই দেখ-না কি হয়!"
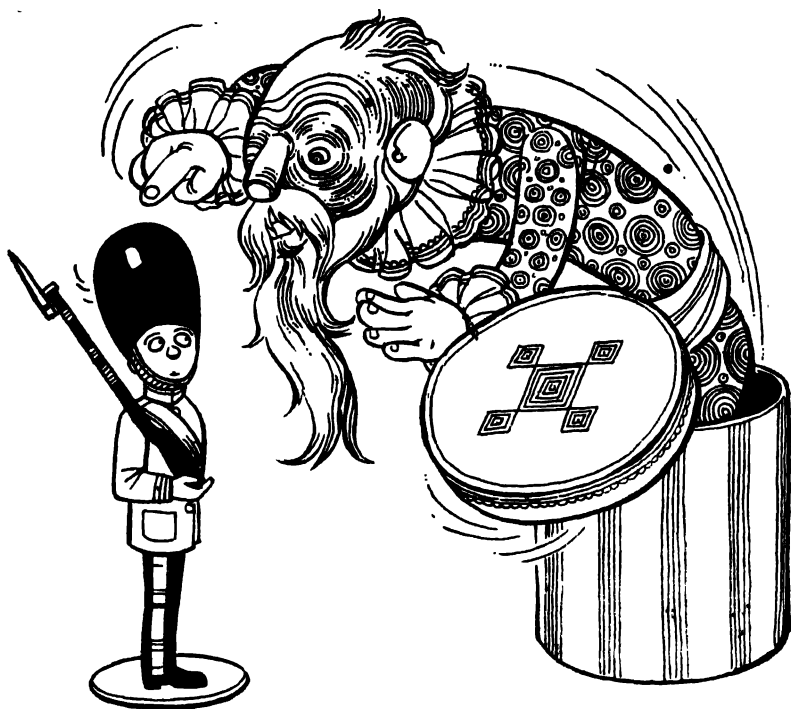
সকাল হলে ছেলেমেয়েরা বিছানা থেকে উঠে পড়ল। টিনের সেপাইকে তুলে নিয়ে তারা জানলার চৌকাঠের উপর রেখে দিল, আর তখুনি, সে জাদুকরের জন্যেই হোক, কিম্বা বাতাসের জন্যেই হোক, জানলাটা দুড়ুম করে খুলে গেল আর পা উঁচুতে মাথা নিচুতে করে সেই তিনতলার উপর থেকে, টিনের সেপাই মাটিতে পড়ল! সে কি ভয়ংকর পড়া! বেচারার একমাত্র ঠ্যাংটা শূন্যে ঘুরপাক খেতে লাগল, তার পর যখন মাটিতে পৌঁছল তখন সেপাই টুপিতে ভর করে পা ওপরে করে পড়ল, আর বন্দুকের সঙ্গিনটা রাস্তার শানের মধ্যে ঢুকে রইল!

তখুনি ঝির সঙ্গে ছোটো ছেলেটা ওকে খুঁজতে নীচে নেমে এল, কিন্তু তাকে দেখতেই পেল না যদিও আরেকটু হলেই ওরা তাকে মাড়িয়ে দিত। সেই সময় টিনের সেপাই যদি চেঁচিয়ে

বলত, "এই যে, আমি এখানে!" তা হলেই ওরা ওকে খুঁজে পেত, কিন্তু সে ভাবল সৈনিকের পোশাক পরে ওভাবে চ্যাচানটা ঠিক হবে না।

তার পর বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করল; একেকটা ফোঁটা পড়ে যেন তার আগের ফোঁটার চাইতে ওজনে বেশি! ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ে সব ভিজিয়ে সপ্‌সপে করে দিল! বৃষ্টি থামলে, দুটো ছেলে এদিকে এল। একজন বলল, "দেখেছ, একটা টিনের সেপাই! জীবনে এই একবারের মতো বেচারা নৌকো চেপে বেড়াতে যাক!"

এই বলে তারা পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে একটা নৌকো বানিয়ে, তার মধ্যে টিনের সেপাইকে চাপিয়ে দিল। অমনি নর্দমার জলের সঙ্গে নৌকো ভেসে চলল; ছেলেদুটো হাততালি দিতে দিতে, পাশে পাশে দৌড়তে লাগল। কাগজের নৌকো জলে দোল খেতে লাগল আর মাঝে মাঝে হঠাৎ এমনি পাক খেল যে টিনের সেপাইয়ের মাথা ঘুরতে লাগল। তবু সে এতটুকু নড়ল-চড়ল না; বন্দুকেব সঙ্গিন শক্ত করে ধরে, সটান সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

এক জায়গায় নালার উপর তক্তা পাতা ছিল, তার তলা দিয়ে নৌকো ভেসে চলল। টিনের সেপাই দেখল এ জায়গাটা বাড়িতে তার বাক্সের ভিতরটার মতোই অন্ধকার।

সে মনে মনে বলল, 'এবার কোথায় যাচ্ছি কে জানে! এ-সবই নিশ্চয় ঐ জাদুকরের কাজ! আহা, ঐ মেয়েটি যদি আমার সঙ্গে এই নৌকোয় থাকত, তা হলে এর দুগুণ অন্ধকারেও আমার এসে যেত না।'

একটা জলের ইঁদুর ঐ তক্তার নীচে থাকত; সে তার বাসা

থেকে ছুটে এসে বলল, "পাসপোর্ট আছে? কই, দেখি তোমার পাসপোর্ট?"

টিনের সেপাই কোনো কথা বলল না, খালি হাতের অস্ত্রটাকে আরো শক্ত করে ধরল। নৌকো ভেসে চলল, ইঁদুরও পিছন পিছন চলল। উঃ! সেকি বিকটভাবে সে দাঁত খিঁচিয়ে, জলে ভেসে যাওয়া খড়-কুটোকে বলতে লাগল, "ওকে থামাও ওকে থামাও! ও পারের কড়ি দেয় নি, পাসপোর্ট দেখায় নি!" এদিকে স্রোতের বেগ বাড়তে লাগল। টিনের সেপাই দূরে ঝক্‌ঝকে রোদ দেখতে পেল; ঐখানেই নৌকোটা সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে সে কি ভয়ংকর গর্জন! অমন আওয়াজ শুনলে অতি বড়ো বীরও ভড়কে যেত! সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেইখানেই নালার জলও হুড়হুড় করে মস্ত একটা খালের মধ্যে গিয়ে পড়েছে। একটা মস্ত জলপ্রপাত বেয়ে নৌকোয় নামা আমাদের পক্ষে যতটা বিপদের কথা, টিনের সেপাইয়ের পক্ষে নালা থেকে খালে পড়াও তাই।

ততক্ষণে কাগজের নৌকোটা জলপ্রপাতের এত কাছাকাছি এসে পড়েছিল যে টিনের সেপাই আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। নৌকোটা ছিট্‌কে এগিয়ে চলল, টিনের সেপাই বেচারা যতটা পারে আড়ষ্ট অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল; কেউ বলতে পারবে না যে একটি বারের জন্যেও তার চোখের পলক পড়েছিল। নৌকোটা তিনবার—না তিনবার নয়, চারবার—ঘুরপাক খেল, কানায় কানায় জলে ভরে গেল; এবার নৌকো ডুববে!

টিনের সেপাই গলাজলে দাঁড়িয়ে ছিল; ক্রমে নৌকো আরো তলিয়ে যেতে লাগল, কাগজ আরো নরম হয়ে এল, সেপাইয়ের মাথার উপর দিয়ে জল বয়ে গেল। তখন তার সেই সুন্দরী

নর্তকীর কথা মনে হল, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না! টিনের সেপাইয়ের কানে এই কথাগুলো বাজতে লাগল,

দুরন্ত অভিযান, সঙ্কট মহান,
কপালেতে লেখা, অচিন মহাপ্রাণ!

তার পর কাগজটা দু-টুকরো হয়ে গেল, ফাঁক দিয়ে গলে টিনের সেপাই পড়ে গেল। অমনি একটা মস্ত মাছ তাকে গিলে ফেলল। সে কি অন্ধকার! নালায় পাতা তক্তার তলাতেও এত অন্ধকার ছিল না, আর কি বেজায় সরু জায়গা! কিন্তু টিনের সেপাইয়ের কোনো আলি-বালি নেই, বন্দুক কাঁধে নিয়েই সে লম্বা হয়ে শুয়ে রইল।

মাছটা এদিকে ফেরে, ওদিকে ফেরে, কিলবিল করে অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গি করে। তার পর হঠাৎ যেন একেবারে থেমে গেল,

তার শরীরের মধ্যে দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার পরেই ঝক্‌ঝকে দিনের আলো! কে যেন বলে উঠল, "আরে, টিনের সেপাই যে!" ইতিমধ্যে মাছটা ধরা পড়েছিল; তাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হয়েছিল; তার পর রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে, মস্ত একটা ছুরি দিয়ে দাসী তাকে কুটতে বসেছিল। এবার সে দুই আঙুলে করে তার কোমর ধরে, তাকে একেবারে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। মাছের পেটে ভ্রমণ করে এসেছে এমন আশ্চর্য মানুষ দেখতে সবার কি আগ্রহ! কিন্তু আমাদের সেই ক্ষুদে যোদ্ধার মনে এতটুকু অহংকার হল না।

ওরা ওকে একটা টেবিলের উপর রাখল আর সেখানে—না, এমন আশ্চর্য ব্যাপার কি পৃথিবীতে কখনো ঘটে? টিনের সেপাই দেখল সে আবার তার সেই পুরনো ঘরেই ফিরে এসেছে, যেখানে সে আগেও ছিল। দেখল সেই একই ছেলেমেয়ে, টেবিলের ওপর সেই একই খেলনা, তার মধ্যে সেই চমৎকার দুর্গে সেই সুন্দরী ছোটো নর্তকী, এখনো সে একপায়ে দাঁড়িয়ে, আরেক পা শূন্যে উঁচু করে রেখেছে; তারও কোনো অদলবদল নেই। তাই দেখে টিনের সেপাই বড়োই অভিভূত হয়ে পড়ল; ইচ্ছা করলেই সে টিনের চোখের জলও ফেলতে পারত, কিন্তু সেরকম ব্যবহার তো আর টিনের সেপাইকে শোভা পায় না! সেপাই মেয়েটির দিকে তাকাল, মেয়েটি সেপাইয়ের দিকে তাকাল, কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না।

হঠাৎ ছোটো ছেলেগুলোর মধ্যে একজন টিনের সেপাইকে তুলে নিয়ে, কথা নেই বার্তা নেই, একেবারে উনুনের মধ্যে ফেলে দিল। কেন এমন করল, তার কোনো কারণ দেখাল না সে, কিন্তু নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নস্যির কৌটোর জাদুকরের হাত ছিল।

এক ঝলক লাল আলোর মাঝখানে টিনের সেপাই দাঁড়িয়ে রইল। তার বেজায় গরম লাগছিল, তবে সেটা সত্যিকার আগুনের জন্য, নাকি তার মনের ভিতরকার ভালোবাসার আগুনের জন্য, সে নিজেও জানত না। তার গায়ের সব রঙ জ্বলে গেছিল। সেটা নানান জায়গায় ভ্রমণ করার সময়ই হয়েছিল, নাকি আবেগের আতিশয্যে হয়েছিল, তা জানি না। সে ছোটো নর্তকীর দিকে চাইল, ছোটো নর্তকী তার দিকে চাইল; সেপাই টের পেল সে গলে যাচ্ছে, তবু তার অদলবদল নেই, বন্দুক কাঁধে করে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল। তার পর কে যেন দরজা খুলতেই, মেয়েটি বাতাসে উড়ে, আকাশের পরীর মতো সোজা উনুনের মধ্যে টিনেব সেপাইয়ের কাছে চলে এল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনে জ্বলে উঠে, একেবারে মিলিয়ে গেল। টিনের সেপাই গলে গিয়ে ছাইয়ের উপর ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে পড়তে লাগল। পরদিন সকালে দাসী যখন উনুনের ছাই বের করে নিয়ে গেল, দেখল সেপাইয়ের টিনের শরীর গলে গিয়ে ছোট্টো একটি হরতনের মতো হয়ে আছে। সুন্দরী নর্তকীর শুধু সোনালি ডানাটি বাকি ছিল, তাও জ্বলেপুড়ে কালো কয়লার মতো হয়ে গেছিল।

রাখাল-মেয়ে আর ঝুল-ঝাড়ুয়ার কথা

সেকেলে সেগুন-কাঠের সিন্দুক দেখেছ কখনো ? পুরনো হয়ে হয়ে রঙ তার মিশকালো, সারা গায়ে পালিশ আর কারি-কুরি, দেখেছ এমন ? এক সময় একজনদের বৈঠকখানায় এই-রকম একটি সিন্দুক ছিল, পৈত্রিক সম্পত্তি, বাড়ির গিন্নীর ঠাকুমার মায়ের জিনিস। আগাপাশতলা তার কারিকুরি করা, গোলাপ, টিউলিপ ফুল, ছোটো-ছোটো হরিণের মাথা আর তার ডালপালাওয়ালা শিং ; তাদের চারদিকে অদ্ভুত সব আঁকা-বাঁকা নক্‌সা, তারই তলা দিয়ে হরিণগুলো যেন উঁকি মারছে।

সিন্দুকের মধ্যিখানের পাল্লায় একটা প্রমাণ মাপের মানুষের চেহারা খোদাই করা ছিল। মানুষটা অষ্টপ্রহর দাঁত বের করে হাসছে। হয়তো নিজেকে দেখেই তার হাসি পাচ্ছে, কারণ সত্যি কথা বলতে কি, তার চেহারাটা বড়োই মজার। বাঁকা বাঁকা ঠ্যাং, কপালে দুটো ক্ষুদে শিং, থুতনিতে লম্বা দাড়ি। বাড়ির ছেলেমেয়েরা লোকটার নাম দিয়েছিল 'বাঁকা-ঠ্যাং-ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেন্ট'। বেড়ে খটমট লম্বা নাম ; এমন নাম নিয়ে কটা মূর্তি গর্ব করতে পারে, তা সে কাঠের-ই হোক, কিম্বা পাথরেরই হোক ?

সে যাই হোক, লোকটা দিনরাত খাড়া থাকত আর তার চোখ

থাকত আয়নার নীচেকার টেবিলটার উপরে। টেবিলের উপরে ছিল ভারি সুন্দর এক চীনে-মাটির রাখাল-মেয়ে; তার পোশাকটি কেমন গায়ের চারদিকে ঘুরে এসে একটা গোলাপ ফুল দিয়ে আঁটকান ছিল। মেয়ের পায়ের জুতো আর মাথার টুপি ছিল গিল্‌টি করা, হাতে একটি বাঁকা লাঠি, কি মিষ্টি সে মেয়ে, সে আর কী বলব! তার কাছেই ছিল ঐরকম চীনে-মাটির তৈরি ছোট্টো এক ঝুল-ঝাড়ুয়া ছোকরা। অন্যদের মতো সেও ছিল ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসলে যে কারিগর ওকে বানিয়েছিল সে ওকে ঝুল-ঝাড়ুয়া না করে স্বচ্ছন্দে রাজ-পুত্র করে দিতে পারত, কারণ ওর সারা গা কুচকুচে কালো হলেও, মুখখানি ছিল মেয়েদের মতো টুকটুকে কচি-পানা। সেটা কারিগরের ভুল, মুখটাকেও কালো করা উচিত ছিল। হাতে মই নিয়ে সেই ছেলেটা ছোট্টো রাখাল-মেয়ের পাশে ঠাঁই নিয়েছিল। গোড়া থেকেই তাদের ওরকম পাশাপাশি রাখা হয়েছিল, ও জায়গা থেকে তারা একটুও নড়ে নি, কাজেই তারা পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলেছিল। দিব্যি মানিয়েছিল দুজনাকে, দুজনারই বয়স কম, দুজনেই একইরকম চীনে-মাটি দিয়ে তৈরি, দুজনেই সমান পাতলা, সমান ভঙ্গুর।

এদের বেশ কাছেই ওদের চাইতে তিন গুণ বড়ো একটি মূর্তি ছিল। পুরনো একটি চীনে ম্যান্দারিন, বেশ মাথা নাড়তে পারে। সে-ও ছিল চীনে-মাটির তৈরি, বলত নাকি সে ঐ ছোট্টো রাখাল-মেয়ের দাদামশাই। যদিও তার কাছে কোনো প্রমাণ ছিল না, তবু বুড়ো জোর করে বলত সে নাকি ছোট্টো রাখাল-মেয়ের অভিভাবক। কাজেই যখন বাঁকা-ঠ্যাং-ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেণ্ট রাখাল-মেয়ের কাছে বিয়ের সম্বন্ধ পাঠাল, বুড়ো অমনি মাথা হেলিয়ে মত দিল।

বুড়ো মান্দারিন মেয়েটিকে বলল, "এবার তোমার বর আসবে, কেমন মেহগনির বর, আমার তো তাই বিশ্বাস। তুমি কেমন ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেণ্টের বৌ হবে। ওর এক সিন্দুক বোঝাই রুপোর বাসন আছে, তা ছাড়া লুকনো টানাগুলোর মধ্যে আরো কত জিনিস বোঝাই আছে কেউ জানে না।"

ছোট্টো রাখাল-মেয়ে বলল, "মোটেই আমি ঐ খুপ্‌সি-পানা সিন্দুকে ঢুকব না। আমি শুনেছি এগারোজন চীনে-মাটির মহিলা আগে থেকেই ওর মধ্যে কয়েদ হয়ে আছে।"

মান্দারিন তাই শুনে বলল, "তাতে কি, তুমি নাহয় বারো নম্বর হবে। এই আমি বলে দিলাম, আজ রাতেই যখন পুরনো সিন্দুকটা কঁড়াচ্‌-কোঁচ্‌ শব্দ করবে তখন তোমাদের বিয়ের উৎসব হবে, নইলে আমার নাম চীনে মান্দারিন নয়।"

এই বলে মুণ্ডু দুলিয়ে বুড়ো ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ছোট্টো রাখাল-মেয়ের চোখে জল এল, সে তার ভালোবাসার মানুষ চীনে-মাটির ঝুল-ঝাড়ুয়ার দিকে ফিরে চাইল।

রাখাল-মেয়ে বলল, "দেখ, মনে হচ্ছে তোমাকে আমার সঙ্গে বিশাল পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়তে বলতে হবে। এখানে তো আর থাকা যায় না।"

ছোট্টো ঝুল-ঝাড়ুয়া বলল, "তুমি যা বলবে, আমিও তাই করব। চল, এখনি যাব। আমি খেটেখুটে তোমাকে খাওয়াতে পরাতে পারব।"

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ছোট্টো মেয়েটি বলল, "এই টেবিল থেকে যদি একবার নেমে পড়তে পারতাম। যতক্ষণ না বিশাল পৃথিবীর বুকে, দূরে কোথাও চলে যেতে পারছি, ততক্ষণ মনে কোনো সুখ নেই।"

তখন ছেলেটি ওকে সান্ত্বনা দিয়ে, শিখিয়ে দিল কি করে টেবিলের পায়ে জড়ানো গিল্‌টি-করা পাতা আর খোদাই-করা খাঁজের উপর ছোট্টো-ছোট্টো পা দুটি রেখে, আস্তে আস্তে মেঝের উপর নেমে আসা যায়। নেমেই একবার পুরনো সিন্দুকটার দিকে তাকিয়ে দেখে মহা হুলস্থূল কাণ্ড লেগে গেছে! খোদাই-করা হরিণগুলো সব মুণ্ডু বাগিয়ে শিং উচিয়ে গলা নাড়ছে; ওদিকে বাঁকা-ঠ্যাং-ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেণ্ট লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বুড়ো চীনে মান্দারিনকে বলল, "ঐ দেখ, পালাচ্ছে, পালিয়ে বিয়ে করতে যাচ্ছে ওরা!"

তাই দেখে ওরা দুজন তো বেজায় ভয় পেয়ে, তাড়াতাড়ি একটি খোলা দেরাজের মধ্যে আশ্রয় খুঁজল। দেরাজের মধ্যে তিন চার প্যাকেট তাস ছিল, প্রত্যেক প্যাকেটের কয়েকটা তাস কম; আর ছিল ছোটো একটা পুতুল-নাচের মঞ্চ। মঞ্চে

একটি নাটক হচ্ছিল। রুহিতন, হরতন, ইস্কাপন, চিড়েতনের বিবিরা সবাই সামনের সারিতে বসে হাতে ধরা ফুল দিয়ে বাতাস খাচ্ছিল। তাদের পিছনে চার গোলাম খাড়া দাঁড়িয়েছিল, তাদের দুটো করে মাথা দেখা যাচ্ছিল, উপরে একটা, নীচে একটা, তাসদের সাধারণত যেমন থাকে। নাটকের গল্প— একজন ছেলে আর একজন মেয়ের ভালোবাসার পথে কত বাধা। ছোট্টো রাখাল-মেয়ে তাই দেখে কেঁদে একাকার,এ যেন তাদেরই গল্প।

মেয়ে বলল, "এ আমি সইতে পারছি না। এস, এই দেরাজ থেকে চলে যাই।" কিন্তু যেই-না আবার ঘরের মেঝের উপর নেমেছে, অমনি দেখে কি না বুড়ো মান্দারিনের ঘুম ভেঙেছে, রাগে তার সারা গা বেজায় দুলছে!

ছোট্টো রাখাল-মেয়ে বলল, "ও বাবা! ম্যান্দারিন বুড়ো আসছে।" এই বলে বড়ো কাতরভাবে চীনে-মাটির রাখাল-মেয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

ঝুল-ঝাড়ুয়া বলল, "ধর যদি আমরা ঘরের কোনার ঐ শুকনো গোলাপ পাপড়ির মতো ফুলদানিটার মধ্যে লুকিয়ে থাকি, তা হলে কেমন হয়? দিব্যি করে গোলাপ পাপড়ি আর লতা-ভেণ্ডার ফুলের ওপর শুয়ে থাকব, ও যদি কাছে আসে ওর চোখে নুন ছিটিয়ে দেব।"

মেয়েটি বলল, "না, না, তাতে হবে না, কারণ আমি জানি এক কালে বুড়ো ম্যান্দারিনের সঙ্গে ঐ ফুলদানিটার বিয়ের কথা ঠিক হয়েছিল, কে জানে হয়তো এখনো দুজনার মধ্যে একটু ভাবসাব আছে। নাঃ, আমাদের দুজনকে এবার বিশাল পৃথিবীর বুকে বেরিয়ে পড়তে হবে, তা ছাড়া উপায় দেখি না।"

ঝুল-ঝাড়ুয়া বলল, "আমার সঙ্গে বিশাল পৃথিবীতে বেরিয়ে

পড়ার সাহস আছে কি তোমার? ভেবে দেখেছ কি পৃথিবীটা কিরকম প্রকাণ্ড, আর হয়তো কোনোদিনও আমাদের বাড়ি ফেরা হবে না।"

"সব ভেবে দেখেছি।"

তখন ঝুল-ঝাড়ুয়া ওর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "আমার পথ গেছে উনুনের চোঙার ভিতর দিয়ে। আমার সঙ্গে উনুনের মধ্যে দিয়ে ঢুকে, চোঙা দিয়ে, সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সত্যিকার সাহস আছে তোমার? আমি সে পথ ভালো করে চিনি। তা হলে আমরা এত উঁচুতে উঠে যেতে পারব যে এরা কেউ আমাদের ধার কাছেও আসতে পারবে না। একেবারে উপরে উঠে গেলে, বিশাল পৃথিবীতে যাবার গুহা-পথ পাওয়া যাবে।"

এই বলে ঝুল-ঝাড়ুয়া রাখাল-মেয়েকে উনুনের মুখের কাছে নিয়ে গেল। নিশ্বাস ফেলে মেয়ে বলল, "উঃ, কী কালো-মিষ্টি গো!" তার পর তার সঙ্গে চোঙার মধ্যে দিয়ে, সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে চলল, কি অন্ধকার সে জায়গাটা, একেবারে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার যাকে বলে।

ছেলেটি বলল, "এখন আমরা চোঙার ভিতর দিয়ে উঠছি। ঐ দেখ আমাদের মাথার উপর কি সুন্দর একটা তারা জ্বলছে!"

সত্যিই আকাশ থেকে একটা তারা সোজা ওদের ওপর আলো ঢালছিল, যেন পথ দেখাবে বলে। ওরা আঁকড়ে-মাকড়ে হামাগুড়ি দিয়ে সেই ভয়ংকর পথ ধরে উঠছে, সে যে কত উঁচুতে বলা যায় না। ঝুল-ঝাড়ুয়া রাখাল-মেয়েকে পথ দেখিয়ে ধরে ধরে নিয়ে চলল, কোথায় কোথায় তার ছোট্টো-ছোট্টো চীনে-মাটির পা দুখানি বসাতে হবে তাও বলে দিল। এমনি করে

তারা উনুনের চোঙা-মাথার কাছে পৌঁছে গেল। ঐখানে ওরা একটু বিশ্রাম করতে বসল, দুজনে বড়োই ক্লান্ত।
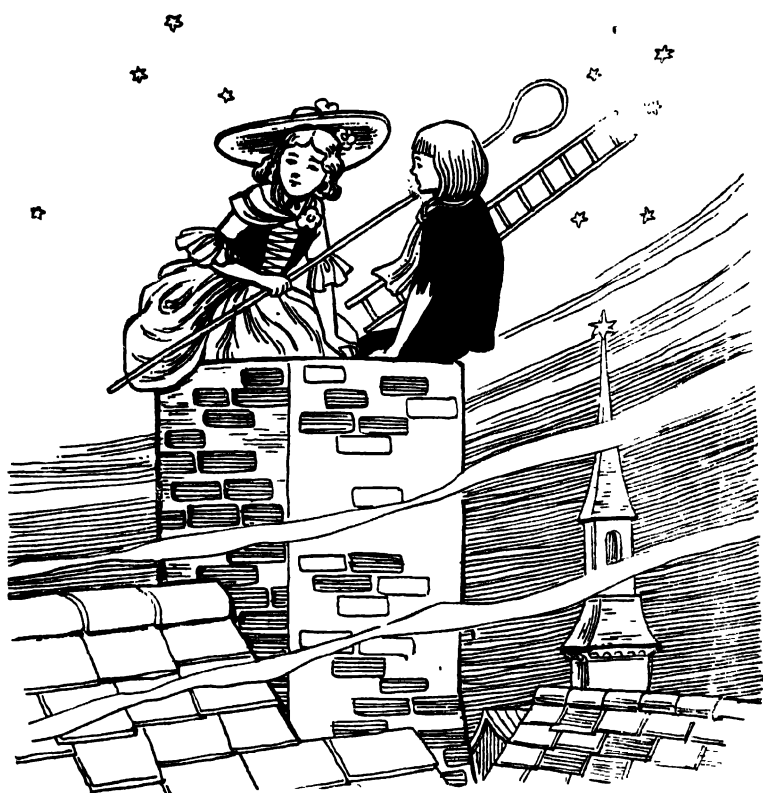
মাথার উপরে তারা-ভরা আকাশ, নীচে শহরের বাড়ির ছাদের পর ছাদ, চারদিকে বিশাল বিপুল পৃথিবী। রাখাল-মেয়ে বেচারি কখনো এ-সব কল্পনাও করে নি। ছোটো মাথাটি ঝুল-ঝাড়ুয়ার কাঁধে রেখে সে এমনি কাঁদা কাঁদল যে, তার কোমরবন্ধ থেকে সব গিল্‌টি খুলে এল।

সে বলল, "এ যে বড্ডো বেশি বড়ো। পৃথিবীটা যে বেজায় প্রকাণ্ড! আহা, আবার যদি আয়নার তলাকার ছোটো

টেবিলের উপর ফিরে যেতে পারতাম! যত দিন না সেখানে ফিরে যাচ্ছি, ততদিন আমার মনে কোনো সুখ নেই!"

"তোমার সঙ্গে আমি বিশাল পৃথিবীতে বেরিয়ে এসেছি, এবার তুমি নিশ্চয় আমার সঙ্গে আবার বাড়ি ফিরতে পারবে, অর্থাৎ যদি আমাকে ভালোবাস।"

ঝুল-ঝাড়ুয়া তাকে অনেক বোঝাল, বুড়ো চীনে মান্দারিন আর বাঁকা-ঠ্যাং-ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেণ্টের কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু সে মেয়ে এমনই হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল আর তাকে আদর করে এত চুমো খেল যে শেষপর্যন্ত ঝুল-ঝাড়ুয়া তার কথায় রাজি না হয়ে পারল না, কথাটা যদিও খুবই অবুঝের মতো।

তার পর অনেক কষ্টে তারা আবার চোঙা বেয়ে নামল, অলিগলি সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে হামা দিয়ে, শেষটা আবার সেই কালো-মিষ্টি উনুনের মধ্যে পৌঁছল। ঘরে ঢুকবার আগে অবশ্য তারা কিছুক্ষণ দরজার আড়ালে কান খাড়া করে শুনতে লাগল। সব নিঝুম। তখন তারা উঁকি মেরে দেখল। হায়, হায় বুড়ো চীনে মান্দারিন মাটিতে পড়ে আছে। ওদের পিছন পিছন তাড়া করতে গিয়ে, টেবিল থেকে পড়ে বুড়ো ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গেছে। এক কোণে মাথাটা পড়ে তখনো নুড়নুড় করছে। বাঁকা-ঠ্যাং-ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেণ্ট, যেমন বরাবর ছিল, তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যে ব্যাপার ঘটে গেল তাই ভাবছিল।

ছোট্টো রাখাল-মেয়ে বলে উঠল, "উঃ, কি ভীষণ! বুড়ো দাদামশাই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছেন আর আমরাই তার কারণ! এর পর আমি বাঁচি কি করে?" এই বলে সে বুক চাপড়ে দুঃখ জানাতে লাগল।

ঝুল-ঝাড়ুয়া বলল, "তাতে কি হয়েছে, বুড়োকে তো খুব সহজেই আবার জোড়া দেওয়া যায়; আর যাই কর অত অস্থির হয়ো না। আঠা দিয়ে পিঠটা জুড়ে, একটা শক্ত আঁকড়া দিয়ে মুণ্ডুটা আটকে দিলেই তো আবার বুড়ো নতুনের মতো হয়ে গিয়ে আবার আমাদের নানারকম কটু কথা বলতে পারবে!"

মেয়েটি তখন বলল, "সত্যি তোমার তাই মনে হয়?" তার পর তারা আবার টেবিলের পায়া বেয়ে উপরে উঠে যে যার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।

ঝুল-ঝাড়ুয়া বলল, "কতদূর বেড়িয়ে এলাম বল তো? অত কষ্ট করে না গেলেও হত।"

রাখাল-মেয়ে বলল, "বুড়ো দাদামশাইকে যদি আবার জোড়া দেওয়া যায়, তা হলেই সব হয়। অনেক খরচ লাগবে নাকি?"

শেষপর্যন্ত বুড়োকে জোড়া দেওয়া হল। বাড়ির লোকরা আঠা দিয়ে বুড়োর পিঠ জুড়ল, আঁকড়া দিয়ে মুণ্ডু লাগাল। প্রায় নতুনের মতোই হয়ে গেল শুধু মাথাটা আর নাড়তে পারত না।

তাই দেখে বাঁকা-ঠ্যাং-ফীল্ড-মার্শ্যাল-মেজর-জেনারেল-কর্পোরেল-সার্জেণ্ট বলল, "ভেঙে খান্‌খান্‌ হবার পর থেকে তোমার দেখছি বেজায় দেমাক! এর মধ্যে অত গর্ব করবার মতো কি আছে, আমি তো কিছুই ভেবে পেলাম না। মেয়েটার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কি হবে না, শুধু এইটুকুই বল।"

ঝুল-ঝাড়ুয়া আর রাখাল-মেয়ে কাতরভাবে বুড়ো মান্দারিনের দিকে চাইল; তাদের মনে বড়ো ভয়, বুড়ো যদি মাথা দুলিয়ে মত দেয়! কিন্তু মাথা দোলাবার তার সাধ্য কোথায় আর একটা বাইরের লোককে বলেই-বা কি করে যে তার মুণ্ডুটা আঁকড়া দিয়ে জোড়া। কাজেই চীনে-মাটির

ছেলেমেয়ে চিরকাল পরস্পরের কাছাকাছি রইল আর দাদা-মশাইয়ের আঁকড়াটাকে অনেক আশীর্বাদ করল আর যতদিন না তারা নিজেরাও ভেঙে কুচিকুচি হল ততদিন তাদের ভালো-বাসাও অটুট রইল।

আইডার ফুলের কথা

ছোটোমেয়ে আইডা বলল, "আহা, আমার ফুলগুলো সব শুকিয়ে গেছে, দেখেছ।" কৌচের উপর ওর পাশে একজন ছাত্র বসেছিল ; আইডা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কালকে এত সুন্দর দেখতে ছিল আর এরই মধ্যে সব নুইয়ে পড়েছে ! এর কি কারণ বলতে পার ?" ছাত্রটিকে তার বড়ো পছন্দ ছিল, কেমন গল্প বলত সে, কেমন কাগজ কেটে কত কি সুন্দর-সুন্দর জিনিস বানিয়ে দিত, হরতনের মধ্যে ক্ষুদে-ক্ষুদে মেয়েরা নাচছে, কতরকম ফুল, উঁচু-উঁচু রাজবাড়ি, তার দরজা খোলা যায়, এই-সব।

ছাত্রটি বলল, "ওমা, তাও জান না ? কাল যে তোমার ফুলরা সব নাচ-সভাতে গিয়েছিল, তাই এখন ক্লান্ত হয়ে মাথা ঝুলিয়ে রেখেছে।"

শুনে আইডা অবাক। "সে কি ! ফুলরা আবার নাচে নাকি ?" "তা আর নাচে না ! যেই-না অন্ধকার নামে আর আমরা সবাই শুয়ে পড়ি, ফুলরা নেচেকুঁদে একাকার হয় ! প্রায় রোজ রাতে ওদের নাচ-সভা বসে।" আইডা জিজ্ঞাসা করল, "ছোটো ছেলেমেয়েরা ঐ নাচ-সভায় যেতে পারে না ?"

ছাত্রটি বলল, "নিশ্চয়ই। ডেজি ফুলরা যায়, পাহাড়-তলির লিলি ফুলরা যায়।"

"সবচেয়ে সুন্দর ফুলরা কোথায় নাচে?"

"কেন, রাজার গ্রীষ্মাবাসের সামনে, মস্ত বাগানে যাও নি কখনো? সেই যে-জায়গাটা ফুলে ফুলে ঠাসা?"

আইডা বলল, "আরে, কালই সেখানে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম, কিন্তু গাছে তো একটাও পাতা ছিল না, কোথাও একটা ফুল দেখলাম না। সেগুলোর কি হল বল দিকিনি? বসন্তের শেষে কত ফুল দেখেছিলাম।"

ছাত্রটি বলল, "সব ফুল এখন রাজবাড়ির মধ্যে। যেই-না রাজা গ্রীষ্মের শেষে রাজবাড়ি ছেড়ে, সভাসদদের নিয়ে, শহরে চলে যান, অমনি ফুলরা সবাই বাগান ছেড়ে প্রাসাদে ঠাঁই নেয়। সেখানে তারা কি আমোদ-আহ্লাদে মেতে ওঠে, সে যদি একবার দেখতে! সবচাইতে সুন্দর দুটি গোলাপ ফুল রাজা-রানী সেজে সিংহাসনে চড়ে বসে। লালমোরগ ফুলরা নিচু হয়ে তাদের কুর্নিশ করে, সারি দিয়ে সামনে বসে পড়ে। তার পর সবচাইতে সুন্দর ফুলরা নাচ শুরু করে। নীল ভায়োলেট ফুলরা শিক্ষানবীশ নাবিক সাজে, তাদের সঙ্গে নাচে সুন্দরী মেয়ে সেজে যত সব হায়াসিন্থ্ আর ক্রোকাস ফুল। টিউলিপ ফুলরা আর লম্বা-লম্বা কমলা রঙের লিলি ফুলরা মা ঠাকুমা সেজে চারদিকে চোখ রাখে, যাতে সবাই সভ্যভব্য হয়ে চলে।"

আইডা আশ্চর্য হয়ে বলল, "কিন্তু রাজার প্রাসাদে কি ফুলরা কখনো নাচের আসর করতে পারে?"

ছাত্রটি বলল, "আরে, কেউ কিছু জানতে পারলে তবে তো! হয়তো রাতে একবার বুড়ো সরকারমশাই প্রকাণ্ড চাবির গোছা হাতে নিয়ে দেখে শুনে যান সব ঠিক আছে কি

না, কিন্তু যেই-না চাবির গোছার ঝুন্‌ঝুন্‌ শব্দ তাদের কানে যায়, ফুলরাও অমনি নাচ থামিয়ে, জানলার লম্বা-লম্বা রেশমী পরদার পিছনে লুকিয়ে পড়ে। সরকারমশাই বলেন, 'ফুলের গন্ধ পাচ্ছি যেন!' কিন্তু ফুলটুল দেখতে পান না!"

আইডা তখন হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "ভারি মজা তো! আমি গেলে ফুলদের দেখতে পেতাম না?"

ছাত্রটি বলল, "তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পেতে। এর পরের বার রাজবাড়িতে বেড়াতে গেলে, জানলা দিয়ে একবারটি উঁকি মারলেই কিছু দেখতে পাবে। আমি আজ গেছিলাম, দেখলাম, কৌচের উপর একটা লম্বা হলদে লিলি ফুল শুয়ে আছে। উনি কোনো সভাসদের স্ত্রী।"

আইডা বলল, "সরকারি বাগিচার ফুলরাও ওখানে যেতে পারে নাকি? অত দূর হাঁটতে পারে ওরা?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ইচ্ছা করলেই ফুলরা উড়তে পারে। ঐ যে ফুলের মতো দেখতে লাল হলুদ সুন্দর প্রজাপতিরা, ওরা ফুল নয় তো কি? বোঁটা থেকে লাফিয়ে উঠে, ছোটো-ছোটো পাখার মতো পাপড়ি নেড়ে, ওরা উড়ে বেড়ায়। ওরা যদি খুব লক্ষ্মী হয়, তা হলে বোঁটার উপর চুপ করে বসে না থেকে, সারা দিন ওদের উড়ে বেড়াতে দেওয়া হয়, সেটাই হল ওদের পুরস্কার। তার পর পাপড়ির মধ্যে থেকে সত্যিকার ডানা গজায়। অবিশ্যি এমনও হতে পারে যে সরকারি বাগিচার ফুলরা খবরই পায় নি যে রাজবাড়িতে রোজ রাতে আমোদ-আহ্লাদ হয়। আমি হলপ করে বলতে পারি যে এর পর যেদিন তুমি সরকারি বাগানে বেড়াতে যাবে, একটি ফুলের কানে কানে যদি বলে আস যে রাজবাড়িতে রাতে নাচের আসর

হবে, ফুল থেকে ফুলে খবরটা ছাড়িয়ে পড়বে আর রাতে সব্বাই সেখানে উড়ে গিয়ে হাজির হবে।

"ঠিক সেই সময় যদি বাগান দেখার ভার যাঁর উপরে সেই অধ্যাপকমশাই বাগানে এসে দেখেন যে ফুলরা কেউ নেই, তিনি ভেবেই পাবেন না তারা গেল কোথায়!"

ছাত্রটির আজগুবি কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে আইডা বলল, "হ্যাঁ, তাই বৈকি! বলি, ফুলের কানে কানে কি কথা বললাম, অন্য ফুলদের মধ্যে জানাজানি হবে কি করে? ফুলরা তো কেউ কথা কইতে পারে না!"

ছাত্রটি বলল, "তা পারে না মানছি, কিন্তু অঙ্গভঙ্গি করে মনের কথা প্রকাশ করতে তো পারে। এতটুকু বাতাস বইলে কেমন হেলেদুলে ওঠে দেখ নি? ঐভাবে ওরা ওদের মনের কথা জানায়, ঠিক যেমন করে আমরা কথা বলি।"

আইডা বলল, "আর অধ্যাপকমশাইও ওদের অঙ্গভঙ্গির মানে বুঝতে পারেন নাকি?"

"সে আর বলতে! একদিন সকালে তিনি বাগানে এসে দেখেন কিনা লম্বা এক বিছুটিগাছ হাত-পা নেড়ে একটা সুন্দর লাল কার্নেশন ফুলের সঙ্গে গল্পে মশগুল। বিছুটি বলল, 'কি সুন্দর দেখতে তুমি। তোমাকে আমি কত ভালোবাসি!' কিন্তু এ-সব ব্যাপার অধ্যাপকমশাই আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি বিছুটির পাতায়, পাতাগুলোই ওদের আঙুল কিনা—জোরে একটা টোকা লাগালেন। লাগিয়েই সে কী জ্বলুনি, তার পর থেকে অধ্যাপক আর বিছুটির গায়ে আঙুলটি তোলেন না!"

আইডা হা-হা করে খানিকটা হেসে বলল, "কি বোকা রে বাবা!"

সেদিন পরিদর্শকমশাই বেড়াতে এসেছিলেন, ওঁর কথা

শুনলে আইডার ভারি বিরক্ত লাগে। মাঝখান থেকে তিনি নাক গলিয়ে ছাত্রটিকে বললেন, "আচ্ছা, এ-সবের মানে কি? যত রাজ্যের বাজে কথা ছেলেপিলের মাথায় ঢোকাচ্ছ!" ছাত্রটির উপরে উনি হাড়ে চটা। যখনই তাকে পীচবোর্ডের ছবি কাটতে দেখতেন, তখনই বকাবকি শুরু করে দিতেন। অথচ কি চমৎকার সব ছবি কাটত সে, একটা লোক ফাঁসিকাঠে ঝুলছে, হাতে একটা হরতন, অর্থাৎ কিনা লোকের মন চুরি করেছে, লম্বা নাকের ডগায় স্বামীটিকে বসিয়ে ডাইনী-বুড়ি ঝাঁটায় চেপে চলেছে, এমনি ধারা কত কি। পরিদর্শকমশাই আজকের মতো সর্বদাই বলেন, "ছেলেপিলের মাথায় এ-সব বাজে ক পুরে দেবার মানেটা কি? যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প!"

এদিকে আইডার কিন্তু মনে হল ঐ ফুলদের কথাটি সত্যি ভারি আশ্চর্য; দিনরাত ওর সেই কথাই মনে পড়তে লাগল।

ওর মনে কোনোই সন্দেহ রইল না যে ওর নিজের ফুলগুলোর মাথা নুইয়ে রাখার একমাত্র কারণ হল সারারাত নাচার পর ওরা বেজায় ক্লান্ত, কাজেই যে সুন্দর টেবিলের উপরে ওর খেলনা সাজানো থাকত, ফুলগুলোকেও সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে ক্ষুদে একটা খেলার খাটে আইডার পুতুলটি ঘুমিয়েছিল। আইডা তাকে বলল, "এবার উঠতে হবে, সোফি, আজ রাতে খুশিমনে টেবিলের টানায় ঘুমোও দিকিনি। ফুল বেচারিদের শরীর খারাপ, ওরা তোমার বিছানায় শুয়ে পড়ুক। কাল সকালে হয়তো দেখব ওরা সেরে উঠেছে।" এই বলে পুতুলটাকে সে খাট থেকে তুলে নিল, অবিশ্যি তাতে পুতুলটা খুব একটা খুশি হল তা মনে হল না।

তার পর পুতুলের খাটে আইডা বাসি ফুলদের শুইয়ে দিল। বলল, "চুপ করে শুয়ে থাক, আমি তোমাদের জন্য চা করে নিয়ে আসছি। তা হলে কাল তোমরা সেরে উঠবে।" এই বলে আইডা খাটের চারদিকের পরদাটা ভালো করে টেনে দিল, যাতে রোদ লেগে ফুলদের চোখ না ঝলসে যায়।

সারা বিকেল ছাত্রটির ঐ গল্প ছাড়া মনে কোনো চিন্তা নেই। রাতে শুতে যাবার আগে সে একবার জানলার কাছে ছুটে গেল, পরদার বাইরে মায়ের টিউলিপ আর হায়াসিন্থ্ ফুলরা দাঁড়িয়েছিল। আইডা তাদের বলল, "আমি ঠিক জানি আজ তোমরা নাচ-সভায় যাবে।" ফুলগুলো কিন্তু একটা পাতা পর্যন্ত নাড়ল না, যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছে না!

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ধরে আইডা ভাবল রাজবাড়িতে ফুলদের নাচ দেখতে না জানি কি ভালোই লাগে। তার পর মনে মনে বলল, 'আমার নিজের ফুলরাও গেল কি না কে জানে!' এ-সব ভাবতে ভাবতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাতে এক-

বার ঘুম ভাঙল। এতক্ষণ সে কত কি স্বপ্ন দেখছিল, ছাত্রের কথা, ফুলদের কথা, পরিদর্শকমশাইয়ের কথা। পরিদর্শক-মশাই বলেছিলেন ও-সব কথা সত্যি নয়, চালাকি। ঘরের মধ্যে চুপচাপ, রাতের বাতিটি টেবিলের উপর জ্বলছে, মা-বাবা দুজনেই ঘুমিয়ে।

আইডা মনে মনে বলল, 'আমার ফুলগুলো এখনো সোফির খাটে শুয়ে আছে কি না কে জানে। একবার দেখতে ইচ্ছা করছে।' এই ভেবে সে মাথাটি তুলে, দরজার দিকে তাকাল। দরজাটি আধখোলা, আইডা দেখল ফুল, খেলনা সব যেমন ছিল তেমনি আছে। কান পেতে সে শুনতে লাগল; তখন মনে হল কে যেন পিয়ানো বাজাচ্ছে, কিন্তু এমন মৃদু এমন মিষ্টি পিয়ানোর সুর সে কখনো শোনে নি।

ভাবল, 'এবার নিশ্চয় ফুলরা নাচছে। বেজায় দেখতে ইচ্ছা করছে!' কিন্তু মা-বাবা যদি জেগে যান, এই ভয়ে আর ওঠা হল না। 'আহা, এ-ঘরে যদি একবার আসত ওরা।' তবু ফুলরা এল না, পিয়ানো বেজেই চলল, কি মিষ্টি সে সুর। শেষটা আর সে থাকতে পারল না, নাচ দেখতেই হবে। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে পা টিপে টিপে আইডা দরজার কাছে গেল। আহা, কি আশ্চর্য জিনিসই-না দেখল!

এখন আর রাতের বাতিটি জ্বলছে না, কিন্তু জানলা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মেঝেতে পড়েছে, ঘর আলোয় আলো। হায়াসিন্থ্‌রা আর টিউলিপরা দুই সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে, জানলার সামনে ফুলের টবগুলো খালি পড়ে আছে। কি নাচই-না হল! কতরকম নক্‌শাকাটা নাচ, এ ওর পাতায় পাতায় ধরাধরি করে। পিয়ানোর সামনে বসে ছিল মস্ত একটা হলদে লিলি ফুল, আইডার কেমন মনে হচ্ছিল ওকে আগেও নিশ্চয় কোথায় যেন

দেখেছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছাত্রটি একবার বলেছিল, এই হলদে লিলি ফুল দেখতে ঠিক লরাদিদির মতো, তাই শুনে সবাই খুব হেসেছিল। এখন ওরও মনে হল কথাটা ঠিকই, হলদে লিলি সত্যিই লরাদিদির মতো দেখতে, পিয়ানো বাজাবার ধরনটিও অবিকল এক, সেই একইভাবে লম্বা হলদে মুখটা একবার এপাশে একবার ওপাশে ফেরাচ্ছে আর তালে তালে মাথাটি নাড়াচ্ছে। এবার একটা লম্বা নীল ক্রোকাস ফুল এগিয়ে এসে একলাফে আইডার খেলনা রাখার টেবিলে চড়ল। চড়েই, সোজা খাটের কাছে গিয়ে পরদা সরিয়ে দিল। রুগ্ন ফুলগুলো শুয়েই ছিল, কিন্তু অমনি তারা উঠে পড়ে, অন্য ফুলদের নমস্কার করল। ফুলরা ওদের নাচে যোগ দিতে ডাকল। রুগ্ন ফুলরা নেমে এল। দেখে মনে হল তাদের রোগটোগ সেরে গেছে, মহা ফুর্তিতে সকলের সঙ্গে ওরাও নাচতে লাগল।

হঠাৎ একটা জোরে শব্দ শোনা গেল, কি যেন টেবিলের উপর থেকে ধপ্ করে পড়ল। আইডা তাকিয়ে দেখে পরবের দিন সকালে বিছানার উপর যে লাঠিটা পেয়েছিল, তার এখন ফুলের দলে ভিড়বার শখ হয়েছে। লাঠিটা সত্যি বড়ো সুন্দর দেখতে, হাতলের কাছে একটা মোমের পুতুল বসানো, তার মাথায় খাসা এক টুপি পরানো, টুপির চারদিকে লাল নীল রেশমী ফিতে বাঁধা। ফুলদের মাঝখানে লাঠিও ধেইধেই নাচতে শুরু করে দিল, সবার সঙ্গে মিলে পরম আনন্দে ঠুক্‌ঠুক্ করে লাফাতে লাগল।

হঠাৎ লাঠির হাতলের মোমের পুতুলটা ফুলে ফেঁপে প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া একটা দৈত্যের মতো হয়ে গিয়ে, চীৎকার করে বলল, "এ-সব কথা ছেলেপিলেদের মাথায় ঢোকাবার মানেটা কি? যত রাজ্যের বাজে গাঁজাখুরি গল্প সব!" এবার আইডা

তাকিয়ে দেখল দুফোঁটা জল যেমন অবিকল একরকম দেখতে হয়, তেমনি পুতুলটা আর পরিদর্শকমশাইও একেবারে হুবহু একরকম দেখতে, মায় মাথার টুপিটা পর্যন্ত! পুতুলের মুখটাও অবিকল পরিদর্শকের হলুদ-পানা খুঁৎখুঁতে মুখের মতো দেখাচ্ছিল। তার পরেই কিন্তু লাঠির গায়ের কাগজের ফুলরা পুতুলটার সরু-সরু ঠ্যাঙে এমনি চিমটি কাটতে লাগল যে দেখতে দেখতে যে-কে সেই, পুতুল আবার আগেকার সেই ক্ষুদে আকারটি ধরল। ব্যাপারটা আইডার কাছে এমনি মজার ঠেকল যে সে না হেসে পারল না। নাচ-সভার লোকরা কিন্তু কেউ অতটা লক্ষ্য করে নি, কারণ লাঠি তো সমানে নেচেই চলেছিল আর হাতলে বসা পরিদর্শক-মুখো পুতুলও, তার ইচ্ছা থাক বা নাই থাক, সমানে নাচতে বাধ্য হচ্ছিল। কখনো বেচারা রোগা হচ্ছে, কখনো মোটা হচ্ছে, কখনো লম্বা হচ্ছে, কখনো বেঁটে হচ্ছে, যতক্ষণ না ফুলরা ওর হয়ে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল, অগত্যা লাঠি ওকে ছাড়ান দিল।

এদিকে টেবিলের টানায় আইডার পুতুল শুয়ে; সেখান থেকে খুব জোরে ঠক্‌ঠক্ করে শব্দ হতে লাগল। সোফি ছাড়া আর কে! এবার সে দেরাজ থেকে মাথা বের করে বলল, "ওকি! তোমরা নাচ করছ নাকি? আমাকে কেউ বলে নি কেন?"

বাদাম-ভাঙার জাঁতি বলল, "নাচবে নাকি আমার সঙ্গে?" সোফি তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলল, "হুঁঃ! নাচবার আর সঙ্গী পেলাম না, ওঁর সঙ্গে নাচতে হবে!" এই বলে সে টেবিলের উপর বসে পড়ল, ইচ্ছাটা ফুলরা কেউ যদি এসে তার সঙ্গে নাচতে বলে। কিন্তু তা কেউ বলল না। তখন সোফি হম্‌ম্ হম্‌ম্ করে বার দুই গলা সাফ করল, তবু কেউ এল না।

এদিকে বাদাম-ভাঙার জাঁতি একা একাই নাচতে আরম্ভ করেছিল।

ফুলরা কেউ এগুচ্ছে না দেখে, সোফি হঠাৎ ধপাস্ করে মাটিতে পড়ল আর অমনি একটা সোরগোল উঠল। ফুলরা সব ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "আহা, লাগল নাকি?"

ভাগ্যিস্ লাগে নি। তখন ফুলরা খুব ভালো ব্যবহার করতে লাগল, বিশেষ করে আইডার নিজের ফুলরা। এই ফাঁকে তারা নিজের বিছানা ছেড়ে দেওয়ার জন্য সোফিকে ধন্যবাদ জানাল; বলল ঐ বিছানায় ওরা খুব আরামেই ঘুমিয়েছে। তার পর ওর সঙ্গে নাচবে বলে ফুলরা ওর হাত ধরল, বাকিরা চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়াল। সোফির আনন্দ দেখে কে! সে বারবার ফুলদের বলতে লাগল নাচ ভাঙলে তারা যেন আবার সোফির বিছানাতেই শোয়, টেবিলের টানায় শুতে সোফির কোনোই অসুবিধা নেই।

ফুলরা বলল, "তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কিন্তু অতক্ষণ তো আমরা বাঁচব না যে শোব। কালকের মধ্যে আমরা একেবারে মরে যাব। আইডাকে বোলো যেন তার পোষা ক্যানারি পাখির পাশে আমাদের কবর দেয়। তা হলে আগামী গ্রীষ্মে আমরা আবার ফুটব আর এ বছরের চাইতেও সুন্দর দেখতে হব।"

সোফি ফুলদের চুমো খেয়ে আদর করে বলল, "না, না, তোমরা মরে গেলে চলবে না।"

ঠিক সেই সময় দরজা খুলে গেল আর এক দল ফুল নাচতে নাচতে ঘরে এল। আইডা ভেবেই পেল না রাজার বাগান ছাড়া আর কোথা থেকে এরা আসতে পারে। সবার আগে ঘরে ঢুকল দুটি চমৎকার গোলাপ ফুল, মাথায় তাদের

সোনার মুকুট। তাদের পিছনে পিছনে কত রঙের কত সুগন্ধি ফুল এসে ঘরে ঢুকে, সবাইকে নমস্কার করতে লাগল।

ওরা আবার সঙ্গে করে বাজনদারের দল নিয়ে এসেছিল। এই বড়ো-বড়ো রঙিন পপি ফুল, পিওনি ফুল, মটরশুঁটির খোলার তৈরি বাঁশি বাজিয়ে বাজিয়ে মুখ লাল করে ফেলল। তার উপর নীল সাদা মিহি ফুলের দল মহা ফুর্তির সঙ্গে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। তার পর কতরকমের ফুল মিলে সে যে কতরকম নাচ দেখাল, ভায়োলেট, ডেজি, লিলি, আরো কত কি। তাদের নাচের সুললিত ভঙ্গি দেখলে চোখ জুড়োয়। অবশেষে ফুলরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল, তখন আইডাও গুটিগুটি আবার বিছানায় ঢুকে, এই-সব চমৎকার জিনিসের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

পরদিন সকালে উঠে, কাপড়-চোপড় পরেই আইডা টেবিলের কাছে গেল ; ফুলগুলো ঠিক আছে তো ? পুতুলের খাটের পরদা সরিয়ে দেখে, হ্যাঁ, ঐ তো সব ফুলরা শুয়ে আছে, তবে কালকের চাইতে আরেকটু শুকনো দেখাচ্ছে। টেবিলের টানায় শুয়ে আছে, মনে হচ্ছে তার বেজায় ঘুম পাচ্ছে।

আইডা বলে ছোটো মেয়েটি তাকে বলল, "আমাকে কি বলার কথা ছিল, মনে নেই বুঝি ?" সোফি বোকার মতো ভাব করে শুয়ে রইল, মুখে টুঁ শব্দটি নেই !

আইডা বলল, "তুমি মোটেই লক্ষ্মী মেয়ে নও, ফুলরা তবু তোমাকে তাদের সঙ্গে নাচতে দিয়েছিল !" তার পর খেলনার মধ্যে থেকে ক্ষুদে-ক্ষুদে পাখির ছবি আঁকা, ছোটো একটা পীচবোর্ডের বাক্স বের করে, আইডা তার মধ্যে শুকনো ফুলগুলোকে রাখল। তার পর বলল, "এই বাক্সটিতে করে তোমাদের মাটি দেব। আমার মাসতুতো ভাইরা যখন দেখা করতে আসবে, তখন আমার

সঙ্গে বাগানে গিয়ে তোমাদের পুঁতে দেবে। তা হলে আসছে গ্রীষ্মকালে তোমরা আবার ফুটবে আর এ বছরের চাইতেও সুন্দর দেখতে হবে।”

ঐ মাসতুতো ভাইদের নাম ছিল জোনাস আর এসবেন। ওদের বাবা ওদের দুটো নতুন তীর-ধনুক দিয়েছিলেন, সেগুলো আইডাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছিল। দেখা হলে পর আইডা ওদের বলল ফুলরা মরে গেছে এখন তাদের বাগানে নিয়ে

গিয়ে পুঁততে হবে। তীর-ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে আগে আগে ভাইয়া চলল, বাক্সটাতে মরা ফুলগুলোকে নিয়ে তাদের পিছনে পিছনে আইডা চলল। তার পর বাগানে একটা কবর খোঁড়া হল। আইডা আরেকবার ফুলদের চুমো খেল, তার পর বাক্সটাকে গর্তের মধ্যে নামিয়ে রাখল। বন্দুক, কামান তো আর ওদের ছিল না, কাজেই ফুলদের সম্মান দেখাবার জন্য জোনাস আর এসবেন কবরের উপর দিয়ে দুটি তীর ছুঁড়ল।

শুয়োর চরাবার লোকটার কথা

অনেকদিন আগে এক বেচারা রাজকুমার ছিল; তার একটা রাজ্যও ছিল! রাজ্যটা কিন্তু খুব ছোটো, তবু তার যা আয় হত, তাতেই বিয়ে করা চলত! রাজকুমারের বিয়ে করার বড়ো ইচ্ছা।

দেশ-বিদেশের লোকে তার নাম জানত। একশো রাজ-কন্যার কাছে প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করলে, তারা খুশি হয়ে বলত, "তোমাকে বিয়ে করব? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই; অনেক অনেক ধন্যবাদ?" এখন মুস্কিল হল যে রাজকুমারের ইচ্ছা সম্রাটের মেয়েকে বিয়ে করে। রাজকুমারের বাবার সমাধির উপরে একটা গোলাপগাছ গজিয়েছিল, সে যে কী সুন্দর গাছ, তার তুলনা হয় না। পাঁচ বছরে একটিবার মাত্র একটি ফুল ফুটত। কিন্তু সে কি ফুল! তার সুবাস নাকে গেলে সব দুঃখ-ভাবনা দূর হয়ে যেত।

তার উপরে রাজকুমারের একটি নাইটিঙেল পাখিও ছিল। সে পাখি এমনি মিষ্টি গান গাইত যে শুনলে মনে হত দুনিয়ার যত মধুর স্বর, সব বুঝি ওর ঐ ছোট্টো গলাটিতে বাসা বেঁধেছে! তাই রাজকুমার দুটি বড়ো-বড়ো রুপোর কৌটোয় গোলাপটি আর নাইটিঙেল পাখিটি ভরে, রাজকন্যাকে পাঠিয়ে দিল।

সম্রাট তাঁর বড়ো সভাঘরে জিনিস দুটিকে আনলেন।

সেখানে রাজকন্যা সখীদের সঙ্গে বাড়ি-বাড়ি খেলছিল। উপহারের কৌটো দেখে রাজকন্যা আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল।

রাজকন্যা বলল, "আহা, ওর মধ্যে যদি একটা ক্ষুদে বেড়াল-ছানা থাকে তো কি মজাই-না হয়!" কিন্তু বাক্স খুলতে বেরুল একটি গোলাপগাছ, তাতে একটিমাত্র গোলাপ ফুটে রয়েছে।

সখীরা বলল, "আহা, কি সুন্দর করে বানিয়েছে গো!"

সম্রাট বললেন, "শুধু সুন্দর কি বলছ, অতিশয় মনোহর বল?" কিন্তু রাজকন্যা গাছটাকে একবার ছুঁয়ে দেখে, কেঁদে ফেলে আর কি?

সে বলল, "এ রাম! ও বাবা, ওটাকে মোটেই কেউ বানায় নি! ওটা সত্যিকার গাছ! ছিঃ!"

সম্রাট বললেন, "মেজাজ খারাপ করবার আগে দেখাই যাক-না অন্য কৌটোতে কি আছে।" কৌটো খুলতেই নাইটিঙেল পাখি বেরিয়ে এমনি মিষ্টি গান ধরল যে গোড়ায় কারও মুখে একটিও নিন্দার কথা জোগাল না।

সভার মহিলারা বললেন, "অপূর্ব! চমৎকার!" ফরাসী ভাষায় বললেন, কারণ তাঁরা নিজেদের মধ্যে সর্বদা ভুলভাল ফরাসী বলতেন।

একজন বুড়ো সর্দার বললেন, "পাখিটাকে দেখে আমাদের স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞীর যে কলের গানের বাক্স ছিল, সেটার কথা বড্ডো মনে পড়ে যাচ্ছে; সেই একই সুর, একই কারিকুরি!"

সম্রাট বললেন, "ঠিক তাই, ঠিক তাই!" বলে চোখের জল ফেলতে লাগলেন।

রাজকন্যা বলল, "এখনো মনে মনে আশা করে আছি ওটা সত্যি পাখি নয়।"

যারা উপহার এনেছিল, তারা বলল, "সত্যিকার পাখি বৈকি !"

রাজকন্যা বলল, "তা হলে পাখিটাকে উড়িয়ে দাও !"

রাজকুমারের সঙ্গে সে দেখা করতেও রাজি হল না।

রাজকুমার কিন্তু অত সহজে হাল ছাড়ল না। সারা মুখে কালো মেটে রঙ মেখে, ভূত সেজে, গিয়ে একেবারে রাজবাড়ির দোরে ধাক্কা দিল।

দরজা খুলতেই সম্রাটকে বলল, "নমস্কার, মহামান্য সম্রাট-বাহাদুর ! রাজবাড়িতে একটা চাকরি মিলবে ?"

সম্রাট বললেন, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! গাদা-গাদা শুয়োর আছে আমাদের, তাদের দেখাশুনোর জন্য লোক দরকার।"

অগত্যা রাজকুমার 'রাজ-শুয়োরের পালক' পদে বহাল হল। শুয়োরদের খোঁয়াড়ের পাশে তাকে নোংরা একটা খুপ্রি দেওয়া হল। ঐখানে সে সারাদিন বসে বসে কাজ করতে লাগল আর সন্ধ্যা নামার আগেই একটা আশ্চর্য হাঁড়ি বানিয়ে ফেলল। হাঁড়িটার চারদিকে ঘণ্টা ঝোলানো, যেই-না হাঁড়ির রান্না ফুটতে থাকে, ঘণ্টাগুলো টুংটাং করে ওঠে আর পুরনো একটা গানের সুর বাজতে থাকে। গানটি হল—

হায় রে আমার প্রাণের অগাস্টিন,
সব গেল যে, সব গেল যে, সব গেল !

কিন্তু তার চাইতেও আশ্চর্য ব্যাপার হল, হাঁড়ি থেকে বেরুনো বাষ্পে একবার আঙুলটি ধরলে, শহরের যেখানকার যত রান্নাঘরের যত উনুনে, যা রান্না হচ্ছে সব কিছুর গন্ধ পাওয়া যেত !

রাজকন্যা ঐখান দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিল, সুরটা কানে যেতেই সে থামল ; মনে হল যেন বেশ খুশিই হয়েছে। কারণ

ঐ একটা সুরই তার জানা ছিল, ওটাকে সে এক আঙুলে বাজাত

রাজকন্যা বলল, "আরে, ওযে আমার সুর। তা হলে তো

শুয়োর চরাবার লোকটা বেশ শিক্ষিত! যা, যন্ত্রটার দাম জেনে আয়।"

সখীদের একজন, আগে পায়ে কাঠের খড়ম পরে নিল, তার পর এক দৌড়ে ভিতরে গেল।

সখী জিজ্ঞাসা করল, "হাঁড়িটার কত দাম নেবে?" শুয়োর চরাবার লোকটা বলল, "রাজকন্যার কাছ থেকে দশটা চুমো।" তাই শুনে রাজকন্যা বলল, "ব্যাটার আস্পর্ধা তো কম নয়! জেনে আয়, সখীরা কেউ দিলে চলবে কি না।"

শুয়োর চরাবার লোকটা বলল, "মাপ করবেন, তাতে চলবে না। রাজকন্যের কাছ থেকে দশটা চুমো, নইলে রইল হাঁড়ি আমার কাছে।"

রাজকন্যা বলল, "না, তা হলে তো চলবে না। আচ্ছা তোরা সবাই আমাকে ঘিরে দাঁড়া দিকিনি, যাতে কেউ না দেখে।" কাজেই সখীরা তাদের পোশাকগুলো বেশ করে ছড়িয়ে রাজকন্যাকে আড়াল করে দাঁড়াল, শুয়োর চরাবার লোকটা পেল দশটা চুমো, রাজকন্যা পেল হাঁড়িটা।

দিব্যি মজা হল। সমস্ত সন্ধ্যা আর তার পর সমস্ত দিন হাঁড়ি ফুটতে থাকল আর রাজবাড়ির অধ্যক্ষমশাই থেকে রাস্তার মুচি পর্যন্ত সারা শহরে কার বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে না হচ্ছে সখীদের জানতে বাকি রইল না। তারা ফুর্তির চোটে নাচল, কুঁদল, হাততালি দিল।

এদিকে শুয়োর চরাবার লোকটা একটিদিনও বাদ দিত না; রোজ নতুন কিছু তৈরি করত। শেষে একটা ঝুমঝুমি বানাল, সেটিকে ঘোরালে যেখানকার যত নাচের সুর, সব বেজে ওঠে।

পাশ দিয়ে যাবার সময়, তাই শুনে রাজকন্যা বলল, "বাঃ, বেড়ে জিনিস তো! এমন খাসা সুর তো কখনো শুনি নি। যা, দাম জেনে আয়, কিন্তু সাবধান! আর চুমোটুমো পাচ্ছে না ব্যাটা।"

সখী ফিরে এসে বলল, "ও তো একশোটা চুমো চায়।"

রাজকন্যা বলল, “লোকটা ক্ষেপেছে নাকি ?” এই বলে রওনা দিল। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে বলল, “দেখ, সর্বদা শিল্পসৃষ্টিকে উৎসাহ দিতে হয়। হাজার হোক, আমি হলাম গিয়ে সম্রাটের মেয়ে। যা, বল গে, সেদিনের মতো আমার কাছ থেকে দশটা চুমো পাবে, বাকিটা নাহয় আমার সখীদের কাছ থেকে আদায় করুক।” সখীরা বলল, “ওমা! তা কেন! ও আমাদের ভালো লাগে না।” রাজকন্যা বলল, “কি বিড়্‌বিড়্‌ করছিস্‌? আমি যদি ওকে চুমো খেতে পারি, তোরাও খুব পারবি।”

অগত্যা সখীদের আরেকবার লোকটার কাছে যেতেই হল। সে বলল, “রাজকন্যের কাছ থেকে একশো চুমো!”

রাজকন্যা বলল, “ঘিরে দাঁড়া।” সখীরা অমনি ঘিরে দাঁড়াল, চুমো খাওয়া চলতে লাগল।

ঠিক সেই সময়ে সম্রাট তাঁর দোতলার ঝোলানো বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েই অবাক হয়ে বললেন, “শুয়োরের খোঁয়াড়ের কাছে ও কিসের ভীড়?” তার পর চোখ ঘঁষে, চশমা এঁটে, তাঁর চক্ষু চড়কগাছ! “ওযে আমার রাজসভার মহিলারা মনে হচ্ছে? একবার নিজে গিয়ে দেখতে হয় কী ব্যাপার!”

সখীরা এদিকে চুমো গুণতে এতই ব্যস্ত যে সম্রাটের আগমন কেউ টের পায় নি। সম্রাট পায়ের আঙুলে ভর করে উঁকি দিলেন, ব্যাপার দেখে তো তিনি চটে কাঁই! “এ-সব কি হচ্ছেটা কি?” এই বলে রাজকন্যের কান ধরে কষে পেঁচিয়ে দিলেন।

তার পর সম্রাট মেয়েকে বললেন, “পথ দেখ!” তিনি বাস্তবিকই বেজায় রেগে গেছিলেন। তার পর শুয়োর চরাবার লোকটাকে আর রাজকন্যেকে, দুজনকেই শহর থেকে বের করে দেওয়া হল।

রাজকন্যে কেঁদেকেটে একাকার, শুয়োর চরাবার লোকটা খুব খানিকটা বকাবকি করল, তার উপর মাথার উপর ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল।

রাজকন্যা বলল, "হায়, হায়, আমার মতো অভাগিনী কে আছে। সেই সুন্দর দেখতে রাজকুমারকে বিয়ে করলেই হত। আমার কপালটাই মন্দ !"

শুয়োর চরাবার লোকটা তখন একটা গাছের পিছনে গিয়ে মুখ থেকে মাটি ময়লা ধুয়ে ফেলে, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-চোপড় ছেড়ে, আবার রাজকুমারের মতো পোশাক পরে বেরিয়ে এল। তার চেহারার সে কী মহিমা! তাই দেখে রাজকন্যা মাথা নিচু করে নমস্কার না করে পারল না।

রাজকুমার বলল, "তোমাকে ঘৃণা জানাতে এসেছি। সম্মানিত রাজপুত্র তোমার মনে ধরল না! গোলাপ ফুল আর নাইটিঙেল পাখির মূল্য বুঝলে না! অথচ খেলো একটা খেলনার জন্য শুয়োর চরাবার লোককে চুমো খেতে রাজি হলে ? ঠিক হয়েছে! তোমার উচিত সাজাই হয়েছে!"

এই বলে রাজকুমার নিজের ছোটো রাজ্যটিতে ফিরে গিয়ে, রাজকন্যার নাকের উপর দরজা এঁটে দিল। আর রাজকন্যা ?

রাজকন্যার তখন সেই গানটাই গাওয়া উচিত ছিল—

হায় রে আমার প্রাণের অগাস্টিন,
সব গেল যে, সব গেল যে, সব গেল।

যে চোখে ধুলো দেয় তার কথা

যে লোকটা চোখে ধুলো দেয় সে হল ঘুমপাড়ানি বুড়ো। তার মতো এত গল্প দুনিয়াতে কেউ জানে না। আর সে কী সব চমৎকার গল্প!

সন্ধ্যাবেলায় ছেলেপুলেরা যখন টেবিলের চারধারে, কিম্বা ছোটো-ছোটো টুলের উপর চুপচাপ বসে থাকে, তখন জুতো খুলে, পা টিপেটিপে লোকটা উপরতলায় উঠে আসে। দরজা খোলে তো এতটুকু শব্দ হয় না, ঢুকেই হঠাৎ সবার চোখে ধুলো ছুঁড়ে দেয়। তার পর সুড়ুৎ করে ওদের পিছনে গিয়ে খুব আস্তে ঘাড়ে ফুঁ দেয়, অমনি ওদের চোখের পাতা ভারী হয়ে ওঠে। অবিশ্যি তাতে কারও কোনো অনিষ্ট হয় না, লোকটা ভালো মনে করেই ওরকম করে। ওরা চুপ না করলে সে গল্প বলবে কী করে?

ছেলেমেয়েরা ঘুমে ঢুলে পড়লে, লোকটা এসে খাটের উপর বসে। কিরকম সেজেছে, বাবা! গায়ের জামা রেশম দিয়ে তৈরি, কিন্তু রঙটা যে কী তা ঠিক করে বলা যায় না, কখনো মনে হয় সবুজ, কখনো লাল, কখনো নীল, যখন যেমন আলো পড়ে। আবার দুই বগলে দুই ছাতা। একটার উপরে রঙ-বেরঙের ছবি আঁকা। সে ছাতাটি লোকটা লক্ষ্মী ছেলে-

মেয়েদের উপরে খুলে ধরে। তাতে তারা সারারাত ধরে কী যে সব ভালো-ভালো স্বপ্ন দেখে। অন্য ছাতাটা একেবারে ন্যাড়া, সেটাকে দুষ্টু ছেলেমেয়েদের উপর খুলে ধরে। তাতে তারা সারারাত এমনি অঘোরে ঘুমোয় যে স্বপ্ন-টপ্ন কিছু দেখে না, একেবারে সকালে জেগে ওঠে।

হিয়ালমার বলে একটা ছোটো ছেলের কাছে লোকটা পুরো এক সপ্তাহ ধরে, রোজ রাতে এসেছিল। তাকে সে কবে কী গল্প বলেছিল এবার সেগুলো শোনা যাক।

সোমবার

হিয়ালমারকে বিছানায় পেড়ে ফেলেই লোকটা বলল, "শোন, তোমার ঘরটি এবার সাজিয়ে দিই।" যেই-না বলা অমনি, ফুলের টবের ছোটো-ছোটো ফুলগাছগুলো বেড়ে উঠে প্রকাণ্ড গাছ হয়ে গেল। গাছের ডালপালাগুলো উঁচু হতে হতে ঘরের ছাদে ঠেকল, দেয়াল ঢেকে ফেলল, তখন ঘরটাকে মনে হতে লাগল যেন চমৎকার একটা কুঞ্জবন। প্রত্যেকটা ডাল ভালো ফুলে ভরে গেল, আর সে কী ফুল! গোলাপের চেয়েও দেখতে সুন্দর আর কী সুগন্ধে ভরা! ফুলগুলোকে যদি কেউ চেখে দেখত, তা হলে ফলের মোরব্বার মতো মিষ্টি লাগত। শুধু তাই নয়, গাছের ডাল থেকে সোনার মতো ঝক্‌ঝকে সব ফল ঝুলতে লাগল, তা ছাড়া কিসমিসে ঠাসা মণ্ডা! এরকম কেউ কখনো চোখে দেখে নি। কিন্তু সেইসঙ্গে একটা মহা কান্না-কাটিও শোনা গেল। শব্দটা আসছিল টেবিলের যে দেরাজে হিয়ালমারের পড়ার বই থাকত, তার ভিতর থেকে।

লোকটা তখন উঠে গিয়ে দেরাজটাকে টেনে খুলে বলল,

"বলি, ব্যাপার কি ?" দেখা গেল দেরাজের মধ্যে একটা শ্লেট, তাতে অঙ্ক কষা ; অঙ্কের সংখ্যাগুলো বেজায় ভিড় পাকিয়ে ঠেসাঠেসি করে আছে। অঙ্কে বুঝি একটা ভুল সংখ্যা কী করে ঢুকে গিয়ে, সব পণ্ড করে দিলে আর-কি !

পেনসিলটা কুকুরছানার মতো লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একশা হচ্ছে। তার বড়ো ইচ্ছা অঙ্কটাকে একটু সাহায্য করে, কিন্তু সে আর পেরে উঠছে না। একটু দূরেই হিয়ালমারের কাপি লেখার খাতাটা পড়ে রয়েছে। প্রত্যেক পাতার প্রত্যেক লাইনের গোড়ায় একটা করে বড়ো হাতের অক্ষর লেখা আর তারই পাশে একটা ছোটো হাতের অক্ষর। এই হল কাপি। এই দেখে লিখতে হয়। কাপির নীচে যে-সব অক্ষর লেখা হয়েছে, তাদের ঐ একইরকম দেখতে হবার কথা। ওগুলো হিয়াল-মারের হাতে লেখা। কিন্তু কোথায় লাইনের ওপর সোজা দাঁড়িয়ে থাকবে, তা না, এ পাশে ও পাশে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে !

কাপি বলল, "এই দেখ, এইরকম করে দাঁড়াতে হয়, এই-ভাবে একটু তেরচা হয়ে, কেমন হঠাৎ গোল হয়ে ঘুরে আসতে হয়, দেখ।" হিয়ালমারের লেখা হরফগুলো বলে উঠল, "আরে, তাই তো আমাদের ইচ্ছা ! কিন্তু পারছি না যে, দেখ না কী বিশ্রী করে একেকজনকে লিখেছে !"

ঘুমপাড়ানি বুড়ো বলল, "তা হলে তো দেখছি ছোটোরা যে পুরিয়া খায়, তোমাদেরও সেই ওষুধ দিতে হচ্ছে !"

হরফগুলো আঁতকে উঠল, "না, না, এই দেখ-না !" এই বলে সবাই এমনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল যে দেখে দুচোখ জুড়ুল।

বুড়ো বলল, "বেশ, তা হলে এখন গল্প বলা থাক বরং এই

হরফগুলোকে একটু কুচকাওয়াজ করানো যাক—ডান পা, বাঁ পা, ডান পা, বাঁ পা!” এই-না বলে হরফগুলোকে ধরে বুড়ো এমনি কুচকাওয়াজ করাল যে তাদের একেবারে খাড়া নিটোল চেহারা হয়ে গেল। কাপির খাতায় ছাড়া এমন হরফ কেউ কখনো দেখে নি। দুঃখের বিষয়, পরদিন সকালে খাতা খুলে হিয়ালমার দেখল তার লেখা হরফগুলো একটুও বদলায় নি, আগের মতোই বিশ্রী তেড়া-বাঁকা হয়ে রয়েছে।

মঙ্গলবার

হিয়ালমারও শুয়ে পড়ল, আর ঘুমপাড়ানি বুড়োও তার জাদুকাঠি দিয়ে ঘরের আসবাবগুলোকে ছুঁয়ে দিল। অমনি, তারা সকলে কথা কইতে লাগল। শুধু তাই নয়, সবাই কেবল যে যার নিজের কথাই বলতে লাগল। একমাত্র পিকদানীটা চুপ করে রইল; তার বেজায় রাগ যে তার কথা কারও মনেও পড়ল না, সবাই কেবল নিজেদের বিষয়ই বলতে ব্যস্ত এমনই দেমাক! অথচ সে সর্বদা বিনীতভাবে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে আর যার খুশি তার গায়ে থুথু ফেলছে!

কাপড়ের আলমারির মাথার ওপরে গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো একটা মস্ত ছবি ঝুলছিল! সেই ছবিতে কত কী আঁকা ছিল। লম্বা-লম্বা কত গাছ গজিয়েছে, ঘাসের মধ্যে ফুল ফুটে রয়েছে, বনের চারধার ঘুরে একটা নদী সমুদ্রের দিকে বয়ে চলেছে, তার তীরে তীরে কী চমৎকার সব প্রাসাদ!

ঘুমপাড়ানি বুড়ো ছবিটাতে জাদুকাঠি ছোঁয়াল। অমনি পাখিরা গাইতে লাগল, গাছের ডালপালা দুলে উঠল, মেঘ ভেসে চলল, সমস্ত দৃশ্যপটের ওপর দিয়ে মেঘের ছায়াও ভেসে চলল।

বুড়ো তখন ক্ষুদে হিয়ালমারকে ছবির কাছে তুলে ধরল, অমনি হিয়ালমার পা বাড়িয়ে ছবির মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার পরেই চেয়ে দেখে কিনা ছবির লম্বা ঘাসের মাঝখানে সে দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে। জলের ধারে অমনি সে দৌড়ে গেল। জলে লাল সাদা রঙ করা ছোট্টো একটা নৌকো ভাসছিল, তার পালগুলো রুপোর মতো ঝক্‌মক্ করছিল। হিয়ালমার সেই নৌকোতে চড়ে বসল। গলায় সোনার ফুলের মালা পরা, মাথায় বাঁধা চক্‌মকে নীল তারা, ছয়টা রাজহাঁস নৌকোটাকে টেনে একটা শ্যামল সবুজ বনের ধারে নিয়ে গেল। সে বনের গাছরা এ ওকে ডাকাতদের গল্প, ডাইনীদের গল্প বলছিল আর বনের ফুলরা সবাই সুন্দর ছোট্টো-ছোট্টো পরীদের কথা আর প্রজাপতিরা পরীদের কাছে কী বলেছিল সেই কথা নিয়ে বলাবলি করছিল।

নৌকোর পিছন-পিছন অপূর্ব সুন্দর সব মাছ ভেসে চলেছিল, তাদের আঁশ সোনা-রুপোর মতো দেখতে। মাঝে মাঝে তারা জল থেকে লাফিয়ে উঠছিল, তখন হিয়ালমারের মাথায় মুখে জলের ছিটে লাগছিল। লাল নীল ছোটো বড়ো নানান্ পাখি লম্বা দুই সারি বেঁধে হিয়ালমারের পিছনে উড়ে চলল। ডাঁশপোকারা নাচ ধরল, ঝিল্লিরা ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ তুলল। সবাই চায় হিয়ালমারের সঙ্গে যেতে, সবাই তাকে গল্প শোনাতে চায়।

কী চমৎকার সে নৌকোযাত্রা সে বলা যায় না। পাশের বনটাকে কখনো মনে হয় বড়ো ঘন, বড়ো ঘুপ্‌সি ; আবার কখনো মনে হয় যেন একটা বাগানের মতো, ফুলেতে আর রোদেতে ঝল্‌মল্ করছে। গাছপালার মাঝে মাঝে বড়ো-বড়ো প্রাসাদ মাথা তুলে রয়েছে, সেগুলো হয় কাঁচের নয়তো শ্বেতপাথরের তৈরি। সে-সব বাড়ির ঝোলা বারান্দায় কত রাজকন্যে, তারা

সবাই হিয়ালমারের খুব চেনা, তাদের সঙ্গে সে কত খেলা করছে। হিয়ালমারকে দেখে তারা সকলে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, প্রত্যেকের হাতে চমৎকার একটা চিনির পুতুল, মিষ্টির দোকানে যেমন পাওয়া যায়। পাশ দিয়ে যাবার সময় হিয়ালমার খপ্ করে একটা পুতুলের মাথা ধরে ফেলল, রাজকন্যের হাতে অন্য দিকটা রইল। পুতুল ভেঙে দুখানা হল, রাজকন্যে পেল ছোটো টুকরোটা, হিয়ালমার পেল বড়োটা।

ছেলেমানুষ রাজকুমাররা প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছিল। তারা সোনার তলোয়ার কাঁধে তুলে, রাশি রাশি কিসমিস আর টিনের তৈরি খেলনার সেপাই চারদিকে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল। এরা সত্যিকার রাজকুমার। নৌকো চড়ে হিয়ালমার চলেছে, কখনো-বা প্রকাণ্ড সব সভাঘরের মধ্যে দিয়ে, কখনো-বা শহরের মাঝখান দিয়ে, আরো অনেক শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে, যেখানে হিয়ালমারের বুড়ি ধাই-মা থাকত, তার পাশ দিয়ে নৌকো বয়ে চলল। ছোটোবেলা থেকে ধাই-মা ওকে মানুষ করেছিল, কত ভালোবাসত ওকে। ওকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ধাই-মা মাথা নেড়ে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল, তার পর গান গেয়ে শোনাল। অমনি যেখানকার যত পাখি সবাই তার সঙ্গে গান ধরল, বোঁটার ওপর ফুলগুলি নাচতে লাগল আর বুড়ো গাছরাও মাথাটাথা নেড়ে একাকার, কারণ ঘুমপাড়ানি বুড়ো তাদেরও কত গল্প বলত।

বুধবার

বাবা, কী বৃষ্টি, কী বৃষ্টি! ঘুমের ঘোরেও হিয়ালমার বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছিল আর যেই-না ঘুমপাড়ানি বুড়ো জানলা খুলল, একেবারে জানলার চৌকাঠ অবধি জল এল। দেখা

গেল বাড়ির সামনে বেশ বড়ো একটা দীঘি, তাতে চমৎকার একটা জাহাজ ভাসছে!

বুড়ো বলল, "যাবে নাকি আমার সঙ্গে বেড়াতে, হিয়ালমার? যাবে তো এসো, রাতে বিদেশে বেড়িয়ে, সকালে আবার ফেরা যাবে।"

তার পরেই দেখা গেল সেজেগুজে হিয়ালমার জাহাজ চেপে বসেছে! অমনি আকাশের মেঘ কেটে গেল; বড়ো রাস্তা দিয়ে জাহাজ ভেসে চলল। একটু পরেই গির্জার চারদিকে একটা পাক খেয়ে, ওরা খোলা সাগরে পাড়ি দিল। দেখতে দেখতে আর ডাঙা দেখা গেল না, শুধু চোখে পড়ল একঝাঁক সারস পাখি। তারা হিয়ালমারদের দেশ ছেড়ে গরম দেশে শীত কাটাতে চলেছে। একজনের পিছনে একজন সারি বেঁধে উড়তে উড়তে এরই মধ্যে তারা ডাঙা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে।

একটা সারস এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে, মনে হল ডানা-দুটি আর তাকে বইতে পারছে না। ও ছিল পাখির সারির একেবারে শেষে; দেখতে দেখতে সে অনেক পেছিয়ে পড়ল, তার পর ডানা মেলে ক্রমে নীচে নেমে আসতে লাগল। অনেক চেষ্টা করেও ডানা আর চলে না। শেষে ডানাদুটি জাহাজের দড়িদড়ায় ঠেকে গেল, পাখিও অমনি পাল বেয়ে পিছলে নেমে ধুপ্ করে একেবারে পাটাতনের উপরে দাঁড়াল। তখন জাহাজের ছোকরা চাকর তাকে ধরে নিয়ে, যেখানে জাহাজের হাঁস, মুরগি, পেরুদের রাখা হত, সেইখানে পুরে দিল। সারস বেচারা তাদের মাঝখানে পড়ে একেবারে হকচকিয়ে গেল।

মুরগিরা সবাই বলল, "দেখেছিস কী বোকা!" পালের গোদা বুড়ো পেরু যতটা পারে পালক ফুলিয়ে বিকট চেহারা ধরে তাকে শুধোল, "তুমি কে হে?" হাঁসগুলো হেলেদুলে পিছুবাগে

হটতে হটতে, এ ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, "প্যাঁক—প্যাঁক।"

তখন সারস তাদের তার প্রিয় আফ্রিকা দেশের কথা বলল; সেখানে কেমন গরম; সেখানে পিরামিড বলে কেমন সেকালে তৈরি উঁচু-উঁচু স্তূপ আছে। আরো বলল উট পাখিদের কথা, তারা কেমন মরুভূমির ওপর দিয়ে বুনো ঘোড়ার মতো ছোটে। কিন্তু হাঁসরা কিছুই বুঝল না; তারা আবার এ ওকে ঠেলা দিয়ে বলল, "বেজায় হাঁদা, না ভাই?" বুড়ো পেরু বলল, "সত্যিই বেজায় হাঁদা!" এই বলে গবর্-গবর্ শব্দ করতে লাগল।

কাজেই সারস চুপ করে তার প্রিয় আফ্রিকার কথা ভাবতে লাগল। তখন বুড়ো পেরু বলল, "বাঃ, তোমার ঠ্যাংদুটো তো ভারি হাল্কা, সুন্দর। এক গজের দাম কত?" হাঁসরা অমনি প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক করে হাসাহাসি জুড়ল। সারস যেন কথাটা শুনতেই পেল না।

বুড়ো পেরু বলল, "বলি, ওদের সঙ্গে হাসতে আপত্তিটা কিসের? অমন খাসা একখানা রসিকতা করলাম। তোমার পক্ষে বুঝি যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের হয় নি? ও হো, এর দেখছি বড়ো ভারিক্কে চাল। চল হে, আমরা নিজেদের মতো আমোদ করি।" এই বলে পেরুটা গবর্-গবর্ করতে লাগল, মুরগিরা কঁক-কঁক করতে লাগল, হাঁসরা প্যাঁক-প্যাঁক লাগাল। ঐরকম বিকট শব্দ করাই হল ওদের আমোদের ধরন!

ঠিক সেই সময় হিয়ালমার মুরগিদের ঘরে গিয়ে সারসটাকে ডাকল আর সারসও একলাফে পাটাতনে উঠে এল। ততক্ষণে তার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। হিয়ালমারের দিকে সে মাথাটা একবার নোয়াল, যেন ধন্যবাদ জানাচ্ছে; তার পর ডানা মেলে উড়ে চলে গেল। এদিকে মুরগিগুলো কঁক-কঁক করতে লাগল,

হাঁসগুলো প্যাঁক-প্যাঁক করতে লাগল আর পালের গোদা বুড়ো পেরুর মুখটা আগুনের মতো লাল হয়ে উঠল।

হিয়ালমার বলল, "কাল তোদের সবাইকে দিয়ে সুরুয়া রাঁধা হবে।" বলেই ঘুম ভেঙে দেখে সে নিজের ক্ষুদে খাটখানাতেই শুয়ে আছে! সে রাতে ঘুমপাড়ানি বুড়ো তাকে কী অদ্ভুতরকম বিদেশ-ভ্রমণই-না করিয়েছিল!

বৃহস্পতিবার

ঘুমপাড়ানি বুড়ো বলল, "ছোট্টো একটা ইঁদুর দেখাই তোমাকে কি বল? ভয় পেয়ো না কিন্তু!" এই বলে সে হাত বাড়িয়ে দিল; হাতে সুন্দর একটা ক্ষুদে জানোয়ার।

"ইঁদুর-মেয়ে তোমাকে একটা বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে এসেছে। এখানে দুটি ছোটো ইঁদুর থাকে, আজই রাতে তাদের বিয়ে করার ইচ্ছা। তোমাদের খাবারঘরের মেঝের নীচে ওরা থাকে; ওদের বাড়িটা নিশ্চয় ভারি সুন্দর!"

হিয়ালমার বলল, "কিন্তু অত ছোটো গর্ত দিয়ে ঢুকব কী

করে?” বুড়ো বলল, “সেটা নাহয় আমার হাতেই ছেড়ে দিলে। আমি তোমাকেও এতটুকু বানিয়ে দিচ্ছি।” এই বলে সে হিয়ালমারের গায়ে জাদুকাঠি ছোঁয়াল। অমনি হিয়ালমার ছোটো হতে হতে একেবারে নিজের আঙুলটার মতো হয়ে গেল। বুড়ো বলল, “এবার টিনের সেপাইয়ের কাপড়-চোপড়গুলো চেয়ে নাও, বোধ হয় তোমার গায়ে ঠিক হবে। লোকের সামনে সামরিক পোশাক পরে বেরুলে, ভারি খাতির পাওয়া যায়।”

হিয়ালমার বলল, “হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।” এই বলে এক মুহূর্তের মধ্যে ক্ষুদে টিনের সেপাইয়ের মতো খাসা সাজ করে নিল।

তখন ছোট্টো ইঁদুর-মেয়ে বলল, “এবার যদি অনুগ্রহ করে তোমার মায়ের সেলাই-বাক্সের আঙুলঢাকাটার মধ্যে বসে পড় তো তোমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করি!”

হিয়ালমার বলল, “সে কি! সত্যি এত কষ্ট করবে?” ব্যস্! তারা ইঁদুরদের বিয়েবাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

প্রথমে সরু-লম্বা একটা পথ, এতটুকু উঁচু যে আঙুল-ঢাকাটাকে কোনোমতে তার ভিতর দিয়ে টেনে নেওয়া যায়। সমস্তটা ব্যাঙের ছাতার আলোয় আলো।

টানতে টানতে ইঁদুর-মেয়ে বলল, “চমৎকার একটা গন্ধ পাচ্ছ না? সমস্ত পথটায় শুকনো মাংসের খোসা পাতা কিনা, তার চেয়ে ভালো গন্ধ আর কী হতে পারে, বল!”

তার পরই তারা বিয়েবাড়িতে পৌঁছে গেল। ঘরের ডান দিকে ইঁদুর-মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে গল্প-গুজব করছিল, মনে হল তাদের ভারি ফুর্তি হয়েছে। ঘরের ডান দিকে ইঁদুর ভদ্রলোকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাবা দিয়ে গোঁফে তা

দিচ্ছিল। ঘরের মাঝখানে একটা ফোঁপরা পনীরের খোলায় দাঁড়িয়ে, ইঁদুর বর-কনে সকলের সামনে এ ওকে কেবলই চুমু খাচ্ছিল। বাইরের পথটার মতো এ-ঘরের মেঝেতেও শুকনো মাংসের খোসা পাতা। এ ছাড়া আর কোনো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। অবিশ্যি শেষে মিষ্টির বদলে সবাইকে একটা মটরের দানা দেখানো হল, তাতে ইঁদুরদের এক আত্মীয় দাঁত দিয়ে কেটে কেটে বর-কনের নামের প্রথম অক্ষর দুটি লিখেছে। ভারি বুদ্ধি, না?

সব ইঁদুররা একবাক্যে বলল, ব্যবস্থা ভারি পরিপাটি হয়েছে, আলাপ-আলোচনা অতিশয় অভিজাত। সব যখন শেষ হয়ে গেল হিয়ালমার বাড়ি ফিরে এল। মনের মধ্যে একটু খুঁৎখুঁৎ করছিল যে এত ছোট্টো হয়ে, একটা টিনের সেপাইয়ের পোশাক পরে, বিয়েবাড়িতে গেলে, নিজের মান থাকে কোথায়?

শুক্রবার

হিয়ালমার জিজ্ঞাসা করল, "আজ কি করা হবে?" বুড়ো বলল, "কি জানি, আবার আরেকটা বিয়েতে যেতে তোমার ভালো লাগবে কি না? তবে এ বিয়েটা কালকেরটার চাইতে একেবারে অন্যরকমের হবে। তোমার দিদির বড়ো পুতুলটা, যেটা ঠিক মানুষের মতো দেখতে, যার নাম হার্মান, তার সঙ্গে বার্থা পুতুলের বিয়ে হবে। তা ছাড়া আজ কার যেন জন্মদিন, তাই ওরা নিশ্চয় অনেক উপহারও পাবে।"

হিয়ালমার বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথা আমার জানাই আছে। যখনই পুতুলদের নতুন কাপড়-চোপড়ের দরকার হয়, দিদি হয় বলে ওদের জন্মদিন, নয় বলে ওদের বিয়ে! এমনি করে ওদের কম করে একশোবার বিয়ে হয়েছে!"

বুড়ো বলল, "হ্যাঁ, কিন্তু আজ রাতে ওদের একশো এক বারের বিয়ে হবে। এর পর ওদের আর বিয়ে হতে পারবে না। কাজেই এ বিয়েটাতে মহা ধুমধাম হবে, একবার চেয়েই দেখ-না !"

টেবিলের ওপর পুতুলদের বাড়ি, হিয়ালমার সেদিকে তাকিয়ে দেখল। জানলা দিয়ে ঘরে ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে, টিনের সেপাইরা বন্দুক কাঁধে করে দাঁড়িয়ে আছে। বর-কনে টেবিলের পায়ায় ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে আছে। তার পর ঘুমপাড়ানি বুড়ো ঠাকুমার কালো পোশাক গায়ে দিয়ে পুতুলদের বিয়ে দিল। বিয়েটিয়ে হয়ে গেলে, ঘরের আসবাবগুলো লেড্-পেনসিলের লেখা চমৎকার একটা গান ধরল।

তার পর বর-কনের জন্য নানান উপহার এল। কোনো খাবার জিনিস ওরা নিল না। বলল নাকি ভালোবাসা দিয়েই পেট ভরাবে। বর জিজ্ঞাসা করল, "এবার পাড়াগাঁয়ে যাব, নাকি বিদেশ-ভ্রমণে যাব ?" সোয়ালো পাখি দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছে, তার সঙ্গে পরামর্শ করা হল। বুড়ি মুরগি-মা পাঁচ ক্ষেপ ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা তুলেছে, তার সঙ্গেও পরামর্শ করা হল। সোয়ালো সুদূর সুন্দর সব দেশের কথা বলল, যেখানে কখনো বেশি শীত পড়ে না, যেখানে আঙুর-লতায় রসে-ভরা বড়ো-বড়ো আঙুরের থোপা ঝুলে থাকে, বাতাস যেখানে মৃদু মধুর গন্ধে ভরা আর পাহাড় পর্বতের সে কি রঙের খেলা, এ দেশের কেউ তেমন দেখে নি।

মুরগি-মা বলল, "তা হতে পারে, কিন্তু সেখানে আমাদের এখানকার মতো সবুজ সবুজ বাঁধাকপি নেই। একটা গ্রীষ্মকালে বাচ্চাদের সঙ্গে পাড়াগাঁয়ে কাটিয়েছিলাম। দিব্যি একটা কাঁকরের ঢিপি ছিল, তার উপর আমরা কেমন আঁচড়ে ঠুক্‌রে বেড়াতে পারতাম। তা ছাড়া সবুজ বাঁধাকপিতে বোঝাই একটা

বাগানেও যেতে পারতাম। আহা, বাঁধাকপিগুলো কী সবুজ, কী সবুজ! ওর চেয়ে সুন্দর জিনিস মনেও ভাবতে পারি না!"

সোয়ালো বলল, "কিন্তু সব বাঁধাকপির মুণ্ডুই তো এক-রকম দেখতে আর আমাদের এখানে বৃষ্টি তো লেগেই আছে।"

মুরগি-মা বলল, "ওটুকু সবার অভ্যাস হয়ে যায়।"

"তার উপর আবার যখন শীত পড়ে, তখন জমে সব বরফ হয়ে যায়।"

মুরগি-মা বলল, "আহা, সেটা তো বাঁধাকপির পক্ষে ভালোই। আর মাঝে মাঝে খানিকটা গরমও পড়ে বৈকি। মনে নেই, চার বছর আগে পুরো পাঁচ সপ্তাহ ধরে গরম পড়েছিল? এমনি গরম পড়েছিল যে নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হত। তা ছাড়া মনে রেখ, বিদেশের মতো এখানে অত বিষাক্ত জানোয়ারও নেই। ডাকাত টাকাতের ভয়ও নেই। যে আমাদের দেশটাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর বলে মনে করে না, সে অতিশয় মূঢ়! সে এদেশে থাকারই যোগ্য নয়!" এ কথা বলতে বলতে মুরগি-মার দুচোখ থেকে ধারা নামল। সে বলতে লাগল, "আমিও তো দেশভ্রমণ করেছি। একবার একটা খাঁচার মধ্যে করে বারো মাইল দূরে গেছিলাম। দেশভ্রমণ করে একটুও আনন্দ পাওয়া যায় না!"

তাই শুনে বার্থা-পুতুল বলল, "ঠিক বলেছে; মুরগি-মার বুদ্ধি আছে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভ্রমণ করবার আমার একটুও ইচ্ছা নেই; একবার ওঠ রে, তার পর নাম রে! নাঃ, তার চেয়ে বরং কাঁকর-ঢিপিতে যাওয়া যাক, বাগানে বাঁধাকপি গাছের মধ্যে বেড়ানো যাক।"

শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হল।

শনিবার

যেই-না ঘুমপাড়ানি বুড়ো হিয়ালমারের চোখে ঘুম দিল, হিয়ালমার বলল, "এবার গল্প বলবে তো?" হিয়ালমারের মাথার উপর রঙ-চঙে ছাতা খুলে ধরে বুড়ো বলল, "আজ রাতে তার সময় হবে না। এই চীনেদের দিকে চেয়ে দেখ।" ছাতাটাতে চীনে থালার মতো নক্‌শা আঁকা, নীল নীল গাছ, ছুঁচল ইঁট, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদে-ক্ষুদে চীনে পুরুষ মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুণ্ডু নাড়ছে।

বুড়ো বলল, "কাল সকাল হবার আগে সমস্ত পৃথিবীটাকে গুছিয়ে ফেলতে হবে। কাল কিনা উৎসব করার দিন, রবিবার। একবার গির্জার চুড়োতে উঠতে হবে, দেখে আসতে হবে গির্জার ছোটো পরীরা ভালো করে ঘণ্টা মাজল কি না, নইলে মজা করে ঘণ্টা বাজবে কেন? তার পর মাঠে গিয়ে দেখতে হবে বাতাসরা ঘাসপাতার ধুলো ঝেড়েছে কি না। তার পর তারাগুলোকে নামিয়ে পালিশ করতে হবে। ওদের আমি কোঁচড়ের মধ্যে রাখি; অবিশ্যি তার আগে ওদের গায়ে একটা করে নম্বর লটকাতে হয়। আকাশের গায়ে যে গর্তে যে তারা বসানো থাকে, তাতেও ঐ একই নম্বর ঝোলাতে হয়। তা না হলে যদি ভুল জায়গায় রাখা হয়, তা হলে আবার এঁটে বসবে না, খালি খালি খসে যাবে!"

খাটের কাছে দেয়ালে যে ছবিটা ঝুলছিল, সে হঠাৎ বলল, "শোনো, শোনো, ঘুমপাড়ানি বুড়ো, আমি হলাম গিয়ে হিয়াল-মারের ঠাকুরদার বাবা। ছেলেটাকে তুমি গল্প বল বলে আমি খুবই বাধিত, কিন্তু তাই বলে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে দিও না যেন। আকাশ থেকে তারা পেড়ে পালিশ করা যায় না। তারারা আমাদের পৃথিবীটারই মতো।"

বুড়ো বলল, "অনেক ধন্যবাদ, বুড়ো ঠাকুরদার বাবা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি বুড়ো বটে, কিন্তু আমি তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি বুড়ো!"

রবিবার

ঘুমপাড়ানি বুড়ো এসে বলল, "নমস্কার!" হিয়ালমার অমনি মাথা নেড়ে লাফিয়ে উঠে, ঠাকুরদার বাবার ছবিটাকে ঘুরিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে দিল, যাতে গতকালকের মতো সে আবার ওদের কথার মধ্যে নাক গলাতে না পারে।

হিয়ালমার তখন বলল, "এবার তা হলে সেই যে একটা শুঁটির ভিতরে পাঁচটা কাঁচা মটরদানা ছিল, তাদের গল্পটা, মোরগ কেমন করে মুরগির সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছিল সেই গল্পটা আর সেই যে রিপুকর্ম করবার মোটা ছুঁচ, যার ফ্যাশান করার ভারি শখ হয়েছিল আর যে নিজেকে একটা সরু সূক্ষ্ম সুন্দর ছুঁচ মনে করত, এই-সব গল্প বল।"

বুড়ো বলল, "দেখ, বেশি বেশি ভালো জিনিস ভোগ করা কিছু ভালো নয়। তার চাইতে বরং তোমাকে একটা অন্য জিনিস দেখাই; আমার ভাইকেই দেখাই। সে কারও কাছে একবারের বেশি দুবার আসে না আর যার কাছেই যাক-না কেন, তাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে একটা গল্প বলে। আমার ভাই কিন্তু মোটে দুটি গল্প জানে। একটা গল্প এমনি অপূর্ব চমৎকার যে কেউ ভাবতেও পারে না আর অন্যটা এমনি বিকট বীভৎস যে মুখে আনা যায় না।"

বুড়ো তখন হিয়ালমারকে জানলার কাছে তুলে ধরে বলল, "ঐ দেখ আমার ভাই; সেও আরেকজন ঘুমপাড়ানি বুড়ো।

ওর আরেক নাম মৃত্যু। দেখতেই পাচ্ছ বইয়ে ওর ছবি আঁকে শুধু কতকগুলো হাড়গোড়, আসলে ও মোটেই সেরকম বিকট নয়। দেখ-না ওর পোশাকের ওপর কেমন রুপোলি কাজ করা, দেখ-না কেমন ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে আর কালো মখমলের চাদরটা ঘোড়ার পিঠের ওপর কেমন উড়ছে!"

হিয়ালমার দেখল অন্য ঘুমপাড়ানি বুড়োটা ঘোড়া হাঁকিয়ে চলেছে আর ছেলে বুড়ো কত লোককে ঘোড়ার উপর তুলে নিচ্ছে; কাউকে নিজের সামনে বসাচ্ছে, কাউকে পিছনে।

কিন্তু সবার আগে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করছে তাদের পাঁজির খাতায় কি লেখা আছে।

তার উত্তরে সবাই বলছে, "ভালো-ভালো কথাই লেখা আছে।" বুড়ো বলছে, "তা হতে পারে, তবু একবার দেখাও দিকি।" তখন কি আর করা, সবাইকে খাতা দেখাতে হচ্ছে। যাদের খাতায় লেখা 'খুব ভালো', তাদের বুড়োর সামনে বসিয়ে সেই অপূর্ব চমৎকার গল্পটা বলা হচ্ছে। যাদের খাতায় লেখা, 'মন্দ নয়' কিম্বা 'মন্দ', তাদের পিছনে বসিয়ে সেই বিকট গল্পটা শোনানো হচ্ছে। ভয়ে তারা কাঁপছে, হাঁউমাউ করে কাঁদছে, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়বার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না, কারণ ঘোড়ার পিঠে সবাইকে এমনি এঁটে বসানো হয়েছে, যেন শিকড় গজিয়েছে।

হিয়ালমার বলল, "বাঃ, মৃত্যু তো বড়ো সুন্দর ঘুমপাড়ানি বুড়ো, ওকে দেখে আমার একটুও ভয় করছে না।"

বুড়ো বলল, "ঠিক বলেছ, ভয়ের কোনো কারণই নেই। তবে দেখো, তোমার খাতায় যেন ভালো কথা লেখা থাকে।"

এই-সব হল ঘুমপাড়ানি বুড়োর গল্প; কে জানে, হয়তো আজ রাতেই তোমাদের কাছেও এসে সে আরো কত নতুন গল্প বলবে।

ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতোর কথা

গোড়ার ব্যাপার

কোপেনহাগেন শহরে নিউমার্কেটের কাছেই একটা বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাবেলায় কয়েকজন লোক জড়ো হয়েছিল। অতিথিদের অর্ধেক টেবিলে বসে তাস খেলছিল; বাকি অর্ধেককে বাড়ির গিন্নী গল্প করতে ডেকেছিলেন; তাঁর ডাকের কেমন সাড়া পাওয়া যায়, সকলেই তার অপেক্ষায় ছিল। ভদ্র-মহিলা বলেছিলেন "এসো, মন ভালো করার ব্যবস্থা করা যাক।"

অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মধ্যযুগ নিয়ে আলোচনা শুরু হল; উপস্থিত কেউ কেউ বললেন যে, আমাদের সময়ের চেয়ে তখনকার জীবন ঢের বেশি আনন্দের ছিল। মোড়ল ন্যাপ তো এমনি উৎসাহের সঙ্গে এই মতের পক্ষ নিলেন যে, বাড়ির গিন্নীও তৎক্ষণাৎ তাঁর দলে চলে এলেন। তার পর দুজনে মিলে 'সেকাল ও একাল' নামে প্রকাশিত ওয়ারস্টেডের প্রবন্ধের বিরুদ্ধে জোর গলায় আলোচনায় মেতে গেলেন, যেহেতু ঐ লেখক একালকে সমর্থন করেছেন! মোড়ল বললেন যে, রাজা হ্যান্সের রাজত্বকালটাই—অর্থাৎ পনেরো শতকের শেষের দিকটাই—সবচাইতে ভালো ও সুখের সময় ছিল।

এ তর্ক ছেড়ে দিয়ে, বাইরের যে ছোটো ঘরে অতিথিরা

কোট, লাঠি আর কাদায় হাঁটবার জন্য কাঠের জুতো ছেড়ে রেখেছিল, সেখানে যাওয়া যাক।

সে ঘরে দুজন মহিলা বসে ছিলেন, একজন অল্পবয়সী, একজন বুড়ি। হঠাৎ দেখলে হয়তো মনে হতে পারত যে নিমন্ত্রিত মহিলারা কেউ কেউ বুঝি সঙ্গে করে দাসী নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ভালো করে দেখলেই বোঝা যেত এঁদের চেহারায় একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে, এঁদের হাতের গড়ন আর গায়ের রঙ ভারি চিক্কণ, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে একটা গাম্ভীর্য আর অভিজাত ভাব দেখা যাচ্ছে—আসল কথা, ওঁরা দুজনেই পরী। কম বয়সী যিনি, তিনি অবশ্য স্বয়ং ভাগ্যদেবী না হলেও, ভাগ্যদেবীর শয়ন-মন্দিরের সখীদের মধ্যে একজনের খাস দাসী, কাজেই ছোটো-খাটো বর দেবার তাঁর ক্ষমতা ছিল! অন্যজনের মুখটা হাঁড়ি-পানা, তাঁর নাম ভাবনা। তিনি সর্বদা নিজের কাজকর্ম নিজের হাতে করে থাকেন, কারণ তা হলেই তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে কোথাও কোনো ভুলচুক হবে না।

সেদিন তাঁরা কে কোথায় গেছিলেন, তাই নিয়ে গল্প হচ্ছিল। ভাগ্যদেবীর খাস দাসী এতক্ষণ কয়েকটা অকিঞ্চিৎকর কাজের কথা বলছিলেন, কিন্তু সবার শেষে বলবার জন্য একটা ভারি অদ্ভুত কথা জমা করে রেখেছিলেন।

এবার তিনি বললেন, "তোমাকে বলে রাখি যে আজ আমার জন্মদিন; জন্মদিনের খাতিরে আমাকে একজোড়া কাঠের জুতোর ভার দেওয়া হয়েছে, এ জুতো মানুষদের দান করার অধিকারও আমি পেয়েছি। এ জুতোর এমনই ক্ষমতা যে যে-ই এগুলো পরবে, তখুনি সে যেখানে যেতে চায় সেইখানে গিয়ে হাজির হবে। শুধু তাই নয়, স্থান, কাল, কিম্বা অবস্থাও সে

যেমন চাইবে তেমনি হবে ; এইভাবে সেই সৌভাগ্যবান পরম সুখী হতে পারবে !”

ভাবনা বললেন, “আমার কথা শোনো, তার, বদলে সেই লোকটা বেজায় অসুখী হবে আর তোমার জুতো-জোড়া পা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।”

প্রথম মহিলা তখন বললেন, “বললেই হল কি না! যাই বল, এই আমি কাঠের জুতো-জোড়া দরজার পাশে রেখে গেলাম। একটু পরেই কেউ না কেউ এসে ও দুটো পায়ে দিয়ে পরম সুখী হয়ে যাবে।”

মোড়লের কি হল ?

বেশ রাত হয়ে গেছে। ন্যাপ মোড়ল তখনো রাজা হান্সের রাজত্বকাল নিয়ে মশগুল ; এবার তিনি বাড়ি ফিরবেন আর হবি তো হ, নিজের কাদায় হাঁটার জুতো-জোড়া না পরে, ভাগ্যদেবীর পাদুকা পায়ে দিয়ে, ঈস্ট স্ট্রিটে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে জুতো-জোড়ার জাদুর গুণে, তিনি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন, একেবারে সেই পনেরো শতকে গিয়ে পৌঁছেছেন। পা দুটি একগাদা ময়লা আর কাদার মধ্যে ডুবে গেল, কারণ সে সময়ে তো আর পথ-ঘাট পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল না।

মোড়ল বললেন, “ছ্যাঃ! এ জায়গাটা কি নোংরা! দেখেছ, ফুটপাথ উড়ে গেছে, আলোও জ্বলে নি !”

চাঁদ তখনো এতটা উঁচুতে ওঠে নি যে তার আলো পাওয়া যাবে ; তা ছাড়া বাতাসটাও কেমন য়েন ভারী, চারদিকের সব কুয়াশা দিয়ে মোড়া, সবই আবছায়া মনে হচ্ছে। রাস্তার মোড়ে যীশুর মায়ের একটা মূর্তি, তার সামনে একটিমাত্র আলো জ্বলছে। তবে সে আলো এতই ক্ষীণ যে ঠিক তার তলায়

পৌঁছবার আগে অবধি মোড়ল কিছু লক্ষ্যই করেন নি। এতক্ষণে রঙ-করা মূর্তিটার উপর তাঁর চোখ পড়ল।

মোড়ল বললেন, "এখানে বোধ হয় কোনো প্রদর্শনী হয়ে থাকবে। সাইনবোর্ডটা নামাতে ভুলে গেছে।" এমন সময় মধ্যযুগের পোশাক পরা দুটো লোক পাশ দিয়ে চলে গেল। মোড়ল বললেন, "কি অদ্ভুত দেখতে, ঐ লোক দুটো। বোধ হয় কোনো তামাশা থেকে ফিরছে।"

হঠাৎ তূরী ভেরীর শব্দ কানে এল, মশাল জ্বলে উঠল, একটা নতুনরকম শোভাযাত্রা পাশ দিয়ে চলে গেল। প্রথমে এল একদল ঢাকী, ওস্তাদ বাজিয়ে তারা; তার পর এল তীর-ধনুক নিয়ে জোতদারের দল। ভিড়ের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হলেন জাব্বা-জোব্বা পরা এক পাদ্রী। ভারি অবাক হয়ে মোড়ল জানতে চাইলেন কি ব্যাপার, লোকটাই-বা কে।

আশেপাশের লোকরা বলল, "উনি তো জী-ল্যাণ্ডের বড়ো পাদ্রী।"

মোড়ল মনে মনে বললেন, 'বড়ো পাদ্রীর কি মাথা খারাপ হল নাকি?' তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে মোড়ল মাথা নাড়লেন, 'নাঃ, বড়ো পাদ্রী হতেই পারে না।'

এই বিষয়ে ভাবতে ভাবতে মোড়ল ঈস্ট স্ট্রিট ধরে এগিয়ে ব্রিজ্ প্লেস পার হলেন, একবারও ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন না। প্যালেস স্কোয়ারে যাবার পুলটাকে কিন্তু কিছুতেই খুঁজে পেলেন না। পুল না পেয়ে, মোড়ল জলের ধারে এগিয়ে গেলেন, শেষে দেখেন একটা নৌকোর উপর দুজন লোক বসে আছে।

তারা জিজ্ঞাসা করল, "ওপারে নিয়ে যাব নাকি, হোম্-এ?" মোড়লের ধারণাই ছিল না যে তিনি তাঁর প্রিয় সুখে ভরা মধ্যযুগে ফিরে গেছেন, কাজেই তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন,

"হোম্-এ ? আরে আমি যে খৃশ্চানহেভেন্-এ যেতে চাই, সেখান থেকে যাব লিট্‌ল্ মার্কেট স্ট্রিটে।"

লোক দুটো কোনো উত্তর না দিয়ে, ওঁর দিকে চেয়ে রইল। মোড়ল বললেন, "শুধু এইটুকু কর, বাবা, পুলটা কোন দিকে বলে দাও। আলোটালো জ্বালে নি, কি অন্যায় বল দিকিনি! তার উপর এমনি নোংরা, যেন জলার উপর দিয়ে হাঁটছি!"

কিন্তু লোক দুটির সঙ্গে যতই কথা বলেন, ততই ওদের কথার মাথা-মুণ্ডু বুঝতে পারেন না! শেষটা মোড়ল বলে উঠলেন, "কোন পাড়ার কথা বলছ হে তোমরা, কিছুই যে বুঝতে পারলাম না!" এই বলে বেজায় বিরক্ত হয়ে তাদের দিকে পিঠ ফেরালেন। পুলটাকে তো পাওয়া গেলই না, এমন-কি, রেলিংগুলোও ছিল না।

মনে মনে মোড়ল বললেন, 'এখানে যেভাবে ব্যাপার গড়াতে দেওয়া হয়েছে, সে ভারি নিন্দার কথা! একটা ঠিকা গাড়ি ডাকা যাক।' আজ সন্ধ্যার মতো এত-সব বিশ্রী ব্যাপার এর আগে কখনো তাঁর চোখে পড়ে নি।

গাড়ি ডাকবেন তো ঠিক করলেন, কিন্তু গাড়িগুলো সব গেল কোথায় ? একটাও চোখে পড়ল না। 'নাঃ, নিউমার্কেটেই ফিরে যেতে হবে দেখছি। সেখানে সব সময় গাড়ি পাওয়া যায়, গাড়ি না হলে আজ আর আমাকে খৃশ্চানহেভেন্-এ পৌঁছতে হচ্ছে না!'

কাজেই ঈস্ট স্ট্রিট ধরেই মোড়ল আবার ফিরলেন, প্রায় রাস্তাটার শেষ অবধি পৌঁছে গেছেন, এমন সময় মেঘ সরে গিয়ে, চাঁদ দেখা দিল। সেকালে ঈস্ট স্ট্রিটের মাথায় বড়ো ফটক ছিল, তাই দেখে মোড়ল বলে উঠলেন, "ওখানে আবার কিসের ভারা বেঁধেছে ?" তারই মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে, তার ভিতর দিয়ে

গলে ভাবলেন এবার বুঝি নিউমার্কেটে এসে পড়বেন; কিন্তু ও মা! সামনে দেখেন মস্ত সবুজ মাঠ! এখানে ওখানে কয়েকটা ঝোপ-ঝাপ, আর মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চওড়া একটি খাল কিম্বা নদী, বোঝা যাচ্ছে না কি। খালের অন্য পারে কয়েকটা ভাঙাচোরা কাঠের কুঁড়ে, সেখানে ওলন্দাজ নাবিকরা থাকে, তাই ও জায়গাটার নামই হয়ে গেছিল ওলন্দাজের মাঠ। ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে মোড়ল বললেন, "এ কি আমি মরীচিকা দেখছি, নাকি আমার বুদ্ধিভ্রম হয়েছে? ব্যাপারটা কি! বলি, ব্যাপারটা কি?"

মোড়লের ধারণা হল তাঁর নিশ্চয় অসুখ করেছে, এই ভেবে তিনি আবার ফিরলেন। ঈস্ট স্ট্রিটে আবার ফিরে এসে নজর করে বাড়িগুলোকে দেখতে লাগলেন। এবার তাঁর খেয়াল হল যে বেশির ভাগ বাড়িই কাঠের তৈরি, অনেকগুলোর উপরে খড়ের চাল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মোড়ল বললেন, "নাঃ, আমার নিশ্চয় কোনো কড়া ব্যামো হয়েছে। খাওয়ার মধ্যে তো ঐ এক গ্লাস মদ খেয়েছিলাম, তাই কি বড্ডো বেশি হয়ে গেল নাকি? মদের সঙ্গে কখনো গরম সামন মাছ দিতে হয়—ওদের কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই! ও বাড়ির গিন্নীকে নিজে গিয়ে এ কথা বলে আসব। মনে হচ্ছে এক্ষুণি ফিরে গিয়ে জানিয়ে আসি আমার শরীরটা কী খারাপ লাগছে। কিন্তু তাই কি হয়, সবাই হাসবে যে। তা ছাড়া সেখানে সবাই যে শুয়ে পড়ে নি, তাই-বা কে বলল!"

যাই হোক, বাড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। মোড়ল মনে মনে ভাবলেন, 'কি ভীষণ ব্যাপার! ঈস্ট স্ট্রিটটাকে পর্যন্ত চিনতে পারছি না! একটা দোকান অবধি দেখতে পাচ্ছি না;

কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, খালি কতকগুলো পুরনো, বিশ্রী, ভাঙা-চোরা বাড়ি! হায়, হায়, আমাকে কড়া রোগেই ধরেছে, নিজেকে আর ভুল বুঝিয়ে কি হবে? কিন্তু প্রতিনিধিমশায়ের বাড়িটা গেল কোন চুলোয়? এ বাড়িটা নয়, নিশ্চয়? সে যাই হোক, এখানে দেখছি কয়েকজন লোক এখনো জেগে আছে। বাস্তবিক, শরীরটা বড়োই খারাপ হয়েছে!'

যে বাড়ির ভিতর থেকে আলো আসছিল, তার আধ-খোলা দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। একটি সরাইখানা, কিম্বা মদের দোকান। ঘরটা অনেকটা হল্‌স্টাইনের সেই-সব সেকেলে মাটির মেঝে দেওয়া বড়ো-বড়ো ঘরের মতো। ঘরে কয়েকজন লোক গল্পে মত্ত ছিল, জাহাজের নাবিক, কোপেনহাগেনের নাগরিক, কয়েকজন ছাত্র; আগন্তুকের দিকে কেউ ফিরেও তাকাল না।

সরাইখানার মালিকানী এগিয়ে আসতেই, মোড়ল বললেন, "মাপ করবেন, হঠাৎ বড়ো অসুস্থ হয়ে পড়েছি, দয়া করে একটা ঠিকা গাড়ি ডাকিয়ে দেবেন, আমাকে খৃশ্চানহেভেন্‌-এ পৌঁছে দেবে?"

ভদ্রমহিলা খানিক হাঁ করে তাকিয়ে দেখে, শেষে মাথা নাড়ল। তার পর জর্মান ভাষায় কথা বলল; তখন মোড়ল ভাবলেন মহিলা হয়তো ডেনিশ ভাষা জানে না, কাজেই তিনি কথাটাকে আবার জর্মান ভাষায় বললেন। তাই শুনে আর তাঁর পোশাক দেখে, মালিকানী ভাবল লোকটি নিশ্চয়ই বিদেশী। অবিশ্যি একটা জিনিস সে তখুনি বুঝেছিল, লোকটির শরীর অসুস্থ। তাই সে এক কুঁজো জল নিয়ে এল; জলটা একটু নোনতা লাগল, যেন এইমাত্র কুয়ো থেকে তোলা হয়েছে। এবার মোড়ল মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন; তার পর একটা

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চারদিকের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার বিষয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করে বকতে লাগলেন।

মালিকানীকে একটা বড়ো কাগজ সরাতে দেখে মোড়ল বললেন, "ওটা কি আজ বিকেলের খবর নাকি?" মহিলা ওর কথার মানে বুঝল না, তবে কাগজটা ওর হাতে দিয়ে দিল। কাগজে কাঠের ব্লকে ছাপা একটি মোটা ধরনের ছবি রয়েছে; কলোন নগর থেকে কিছুদিন আগে দেখা একটি ধূমকেতুর ছবি। এরকম একটি দুর্লভ প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন দেখে মোড়ল ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, "এটা তো খুব পুরনো জিনিস, এরকম একটা দুর্লভ ছবি আপনি কোথায় পেলেন? বিষয়-বস্তুটা একেবারে আজগুবি হলেও, জিনিসটা কিন্তু ভারি কৌতূহলের বিষয়। আজকাল সবাই জানে যে এ ধূমকেতুগুলো আসলে মেরু-জ্যোতির ছায়া, সম্ভবত আকাশে বিজলীর জন্য ওরকম দেখায়।"

আশে পাশে যারা বসেছিল, তারা সবাই মোড়লের কথা শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। একজন তো শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মাথার টুপি খুলে আশ্চর্য-রকম গম্ভীর মুখে বলল, "মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই একজন বড়ো পণ্ডিত।" মোড়ল বললেন, "আরে, না, না, তবে যে-সব বিষয় সবাই বোঝে, তার সম্বন্ধে কথা উঠলে, আলোচনায় যোগ দিতে পারি, এ ছাড়া কিছু নয়।"

লোকটি বলল, "বিনয় বড়ো ভালো গুণ; তা যদি না হত, হয়তো অন্য কথা বলতাম; যাই হোক, এখনকার মতো মন্তব্য মুলতুবি রাখলাম।"

মোড়ল তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "কার সঙ্গে কথা বলছি, জানতে পারি কি?"

লোকটি বলল, "আমি হলাম ধর্মশাস্ত্রে স্নাতক।" এই উত্তর শুনেই মোড়ল খুশি, লোকটার কাপড়-চোপড়ের সঙ্গে নামটি মানিয়েছে ভালো। ভাবলেন, 'লোকটা বোধ হয় কোনো পাড়াগাঁর স্কুলের সেকেলে মাস্টারমশাই। সাধারণ লোকের মতো এ নয়, এরকম মানুষ মাঝে মাঝে জাটল্যাণ্ডে দেখা যায়।'

অচেনা লোকটি বলে যেতে লাগল, "ইনি অবিশ্যি এখানকার লোক নন, তবুও মশাই, আমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করতে ঘৃণা বোধ করবেন না। আপনি নিশ্চয়ই প্রাচীন পণ্ডিতদের রচনা খুব ভালোভাবেই জানেন ?"

মোড়ল বললেন, "তা অবশ্যই জানি। যে-সমস্ত পুরনো বই পড়লে কিছু লাভ হয়, সে সবই পড়তে ভালোবাসি। তাই যদি বলতে হয়, আজকালকার বইও আমার বেশ লাগে, শুধু ঐ প্রাত্যহিক জীবনের গল্পগুলো বাদে। আমার মতে বাস্তব জীবনেই ও-সব যথেষ্ট দেখা যায়।"

স্নাতক বলল, "প্রাত্যহিক জীবনের গল্প ?"

"হ্যাঁ, গো, হ্যাঁ, ঐ যে সব উপন্যাস বলে নতুন বই বেরিয়েছে না, যা নিয়ে লোকে আজকাল এত কথা বলে।"

লোকটি তখন একটু হেসে বলল, "ও, এই কথা ! তা ও-সব গল্পে অনেক রস পাওয়া যায় ; রাজসভায়ও ঐ-সব বই পড়া হয়। রাজা নিজে তো স্যার ই-ওয়েন, স্যার গা-ওয়েনের রোমাঞ্চময় কাহিনী বিশেষভাবে পছন্দ করেন। জানেন নিশ্চয়, ঐ বইতে রাজা আর্থার আর তাঁর গোল-টেবিলের বীরদের কথা আছে ; একবার রাজা তাঁর পারিষদবর্গের সঙ্গে ঐ গল্প নিয়ে খুব রসিকতাও করেছিলেন।"

মোড়ল বললেন, "কী আশ্চর্য যে আমি ও-বই পড়ি নি ! তা হলে হয়তো ওটা হাইবার্গের নতুন বই হবেও-বা।" লোকটি

বলল, "না, না, হাইবার্গের নয়, গডফ্রে ফন গেমেনের বই ওটা।"

মোড়ল বললেন, "ওঁর লেখা নাকি? ও তো খুব পুরনো নাম। ডেনমার্কে উনিই-না প্রথম বই ছেপেছিলেন?"

অচেনা লোকটি বলল, "হ্যাঁ, উনিই আমাদের দেশের প্রথম মুদ্রাকর।" এত দূর অবধি ভালোই কেটেছিল। এবার ভদ্র-মহোদয়দের মধ্যে একজন কয়েক বছর আগেকার ভয়াবহ মহামারীর কথা তুললেন, অর্থাৎ ১৪৮৪ সালের প্লেগের কথা। মোড়ল মনে করলেন ওঁরা বুঝি কলেরার কথা বলছেন, কাজেই ও প্রসঙ্গটাও বেশ উতরে গেল। জলদস্যুদের যুদ্ধের ব্যাপার হালের ঘটনা, অর্থাৎ ১৪৯০ সালের কথা, তার বিষয়ও কথা হল। ওঁরা বললেন ইংরেজ জলদস্যুরা একেবারে ডেনমার্কের উপকূল থেকে জাহাজ ধরে নিয়ে গেছে। মোড়ল নিজের চোখে ১৮০১ সালের ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ দেখেছেন, কাজেই তিনিও ওঁদের সঙ্গে মিলে চুটিয়ে ইংরেজদের নিন্দা করতে লাগলেন।

তার পর কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না, বরং পদে পদে বেখাপ্পা শোনাতে লাগল। স্নাতক লোকটি ভালো হলেও, এমনি আকাট মুখ্যু যে মোড়লের সহজ সরল আটপৌরে কথা-গুলোও তার কাছে যেন বড়ো বেশি জোর গলায় বলা আর উদ্ভট বলে ঠেকছিল। তারা পরস্পরের দিকে বেশ রাগতভাবে তাকাতে লাগল। শেষটা স্নাতক ল্যাটিন ভাষায় কথা বলতে লাগল, ভাবল তাতে যদি মোড়ল তার বক্তব্য বোঝেন, কিন্তু সে গুড়ে বালি!

শেষটা মালিকানী মোড়লের জামার হাতা ধরে টেনে বলল, "এখন কেমন বোধ করছেন?" তর্কের উত্তেজনায় মোড়ল আগেকার সব কথা ভুলেই গেছিলেন, এবার সব মনে পড়ল। পড়তেই, আবার মাথা ঘুরতে লাগল।

মোড়ল বললেন, "একি, আমি কোথায়?"

অতিথিদের মধ্যে একজন বললেন, "তা হলে আমরা ক্ল্যারেট, মীড্ আর ব্রেমেন বীয়র খাই। আপনাকেও মশায়, আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।"

মোড়ল বললেন, "এ-সব কি? আরে, এ আবার কি?" কিন্তু তা বললে চলবে কেন, ওঁদের সঙ্গে মদ খেতেই হল। ওঁরা কোনো অজুহাতই শুনলেন না; মোড়লের মন হতাশায় ভরে উঠল তার পর যখন ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন বললেন যে মোড়লের নিশ্চয় নেশা হয়েছে, মোড়ল তাঁর কথা তখুনি মেনে নিলেন। তিনি ওঁদের কাছে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন যেন কেউ একটি গাড়ি ডেকে দেন; তখন ওঁরা ভাবলেন লোকটা নিশ্চয় মস্কোর ভাষা বলছে। এমন মুখ্যুর সঙ্গে আগে কখনো মিশেছেন বলে মনে হল না। মনে মনে বললেন, 'দেশটা কি আবার অসভ্য হয়ে গেল নাকি? এই একটা ঘণ্টার মতো বিশ্রীভাবে জীবনে কখনো সময় কাটাই নি।'

একবার মনে হল মাথা নিচু করে, টেবিলের তলা দিয়ে গলে ঘর থেকে পালানো যাক। সেই চেষ্টাও করলেন, কিন্তু দোর-গোড়ায় পৌঁছবার আগেই, ওঁর মতলব বুঝে ওঁরা ঠ্যাং চেপে ধরলেন। ভাগ্যিস সেই সময় পা থেকে কাঠের জুতো-জোড়া খুলে পড়ে গেল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাদুমন্ত্রের দৃশ্যপট বাতাসে মিলিয়ে গেল। মোড়ল দেখলেন তাঁর সামনে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, আলোর পিছনে একটা মস্ত বাড়ি। এ-সমস্তই তাঁর খুব চেনা। আমাদের কালের ঈস্ট স্ট্রিটে তিনি ফিরে এসেছেন। ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে তিনি একটা দরজার উপর ঠ্যাং ছুঁড়ছেন, ঠিক উলটো দিকে একটা পাহারাওয়ালা বসে বসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে!

মোড়ল বললেন, "এ কি ভাবা যায় যে এতক্ষণ ধরে আমি

রাস্তায় শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম! হুঁ, এটা যে ঈস্ট স্ট্রিট, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কেমন ফুর্তির জায়গা, কী চমৎকার দেখতে আর কত আলো! এক গেলাস মদ খেতে না খেতে আমার অমন অবস্থা হল! কী সাংঘাতিক ব্যাপার!"

দু মিনিটের মধ্যে আরাম করে একটা ঠিকা গাড়ি চেপে, দেখতে দেখতে, মোড়ল খৃশচানহেভেন্ পৌঁছে গেলেন। নিজের নানান বিপর্যয়ের কথা তাঁর ভালো করেই মনে ছিল, তাই তিনি ভাবছিলেন যে আমাদের এই বর্তমান কালটার হাজার দোষ থাকতে পারে, তবু যে-সময়টাকে একটু আগে পরখ করে দেখেছিলেন, তার চাইতে ঢের ঢের বেশি সুখের।

পাহারাওয়ালার অভিযান

পাহারাওয়ালা বলল, "আরে এইতো দিব্যি একজোড়া কাঠের জুতো পাওয়া গেল! দোতলায় যে ছোটো-কাপ্তান থাকেন, এগুলো নিশ্চয় তাঁর, দরজার ঠিক পাশেই পড়ে রয়েছে।"

লোকটি ছিল ভারি সৎ, তখুনি হয়তো দরজার ঘণ্টা বাজিয়ে জুতো-জোড়াকে তাদের সম্ভাব্য মালিকের হাতেই দিয়ে দিত, কারণ ছোটো-কাপ্তানের ঘরে তখনো আলো জ্বলছিল, কিন্তু পাহারাওয়ালার ভয় হল ডাকাডাকিতে যদি বাড়ির অন্য লোকদের ঘুম ভেঙে যায়!

সে মনে মনে বলতে লাগল, 'এরকম জিনিস পায়ে দিলে নিশ্চয় সমস্ত গা গরম হয়ে ওঠে, ভারি আরাম লাগে। আর

জুতোর ওপর দিকটি কী সুন্দর নরম চামড়া দিয়ে তৈরি।' এই। ভেবে সে আস্তে আস্তে জুতোর মধ্যে নিজের পা-দুটি গলিয়ে দিল। 'এই দুনিয়ার কি আজব কাণ্ড-কারখানা! আচ্ছা ইচ্ছে করলেই তো ছোটো-কাপ্তান তাঁর গরম বিছানাটির ভিতর ঢুকে পড়তে পারেন, তা না করে, ঐ ঘরময় কেবলই পাইচারি করে বেড়াচ্ছেন! অথচ লোকটা কী সুখী; মা নেই, ছেলেপুলে নেই, যে পুষতে হবে! রোজ রোজ নেমন্তন্ন বাড়ি যায়! আহা, আমি যদি ঐ কাপ্তান হতাম, কী সুখীই-না হতাম!'

বলতে না বলতে তাই হল। কাঠের জুতোর ফল হবেই—পাহারাওয়ালার আত্মাটি গিয়ে ছোটো-কাপ্তানের শরীরের মধ্যে ঢুকল! অমনি দেখে সে ছোটো-কাপ্তানের ঘরে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ছোট্টো একটা গোলাপি রঙের চিঠির কাগজ, তাতে আবার একটা কবিতা লেখা, ছোটো-কাপ্তান ভারি গুণী, ঐ কবিতাটি তার নিজের রচনা। এখানে ছোটো-কাপ্তানের কবিতাটি তুলে দেওয়া হল—

যদি হতাম বড়োলোক

'যদি হতাম বড়োলোক!' মুখে বুলি ছোটোবেলায়,
ভাবনা-চিন্তা ছিল না মোর, মাতি দলের সাথে খেলায়।
'যদি হতাম বড়োলোক,' হাতে নিতাম তলোয়ার,
হতাম কাপ্তান, টুপিতে পালকের কি বাহার!
সময় গেল কেটে, একটি ইচ্ছা পূর্ণ হল তার;
হলাম কাপ্তান, ট্যাঁক তবু খালি রয় ভগবান,
তুমি সবই জানো, প্রভু, সদাই কর মোরে ত্রাণ।

একদা ছিনু বসি, যৌবনের খুশিতে মন ভরি,
ছোটো মেয়ে এক আসি বসিল মোরে জড়ায়ে ধরি।
পরীদের গল্প শুনতে চায়, অনেক ছিল জানা,
বাকি সব দিক দিয়ে মোর অসীম গরিবিয়ানা,
সুন্দরী ছোটো মেয়ে গল্প শুনে আহ্লাদে আটখানা,
বলে নাকি কোনোকালে ছাড়িয়া যাবে না আমারে,
সবই জানো ভগবান, তুমি রক্ষা করো তারে।

'যদি হতাম বড়োলোক !' যাচি দেবতার পায় ;
ঐ মেয়ে বড়ো হয়ে আজ রূপসী তরুণী, হায়,
কোমলা লাবণ্যময়ী লক্ষ্মী দয়াবতী বালা
যদি সে জানিত কভু মোর গভীর গোপন জ্বালা,
আর কি দেখিত মোরে, চোখেতে প্রসন্ন আলা !
না, গরিব আমি, চিরদিন মুখ বন্ধ আমার !
তাই তুমি চাও, প্রভু, অভ্রান্ত তোমার বিচার।

ধৈর্যে যদি হতাম ধনী, প্রেমে যথা, ভগবান
হয় তো তুমি মিটাতে মোর আশা অভিমান ;
তুমি প্রিয়ে, সেদিন বুঝি ভালোবাসিতে আমারে,
অক্ষম ভাষায় মোর তরুণ-মনের ব্যথা বলি কারে !
না, না, এখনো সে গোপন কথা শুনাব না তারে।
গরিব আমি, ভবিষ্যৎ ঢাকা মোর গাঢ় অন্ধকারে ;
আশীর্বাদ কর তারে প্রভু, রেখো সদা বান্ধব মাঝারে।

নিজের দুঃখে ছোটো-কাপ্তান নিজেই আকুল ; জানলার খিলানে মাথা রেখে সে একটা বুক-ভাঙা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, "রাস্তার ঐ গরিব পাহারাওয়ালাও আমার চাইতে সুখী।

আমি যাকে অভাব বলি ও তাকে জানে না ; ওর নিজের বাড়ি আছে, বৌ আছে, ছেলেপুলে আছে, তারা ওর দুঃখে কাঁদে ওর সুখে আনন্দ করে। আহা, ওর সঙ্গে যদি আমি জায়গা বদল করতে পারতাম কত বেশি সুখী হতাম, তা হলে আমি জীবন পথে ঘুরে বেড়াতে পারতাম, ওর মনে যে-সব আশা আছে তার বেশি কিছু চাইতামও না। বাস্তবিকই ও আমার চাইতে অনেক বেশি সুখী !”

সেই মুহূর্তেই পাহারাওয়ালা আবার পাহারাওয়ালা হয়ে গেল। ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতোর জন্য ওর আত্মাটা ছোটো-কাপ্তানের শরীরের মধ্যে চলে গেছিল, কিন্তু দেখাই তো গেল তাতে ওর মনের সুখ আরো কমেছিল আর কয়েক মিনিট আগে যে জীবনের উপর ওর ঘেন্না ধরে গেছিল, এখন আবার সেটাকেই বেশি ভালো বলে মনে হল ! কাজেই পাহারাওয়ালা আবার পাহারাওয়ালা হয়ে গেল।

সে তখন মনে মনে বলল, ‘কি বোকার মতো স্বপ্ন রে বাবা ! তবে মজারও বটে ! আমার মনে হচ্ছিল আমি বুঝি দোতলার ঐ ছোটো-কাপ্তান হয়ে গেছি, তবু এতটুকু সোয়াস্তি পাচ্ছিলাম না ! মার জন্য, ছেলেপুলেগুলোর জন্য মন কেমন করছিল, তারা তো সর্বদা আমাকে চুমো খেয়ে দম বের করে দেবার জন্য তৈরি !’

চুপ করে বসে বসে পাহারাওয়ালা স্বপ্নের কথাই ভাবতে লাগল, কিছুতেই যেন ব্যাপারটাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিল না। ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতো তখনো তার পায়ে পরা। আকাশে হঠাৎ একটা তারা খসল।

পাহারাওয়ালা মনে মনে বলল, ‘ঐ গেল একটা ! ঐ ওখানে কত তারা ! বড়ো ইচ্ছা করে ঝক্‌ঝকে তারাগুলোকে

আরেকটু কাছের থেকে দেখি, বিশেষ করে চাঁদটাকে দেখতে ইচ্ছা করে। আহা, যদি ছোট্টো একটা লাফ দিয়ে চাঁদে পৌঁছে যেতে পারতাম, এই সিঁড়ির ওপর শরীরটাকে ফেলে যেতে একটুও আপত্তি হত না।'

এমন কতকগুলো চিন্তা আছে, ইচ্ছা আছে, যেগুলো টপ্ করে বলে ফেলতে হয় না, বিশেষ করে যার পায়ে ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতো, তার তো আরো বেশি করেই সাবধান হওয়া উচিত। শোনো এবার ঐ পাহারাওয়ালার কি হল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুশো চল্লিশ হাজার মাইল পার হয়ে, পাহারাওয়ালা চাঁদে পৌঁছে গেল। কে না জানে সেখানকার সব কিছু এখানের চাইতে চিক্কণ জিনিস দিয়ে তৈরি, আর সে কী হাল্কা, যেন তুলোর মতো নতুন বরফ পড়েছে! পাহারাওয়ালা দেখল সে একটা পাহাড়ের উপর বসে আছে, ডক্টর মাড্লারের চাঁদের মানচিত্রে ঐরকম অনেকগুলো পাহাড় আঁকা আছে, এটা তারই একটা। পাহাড়ের মাঝখানটা ফাঁপা, যেন আট মাইল গভীর একটা কড়াই! পাহাড়ের পায়ের কাছে একটা শহর; এক গেলাস জলে একটি ডিমের সাদা মিশিয়ে দিলে যেমন দেখতে লাগে ঐ শহরটি অনেকটা তাই; যে জিনিস দিয়ে তৈরি সে-ও ঐরকম নরম। কত মিনার, গম্বুজ; ঝোলানো বারান্দা, দেখতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ; পাতলা পরিষ্কার হাওয়ায় সব যেন এদিকে ওদিকে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাথার উপরে প্রকাণ্ড একটা গাঢ় লাল গোলার মতো আমাদের পৃথিবীটাকে দেখা যাচ্ছে।

পাহারাওয়ালা চারদিকে কতকগুলো জীবকে দেখতে পেল; আমরা মানুষ বলতে যা বুঝি, ওরাও হয় তো তাই, কিন্তু দেখতে একেবারে অন্যরকম। দেখে.মনে হল ওরা একেবারে অন্য এক

জাতের প্রাণী ; ওদের চেহারার একটি বর্ণনা দেয়, পৃথিবীর কোনো জ্যোতিষীর সেরকম কল্পনাশক্তিও নেই। ওদের নিজেদের একটি ভাষাও আছে—তবে একজন পাহারাওয়ালার আত্মা সে ভাষা বুঝবে এমন আশা করাও যায় না—সে যাই হোক-না, বুঝতে কিন্তু পারল সে, কারণ আমরা যতটা ভাবি আসলে আমাদের আত্মার তার চাইতে অনেক বেশি ক্ষমতা।

কাজেই চাঁদের মানুষদের ভাষা পাহারাওয়ালার আত্মা ভালো করেই বুঝতে পারল। তারা আমাদের পৃথিবীটাকে নিয়ে তর্কাতর্কি করছিল, পৃথিবীতে কেউ থাকে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছিল। ওদের ধারণা যে পৃথিবীর ঘন বাতাসে কোনো চন্দ্রবাসী নিশ্বাসই ফেলতে পারবে না। ওদের বেশির ভাগের মতে চাঁদে ছাড়া অন্য কোনো গ্রহ-তারায় কোনো জীবন্ত প্রাণীর বাস নেই। সে যাক গে, কে কি বলে না বলে তা শুনে কাজ নেই, বরং একবার ঈস্ট স্ট্রিটে ফিরে গিয়ে পাহারাওয়ালার শরীরটার কি হল, তাই দেখা যাক।

সিঁড়ির উপরে প্রাণহীন দেহটা পড়ে ছিল ; তার হাত থেকে তার লোহার কাঁটা দেওয়া মুগুরটা খসে পড়েছিল, মুগুরটার নাম ছিল শুকতারা! দেহটার চোখ দুটো মাথার উপরে চাঁদের দিকে তাকিয়ে ছিল। পাহারাওয়ালা মরে গেছে! এই দুর্ঘটনার কথা শুনে বন্ধুবান্ধবের চক্ষু স্থির! মুখে মুখে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল, কতলোকে কত কি না বলল! ভোরবেলা শরীরটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, সেখানে পৌঁছতেই বলা বাহুল্য যে পাহারাওয়ালার পা থেকে কাঠের জুতো-জোড়া খুলে নেওয়া হল। এবার তা হলে তার আত্মাটাকেও ফিরতে হয় ; আত্মাটা সোজা উড়ে এসে শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মরা শরীরটাতে প্রাণের সাড়া পাওয়া

গেল। জেগে উঠে পাহারাওয়ালা বলল জীবনে কখনো সে এমন ভয়াবহ রাত কাটায় নি; তাকে দুটো সোনার মোহর দিলেও এমন রাত কাটাতে সে রাজি নয়। যাই হোক, সে-সব এখন চুকে গেছে।

সেইদিনই পাহারাওয়ালা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, কিন্তু কাঠের জুতো-জোড়া সেখানেই পড়ে রইল।

সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত—সন্ধ্যায় নাটকীয় আবৃত্তি—অত্যাশ্চর্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হাসপাতাল আর রাস্তার মাঝখানে বেশ উঁচু একটা বেড়া। ঐ বেড়ার লোহার খুঁটিগুলো এতটা দূরে দূরে লাগানো যে—অন্তত লোকে তাই বলে—খুব রোগা রোগা ডাক্তারি ছাত্ররা কেউ কেউ ওর ফাঁক দিয়ে চেপেচুপে গলে বেরিয়ে, প্রায়ই শহরে গিয়ে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে সময় কাটাত। এখন ঐ ফাঁকটুকু দিয়ে মাথাটা গলানোই ছিল সবচাইতে শক্ত; কাজেই এ অবস্থায়—আর শুধু এই অবস্থায় কেন, অনেক অবস্থাতেই—মাথা যত ছোটো হয় ততই ভালো! ভূমিকার পক্ষে এই যথেষ্ট।

এক ছোকরার সেদিন রাত জাগার পালা; মাপের দিক থেকে তার মাথাটি বেশ মোটাই ছিল। বাইরে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়ছে, তবু দুটো দুটো বাধা সত্ত্বেও—অর্থাৎ আবহাওয়ার এবং মোটা মাথার বাধা—পনেরো মিনিটের জন্য তার একবার বাইরে না গেলেই নয়। এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে দরোয়ানকে আবার বিরক্ত করা কেন, যখন একটু চেষ্টা করলেই লোহার বেড়ার

ফাঁক দিয়ে গলে বেরুনো যায়; এইরকম ভাবতে ভাবতে ছোকরা ঐ যে কাঠের জুতো পাহারাওয়ালা ফেলে গেছিল, তাতে হোঁচট খেল। তার একবারও খেয়াল হল না যে ওগুলো ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতো, শুধু এ কথাই মনে হল যে এই বাদলা রাতে জুতো-জোড়া খুবই কাজ দেবে; এই ভেবে সে জুতো-জোড়া পায়ে দিল। এখন তার একমাত্র সমস্যা হল বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারবে কি না; এর আগে সে কখনো চেষ্টা করে দেখে নি।

ছাত্র মনে মনে বলল, 'মুণ্ডুটাকে যদি গলিয়ে দিতে পারতাম!' যেমনি বলা অমনি তাই! অতবড়ো মোটা মাথাটা ফস্ করে বেড়ার ফাঁক দিয়ে গলে গেল—কাঠের জুতোর এমনই গুণ! কিন্তু শরীরটাকেও তো টেনে বের করতে হবে!

ছোকরা বলল, "উরে বাবা! আমি দেখছি বেজায় মোটা, ভেবেছিলাম শুধু মুণ্ডুটা নিয়েই মুস্কিল হবে; দেখছি এখান দিয়ে বেরুনো যাবে না!"

তখন সে মাথাটাকে টেনে আবার ভিতরে আনতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে একেবারে অসম্ভব। গলাটাকে ইচ্ছামতো এগুনো পেছুনো গেল, কিন্তু ঐ পর্যন্তই! প্রথমটা বেজায় রাগ ধরল, তার পরেই মনটা একেবারে দমে গেল। ভাগ্য-দেবীর কাঠের জুতোর জন্যই তার এই বিষম দুরবস্থা, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার একবারও মনে হল না যে, ইচ্ছা করলেই সে ছাড়া পেতে পারে। তা না করে, কেবলই টানাটানি করতে লাগল, ফলে ওখান থেকে নড়বার জো রইল না। এদিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, পথে জনমানুষ নেই। ফটকের ঘণ্টা অবধি হাত পৌঁছয় না। এখন ছাড়া পায় কি করে? সম্ভবত ঐভাবেই সকাল পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে; তার পর একজন কামার ডেকে লোহার খুঁটি চাঁচতে হবে; এ-সব কিছু অল্প

সময়ের মধ্যেও হবে না; তার মধ্যে রাস্তার উলটো দিকের বড়ো স্কুলটার ছেলেগুলোর ছুটি হয়ে যাবে; তার পর ঐ নাইবোডার পাড়ার সমস্ত বাসিন্দারা সবাই মজা দেখবার জন্য ছুটে আসবে। কি ছুটোছুটি হাসাহাসির না ধুম পড়ে যাবে! ভেবেই ছোকরা বলে উঠল, "উঃ! আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে! আমি পাগল হয়ে যাব! অর্ধেক ক্ষ্যাপা তো হয়েই আছি! ওঃ, একবার যদি ছাড়া পেতাম!"

ঠিক এই কথাটাই ওর অনেক আগেই বলা উচিত ছিল। এখন বলতে না বলতে ইচ্ছাটা ফলে গেল; মাথাটা গলে বেরিয়ে এল। অমনি এক দৌড়ে আবার সে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল; বাপ্‌ রে, ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতো পায়ে দিয়ে কি ফ্যাসাদেই না পড়ে ছিল, ভয়ের চোটে পাগল হবার জোগাড় হয়ে ছিল! কিন্তু এইখানেই ওর অদ্ভুত অভিজ্ঞতার শেষ হল, এ কথা ভাবলে ভুল হবে; সবচাইতে খারাপটুকুই তখনো বাকি ছিল।

সে রাতটা তো একরকম শান্তিতেই কাটল, তার পরের দিনটাও তাই। এদিকে কাঠের জুতো-জোড়াকে কিন্তু কেউ সেখান থেকে সরায় নি। সন্ধেবেলায় কানিকে স্ট্রিটের ছোট্টো নাটঘরে নাটক আবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ঘর ঠাসা লোক; অন্যান্য কবিতার মধ্যে, এইচ. সি. অ্যাণ্ডারসনের লেখা একটা নতুন কবিতাও ছিল, তার নাম হল 'মাসিমার চশমা'। কবিতাটার সারমর্ম হল এই—সেকালে হলে কবির মাসিকে নির্ঘাৎ ডাইনীবুড়ি বলে আগুনে পুড়িয়ে সম্মানিত করা হত, কারণ তিনি বেজায় ভালো ভাগ্য-গণনা করতে পারতেন। মনে হত তিনি আগে থেকেই টের পেতেন এই পরিবর্তনশীল জগতের কোথায় কি সুবিধা হবে, কি অদলবদল হবে। যদিও তখনো

তিনি জীবনের প্রদোষকালে পৌঁছন নি, তাঁর ঐ অদ্ভুত রহস্য-জ্ঞানের জন্য, আসন্ন ঘটনা যেন আগে থেকেই ছায়াপাত করত।

সবাই তাঁর গোপন মন্ত্র জানতে চাইত, কিন্তু বৃথা। কাকেও তিনি বলতেন না। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর সবচাইতে ছোটো ও সবচাইতে পেয়ারের বোনপো এমনি পেড়াপিড়ি শুরু করল যে, অগত্যা শুধু তার জন্য মাসির সংকল্প টলল। চোখ থেকে চশমা-জোড়া খুলে মাসি তার হাতে দিয়ে বললেন যে ওরই মধ্যে তাঁর ভবিষ্যৎ দর্শনের ক্ষমতা রয়েছে, তা ছাড়া আর কিছুতে নয়। বোনপোর মুখে অবিশ্বাসের ভাব দেখে, মাসি আরো বললেন, "পরেই দেখ-না, বাবা, লোকজন যেখানে জড়ো হয়েছে এমন কোথাও গিয়ে, এমন একটা জায়গা বেছে বসো। যেখান থেকে ভিড়ের মধ্যে সবাইকে দেখতে পাও। তার পর চশমা-জোড়া চোখে দিলেই দেখবে যাদের দিকেই চাইছ, অমনি তাদের মনের কথা তোমার সামনে যেন টেবিলে ছড়ানো এক প্যাকেট তাসের মতো দেখতে পাবে। তাদের মনের সবচাইতে গোপন কথা আর ইচ্ছা প্রকাশ পেয়ে যাবে; শুধু তাই নয়, তার উপর তুমি তাদের ভবিষ্যৎটাও খুব সহজেই বলে দিতে পারবে।"

মাসিকে তাঁর এত অনুগ্রহের জন্য একটু ধন্যবাদ দিতেও যেন ছেলের তর সয় না। মনে হল এখুনি ছুটে গিয়ে নতুন পাওয়া জিনিসটার গুণ পরীক্ষা করে দেখে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে সন্ধেবেলায় নাটঘরে নাটক থেকে আবৃত্তি হবে। এর চাইতে বড়ো সুবিধা কোথায় পাবে, মঞ্চের উপর থেকে অগুন্তি লোককে যেমন একসঙ্গে দেখা যাবে, তেমন আর কোথাও যাবে না। তার পর সভাস্থ শ্রোতাদের সামনে নিজের পরিচয় দিয়ে, ছোকরা চোখে চশমা এঁটে, ভিড়ের লোকদের ভবিষ্যৎ গণনা করবার

অনুমতি চাইল। প্রথমেই চোখের সামনে যে অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল, তাই দেখে সে বিস্ময় প্রকাশ করল।

তার পর হরতনের বিবির বিষয় কি সব রহস্যময় ইঙ্গিত পূর্ণ কথা বলতে লাগল; নাকি তার কালো উজ্জ্বল চোখ রুহিতনের গোলামের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে, "আমার দিকে তাকালে তো আমি কৃতার্থ হই।" তার পর বলল, "ইস্কাবনের গোলাম এখানে সবচাইতে ধনী, যদিও দুঃখের বিষয়," এই বলে ছোকরা থামল, যেন কারও ঘরের কথা বাইরে বলবার তার ইচ্ছা নেই। তার পর সে বলল উপস্থিত সকলের মধ্যে কে সবচাইতে সুখী, কে সবচাইতে বেশি দিন বাঁচবে, দেশের ভবিষ্যতে কি আছে না আছে, এই নাটকঘরে শীঘ্রই যে-সব নাটক মঞ্চস্থ হবে তার কোনটা কেমন চলবে—সব নাকি সে বলে দিতে পারে। তবু ছোকরা কষ্ট করে কোনো খবর দিল না, নাকি তার মনের মধ্যে সব গুলিয়ে আছে। তার বিজ্ঞপ্তি শুনে কেউ মনে কষ্ট পায়, এটা নাকি তার অভিপ্রায় নয়, আবার অন্য দিকে তার ভয় হয় যে কিছু না বললে তার তথাকথিত ভবিষ্যৎবাণী করবার ক্ষমতায় লোকে বিশ্বাস করবে না। কাজে কাজেই অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর কাছে বিদায় নেওয়া ছাড়া তার আর কোনো উপায় নেই, তাঁরা যেন তাঁদের ইচ্ছামতো তার কথার অর্থ করে নেন।

কবিতাটা একেবারে আজগুবি হলেও, আবৃত্তির দিক থেকে এত ভালো হয়েছিল, যে শ্রোতারা মহা উৎসাহে তাদের অভিনন্দন জানাল। ঐ শ্রোতাদের মধ্যে আমাদের সেই হাসপাতালের তরুণ বন্ধুটিও ছিল, ততক্ষণে সে আগের রাতের কাণ্ড-কারখানার কথা বেমালুম ভুলে গেছিল। ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতো আবার তার পায়ে উঠেছিল, কেউ সে জুতো-জোড়ার খোঁজে আসে নি,

এদিকে পথঘাট বেজায় নোংরা, কাজেই ছোকরা ভাবল জুতো-জোড়াকে কাজে লাগালে ক্ষতি কি।

ঐ কবিতাটার গোড়ার দিকটা তার বেজায় ভালো লাগল, তার যদিও এদিকে ওদিকে নজর যাচ্ছিল, তবু গল্পটার কথা বার বার মনে পড়ছিল। সে ভাবছিল, 'অমন এক জোড়া চশমা পেলে বেড়ে হয়; তা হলে সেটাকে পরলেই সকলের বুকের ভিতর সোজাসুজি দেখতে পাবে, সে তো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারার চাইতে আরো অনেক বেশি মজার ব্যাপার হবে। ধর যদি ঐ সামনের বেঞ্চিতে বসা ভদ্রলোকদের আর ভদ্রমহিলাদের বুকের ভিতর দেখতে পাওয়া যেত, তা হলে কত কিছুই-না জানা যেত; চোখের সামনে যেন একটা দোকান বসে যেত। ওদের মনের সব গলি-ঘুঁচি পর্যন্ত দেখে নিতাম! আহা, বড়ো ইচ্ছা করে একটা সুখের চিন্তার মতো এর মন থেকে ওর মনের মধ্যে নিঃশব্দে চলে যাই!'

ঐ শেষের কথাগুলি বলবামাত্র কাঠের জুতোর ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠল; অমনি ছোকরার শরীরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়ে, অত্যন্ত অদ্ভুত এক ভ্রমণে বেরুল, সে ভ্রমণের পথ হল সামনের সারিতে বসা ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা মনের মধ্যে দিয়ে। প্রথমে ঢুকল এক ভদ্রমহিলার হৃদয়ে, ঢুকেই মনে হল, এ কোথায় এলাম, এটা কি একটা বিকলাঙ্গদের হাসপাতালের যে-ঘরের দেয়ালে নানান রুগ্ন হাত-পার প্লাস্টারের ছাঁচ তোলা থাকে, সেখানে এলাম নাকি! তবে একটা তফাত ছিল; হাসপাতালে রুগীরা যেই ভরতি হত তখুনি ছাঁচগুলো তোলা হত, এগুলোকে দেখে মনে হয় হাত-পার মালিকরা গত হলে পর ছাঁচ তোলা হয়েছে। আসলে ঐ ছাঁচগুলো হল বিশেষ বিশেষ প্রিয় বন্ধুদের অঙ্গের; যাতে তাদের খুঁতগুলো সর্বদা মনে রাখা যায়, তাই ওগুলোকে যত্ন করে তুলে রাখা হয়েছে।

সে হৃদয়টা থেকে ছোকরা আরেক মহিলার হৃদয়ে গিয়ে ঢুকল ; এবার কিন্তু মনে হল যেন একটা মহান গম্ভীর গির্জা-ঘরে এসেছে। বেদীর উপর পবিত্রতার চিহ্ন সাদা ঘুঘু পাখির মূর্তি ; খুশি হয়ে ছেলেটির সেইখানেই হাঁটু গেড়ে বসতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু তাকে যে এখনই পাশের হৃদয়ে চলে যেতে হবে ! তবু কানে বাজতে লাগল অর্গানের গুরুগম্ভীর স্বর, তাই শুনে তার মনে হতে লাগল সে নিজেও যেন আগের চাইতে ভালো অন্য একটা কেউ হয়ে গেছে পাশের মন্দিরে প্রবেশ করবার নিতান্ত অযোগ্য সে নয়। এবার দেখল ছোটো একটা দীনহীন চীল-কোঠার ঘর, ঘরে কার রুগ্ন মা শুয়ে আছেন। দেখেই বোঝা যায় এরা বড়োই গরিব-দুঃখী, তবু খোলা জানলা দিয়ে নরম গরম রোদের কিরণ ঘরে ঢুকছে, ছাদের উপর ছোটো কাঠের বাক্সে কী সুন্দর গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে, গোলাপগাছের ডালে বসে দুটি নীল পাখি গান গাইছে, সে অপূর্ব গান আনন্দ, শান্তি, স্নেহ দিয়ে ভরা ; মা শুয়ে শুয়ে তাঁর মেয়ের জন্য আশীর্বাদ ভিক্ষা করছেন।

সেখান থেকে ছেলেটি গেল একটা মাংস দিয়ে বোঝাই করা কষাইয়ের দোকানে ; চারদিকে শুধু মাংস আর মাংস, মাংসের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নেই। এ হৃদয়টা একজন ধনী লোকের, সবাই তাঁকে ভারি শ্রদ্ধা করে।

তার পর ছেলেটি ঢুকল ঐ ভদ্রলোকের স্ত্রীর হৃদয়ে। সেটা বাড়ির চালের উপর একটা ভাঙা ঘুঘু পাখির খোপের মতো ; ছাদের উপরে বাতাসে নিশানা দিচ্ছে ভদ্রমহিলার স্বামীর একটা ছবি, ছবিটার সঙ্গে বাড়ির দরজাগুলো কেমন করে বাঁধা, লোকটা যেমন নড়ে চড়ে, দরজাও তেমনি খোলে বন্ধ হয়।

সেখান থেকে গেল সে আয়নার দেয়ালে ঘেরা একটা ছোটো

কুঠরিতে, রসেনবোর্গের দুর্গে যেমন আছে। আয়নাগুলোর কিন্তু সব কিছুকে আশ্চর্যরকম বড়ো করে দেখাবার ক্ষমতা আছে। কুঠরির মাঝখানে, তিব্বতের দালাই লামার মতো মাটিতে পা মুড়ে বসে ঘরের মালিক, তার নিতান্ত সাদাসিধে চেহারা নিয়ে, আয়নায় নিজের অবিশ্বাস্য মহত্ত্বের ছায়া বিভোর হয়ে দেখছে।

তার পর ছেলেটির মনে হল বুঝি ছুঁচলো ছুঁচে ভরা একটা ছুঁচের কৌটোর মধ্যে ঢুকেছে। সে ভাবল, 'এটা নিশ্চয় কোনো বুড়ি আইবুড়ো মেয়ের হৃদয়!' কিন্তু মোটেই তা নয়, ওটা ছিল একজন অল্পবয়সী কর্মচারীর হৃদয়, লোকে বলত তার নাকি অনেক জ্ঞানগম্যি, সুন্দর রুচিবোধ।

তার পর হতভাগা ছোকরা ঐ সারির শেষের হৃদয়টা থেকে বেরিয়ে পড়ে, দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল, "হায়, হায়, আমি কি পাগল হলাম নাকি? উঃফ্, কি অসহ্য গরম! আমার মাথায় রক্ত চড়ে যাচ্ছে!" হঠাৎ কাল সন্ধ্যাবেলার সেই অদ্ভুত ব্যাপার-টার কথা মনে পড়ে গেল, তার মুণ্ডুটা কিভাবে হাসপাতালের লোহার রেলিংএর ফাঁকে আটকে গেছিল! অমনি সে বলে উঠল, "ঠিক হয়েছে, ঐ হল কারণ। মনে হচ্ছে রুশরা যেখানে গরম বাষ্পে স্নান করে, সেইরকম একটা জায়গায় গিয়ে, ওপরের তক্তায় লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে ইচ্ছা করছে!"

কাজে কাজেই পর মুহূর্তেই দেখে সে সত্যি করে ঐরকম একটা স্নানাগারের সবচাইতে উপরের তক্তায় শুয়ে আছে, কাপড়-চোপড়, বুট, কাঠের জুতো সব যেমন ছিল তেমনি পরা রয়েছে। বাষ্পগুলো ছাদে লেগে গরম জলের ফোঁটা হয়ে ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে।

ভয়ংকর চমকে গিয়ে "উঃ!" বলে অমনি সে উঠে দাঁড়াল। ওখানকার দেখাশুনো করার লোকটাও স্নানের ঘরে ওরকম

জুতো-জামা পরা একটা লোককে দেখে চীৎকার করে উঠল! আমাদের গল্পের নায়কের ভারি উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, সে লোকটার কানে কানে বলল, "ও কিছু না, একজনের সঙ্গে বাজি ধরে এমন করলাম!" তার পর হাসপাতালে ফিরে গিয়ে পাগলামি ছাড়াবার জন্য বুকে পিঠে টগ্‌বগে গরম সর্বের পুল্‌টিশ লাগিয়ে শুয়ে রইল। জুতো-জোড়া খুলে ফেলল।

পরদিন সকালে দেখে পিঠের ছাল-টাল উঠে একাকার; ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতোর কাছ থেকে ওর চাইতে বেশি কিছু পাওয়া হল না।

মুহুরির ভোল বদলানো

এতক্ষণ সেই পাহারাওয়ালার কথাও আমাদের মনে ছিল আর পথে কুড়িয়ে পাওয়া খড়ম-জোড়ার কথা তারও মনে ছিল। এবার হাসপাতালে গিয়ে জুতো-জোড়াকে সে নিয়ে এল, কিন্তু ছোটো-কাপ্তানও বলল, ও জুতো তার নয়, রাস্তার অন্য লোকেরাও তাই বলল, অগত্যা কাঠের জুতো-জোড়াকে থানায় জমা দেওয়া হল।

মুহুরিদের একজন জুতো-জোড়াকে নিয়ে নিজের জুতোর পাশে রেখে বলল, "দেখেছ, একেবারে আমার জোড়ার মতো দেখতে। যে মুচি ওটা বানিয়েছে, সে ছাড়া কেউ তফাত বুঝবে না!" ঠিক সেই সময় কতগুলো কাগজ নিয়ে একজন লোক ঢুকে বলল, "ও কেরানীবাবু!" মুহুরি তার ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল। তার পর লোকটা কাজ সেরে চলে গেলে পর, আবার কাঠের জুতোগুলোর দিকে তাকিয়ে, কিছুতেই মনে করতে

পারল না, ডাইনের জোড়া ওর নিজের, না কি বাঁয়ের জোড়া। শেষটা ভাবল, 'ঐ ভিজে জোড়াই আমার হবে।' ওর কপালটাই মন্দ কারণ ঐ জোড়াটাই ছিল সেই ভাগ্যদেবীর কাঠের জুতো। তার পর মুহুরি কাঠের জুতোয় পা গলিয়ে কাগজপত্র পকেটে পুরে, বগলে একতাড়া কাগজ গুঁজে নিল। ওগুলো বাড়ি নিয়ে গিয়ে নকল করতে হবে। তার পর মুহুরি ভাবল, 'ফ্রেডারিক্সবার্গ অবধি হেঁটে গেলে ভালো বৈ মন্দ হবে না।" এই বলে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদূর লোকটা এমনি সটাং কাজের মানুষের মতো হেঁটে চলল যে পায়ের কাঠের জুতোর জাদুবিদ্যা ধরা পড়ার কোনো কারণই ঘটল না। বড়ো রাস্তার দুদিকে গাছের সারি। সেখানে এক চেনা লোকের সঙ্গে দেখা, লোকটা আমাদের দেশের একজন তরুণ কবি। সে বলল নাকি পরদিনই বেরিয়ে পড়ছে, গ্রীষ্ম-কালটা বেড়িয়ে কাটাবে।

মুহুরি বলল, "এঁ্যা! সে কি! আবার বেরুচ্ছ? কী সুখী তুমি, যেখানে খুশি অমনি চলে যেতে পার! আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের পায়ে শেকল বাঁধা থাকে।

কবি বলল, "কিন্তু ঐ শেকলটা আফ্রিকার সেই বিখ্যাত পাঁউরুটি ফলের গাছের সঙ্গে বাঁধা আছে! কাল কি হবে সে বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা নেই। বুড়ো হলে পেন্‌শন পাবে।"

মুহুরি তবু বলল, "তা হতে পারে তবু তুমি ঢের বেশি সুখী। সারাদিন গাছতলায় বসে কবিতা লিখতে নিশ্চয় খুব ভালো লাগে। তার পর দুনিয়াসুদ্ধ সবাই কেমন তোমার প্রশংসা করে বক্তৃতা দেয়। তা ছাড়া তুমি নিজেই নিজের মালিক। উঃ! একবার যদি আপিসে বসে বসে আজে-বাজে বিষয় নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে সারাদিন কাটাতে, তা হলেই বুঝতে সে যে কী ক্লান্তিকর কাজ!"

শুনে কবিও মাথা নাড়ল, মুহুরিও মাথা নাড়ল, কেউ তার মত বদলাল না, দুজন দুদিকে চলে গেল।

মুহুরি মনে মনে বলল, 'কবিরা কি অদ্ভুত মানুষ! আমার বড়ো ইচ্ছা করে ওদের কথা বুঝতে পারি, আমার কবি হতে ইচ্ছা করে। আমি যদি কবি হতাম, নিশ্চয় বলতে পারি আমি ঐ-রকম নাকেকান্নার বাজে কবিতা লিখতাম না। আজকের এই বসন্তকালের দিনটি কী সুন্দর, কবির যুগ্যি দিনই বটে। বাতাসটা অস্বাভাবিক রকম পরিষ্কার; মেঘগুলো কী সুন্দর; গাছ থেকে, গাছের ফুল থেকে কী সুগন্ধ ঝরছে! অনেককাল এইরকম মনে হয় নি।'

মুহুরির কথার শেষের দিকটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে সে এখন সত্যি সত্যি কবি হয়ে উঠেছে।

মুহুরি বলল, "এই অপূর্ব সুবাস আমাকে মডলিন পিসির ভায়োলেট ফুলের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আহা, তখন আমি কত ছোটো ছিলাম! কী ভালো ছিলেন আমার ঐ বুড়ি পিসি, কতকাল তাঁর কথা ভাবি নি। ঐ এক্সচেঞ্জ আপিসের পিছনেই থাকতেন। যত বেশি শীতই পড়ুক-না কেন পিসির ঘরে সর্বদা একটা জলভরা পাত্রে হয় একটি সবুজ গাছের ডাল, নয় তো কয়েকটা কচি পাতার কুঁড়ি রাখা থাকত। আর তাঁর ভায়োলেট ফুলগুলি যে কী মিষ্টি ছিল। আমি কেমন একটা পয়সা গরম করে বরফজমা জানলার শার্শীতে চেপে ধরতাম, অমনি গোল হয়ে খানিকটা বরফ গলে যেত আর আমি সেখানে চোখ লাগিয়ে বাইরে তাকাতাম। কী সুন্দর দৃশ্যই-না দেখতাম! ঐ যে বড়ো খালের বরফজমা জলে জাহাজগুলো স্থির হয়ে রয়েছে, নাবিকরা সবাই চলে গেছে; পাহারা দেবার জন্য আছে শুধু একটা কাক আর সেটা কী ভীষণ চ্যাঁচাচ্ছে! তার পর যখন

অনেকদিন পরে বসন্তের বাতাস আবার বইতে শুরু করল, সবকিছু যেন নতুন প্রাণ পেল। লোকরা সব এসে মহা ফুর্তিতে গান গাইতে গাইতে, বরফের চাংড়াগুলোকে ভেঙে ফেলত; জাহাজের দড়ি-দড়া পাল মাস্তুল কপিকল যার যার জায়গায় আবার বসানো হত, ব্যস্, অমনি জাহাজগুলো বিদেশ যাত্রা করত। কিন্তু আমি পিছনে পড়ে থাকতাম। তাই আমাকে চির-কাল থাকতে হবে, আপিসে বসে বসে দেখতে হবে অন্যরা বিদেশে যাবার ছাড়পত্র করিয়ে নিচ্ছে! হায় রে, এই আমার কপাল!”

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে মুহুরি বলল, “আচ্ছা, আমার হয়েছেটা কি! আগে তো কখনো এ-সব কথা মনেও ভাবি নি; এ নিশ্চয় বসন্তের হাওয়ার ফল, যত-না আনন্দ পাচ্ছি তার চাইতে বেশি কষ্ট পাচ্ছি!” তার পর পকেট হাতড়ে কাগজগুলো নেড়ে বলল, “এগুলোকেই একটু দেখা যাক, তা হলে হয়তো অন্য কথা মনে হতে পারে।” এই ভেবে কাগজগুলো বের করে, প্রথম পৃষ্ঠার উপরে চোখ বুলিয়ে, জোরে জোরে পড়তে লাগল, “ ‘মাদাম সিগ্‌ব্রিথ, পাঁচ অঙ্কের মৌলিক বিয়োগান্তক নাটক।’ এ আবার কি? আরে, এ যে দেখছি আমারই হাতে লেখা; তবে কি আমিই এই বিয়োগান্তক নাটক লিখেছি নাকি? এটা কি? ‘দুর্গ প্রাকারে গোপন ষড়যন্ত্র, গীতিনাট্য।’ কী জ্বালা, এ-সব কাগজ আমার পকেটের মধ্যে এল কি করে? কেউ নিশ্চয়ই পুরে দিয়েছে। আরে, এ যে দেখি একটা চিঠি!” ঠিক তাই; চিঠিটা একজন রঙ্গালয় অধিকারীর লেখা। উপরে উল্লিখিত নাটক দুটিকে তিনি ফেরত পাঠিয়েছেন আর যে-ভাষায় সেগুলো সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেছেন, তাকে মোটেই ভদ্রজনোচিত বলা যায় না।

মুহুরি বলল, “হুঁম্‌ম্, হুঁম্‌ম্!” বলে একটা বেঞ্চিতে

বসে পড়ল। তার চিন্তাগুলো কি তাজা, মনে কত উদ্যম! অন্যমনস্কভাবে মুহুরি হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে একটা ফুল ছিঁড়ল, ছোট্টো একটা বুনো ডেজি ফুল, কিন্তু ওর বিষয় অনেক-গুলো লম্বা লম্বা বক্তৃতা দিয়ে তবে উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্‌রা যা শেখাতে পারতেন, ঐ সামান্য ফুলটি নিজেই এক মুহূর্তে সে-সব বলে দিল। ফুল তার জন্মকাহিনী বলল, কেমন করে সূর্যের আলোর শক্তি তার কোমল কচি পাপড়িগুলিকে খুলে দিয়ে ভিতর থেকে সুগন্ধ টেনে বের করেছিল। তাই শুনে মুহুরির মনে পড়ে গেল মানুষের জীবনের সংগ্রামও ঐরকম করে মানুষের মনের গোপন ভাবনা-চিন্তাগুলোকে টেনে বের করে দেয়।

কয়েক পা দূরে একটা ছোটো ছেলে দাঁড়িয়েছিল, এই সময় সে তার হাতের লাঠিটি নালার জলে ফেলে দিতেই খানিকটা জল ছিটকে উঠে গাছের সবুজ ঝুলন্ত ডালপালায় লাগল। অমনি মুহুরির মনে পড়ল ঐ ফোঁটা ফোঁটা জলের সঙ্গে কত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে পোকাও ছিটকে উঠেছিল। তাদের কাছে নিশ্চয় ঐ ছিটকে পড়াটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, আমাদের ধরে কেউ যদি মেঘের রাজ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে-ব্যাপারটা আমাদের কাছেও যেমন সাংঘাতিক মনে হবে। এ-সব কথা আর তার নিজের মধ্যেও কত বড়ো একটা পরিবর্তন এসেছে যে এমন চিন্তা মনে জাগছে, তাই ভেবে মুহুরির হাসি পেল।

তখন সে ভাবল, 'এবার বুঝেছি, এ-সমস্তই স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। তবে এইটে অদ্ভুত যে স্বপ্নও দেখছি, অথচ সমস্তক্ষণ টের পাচ্ছি যে স্বপ্ন দেখছি। কাল সকালে ঘুম ভাঙলে পর এ-সব কথা মনে থাকবে কি না কে জানে। আগের চাইতে এখন আমি কত সুখী, মনে হচ্ছে মনটা আমার একেবারে সজাগ হয়ে

আছে, সব কিছু টের পাচ্ছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানি যে কাল যদি আমার আজকের এই-সমস্ত চিন্তা আর ভাবনার কথা মনেও পড়ে, সবগুলোকে একেবারে আজগুবি বাজে কথা বলে মনে হবে। তাই হয়, স্বপ্নে যে-সব চালাক চালাক চমৎকার কথা লোকে বলে আর শোনে, সেগুলো হল পরীদের সোনার মতো, রাতে সেগুলোকে কী ঝক্‌ঝকে কী দামী বলে মনে হয়, কিন্তু যেই-না দিনের আলো ফোটে, অমনি দেখা যায় ও-সব কিছু নয়, শুধু কতগুলো পাথর আর শুকনো পাতা!' এই বলে মহা দুঃখে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছোটো-ছোটো কয়েকটা পাখি দেখতে লাগল, তারা মহানন্দে গান গাইতে গাইতে এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল।

তার পর মুহুরি মনে মনে বলতে লাগল, 'হায় রে, ওদের ভাগ্য আমার চাইতে কত ভালো! ওরা কেমন উড়তে পারে, সে এক মহা বিদ্যা। যে আকাশে উঠতে পারে সে বড়ো সুখী। যদি নিজের চেহারাটা বদলানো সম্ভব হয়, তা হলে ঐরকম একটা ছোটো পাখি হতে চাই!'

বলবামাত্র তার কোটের ঝুল আর হাতা একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে পাখির ডানা হয়ে গেল; অন্য কাপড়-চোপড় পালক হল, পায়ের কাঠের জুতো হল পাখির নখ। মুহুরি টের পেল সে কেমন বদলে যাচ্ছে আর মনে মনে হেসে বলল, 'ঐ দেখ, এবার কোনো সন্দেহ-ই নেই যে আমি স্বপ্ন দেখছি, তবে এমন আজগুবি স্বপ্ন জন্মে দেখি নি!'

তখন মুহুরি পাখি হয়ে গাছের সবুজ ডালে উড়ে গিয়ে গান গাইতে লাগল, কিন্তু সে গানে কোনো কাব্যের ভাব ছিল না, কারণ তখন তো তার কবিমনটি গেছে! জাদু-জুতো একসঙ্গে দুটো কাজ করতে পারত না। যখন মুহুরির কবি হবার ইচ্ছা

হল, তখন সে কবি হল ; তার পর যেই ছোটো পাখি হবার ইচ্ছা হল, তখন সে পাখিই হয়ে গেল, কবি-টবি রইল না।

মুহুরি ভাবল, 'এই তো বেশ ; সারাদিন আপিসে বসে কাজকর্ম করব আর রাতে লার্ক পাখি হয়ে ফ্রেডারিক্সবার্গের বাগানে উড়ে বেড়াব। এই নিয়ে খাসা এক প্রহসন লেখা যায় !'

তার পর মুহুরি-পাখি ঘাসের উপর নেমে এল ; মাথা ঘুরিয়ে চারদিকটা দেখে নিয়ে কচি কচি ঘাসে ঠোকরাতে লাগল। এখন সে এত ছোট্টো হয়ে গেছে যে ঘাসগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন আফ্রিকার তালগাছের মতো বড়ো।

তবে ঐ এক মুহূর্তের জন্য। তার পরেই চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল ; মনে হল কী একটা বিকটরকমের বড়ো আর ভারী জিনিস তার গায়ের উপর পড়ল। আসলে ওটা ছিল একটা স্কুলের ছেলের মাথার টুপি। ছেলেটা তখন টুপির তলায় হাত চালিয়ে, মুহুরির পিঠ আর ডানা চেপে ধরল। প্রথমটা চমকে গিয়ে মুহুরি চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে হতভাগা বেয়াদব ছোকরা, আমি যে থানার মুহুরি !" কিন্তু ছেলেটার মনে হল পাখি বলছে, "পিপ্পি !" পাখির ঠোঁটে একটা টোকা দিয়ে, তাকে নিয়ে সে এগুতে লাগল।

একটু পরেই আরো দুটো স্কুলের ছেলের সঙ্গে দেখা। এদের অবস্থা ওর চাইতে ভালো, ওরা চার পয়সা দিয়ে পাখিটাকে কিনে নিল। এইভাবে মুহুরিকে কোপেনহাগেন শহরে নিয়ে যাওয়া হল !

মুহুরি মনে মনে বলল, 'ভাগ্যিস স্বপ্ন দেখছি, নইলে সত্যি বেজায় রেগে যেতাম। আগে ছিলাম কবি, এখন হয়েছি পাখি ! হয়তো আমার কবিমনের জন্যেই সামান্য একটা পাখি হয়ে

গেলাম। সে কী শোচনীয় অবস্থা রে বাবা, বিশেষত যদি ছোটো ছেলেদের হাতে পড়া যায়। এবার কি হবে কে জানে!'

ছেলেদুটো ওকে নিয়ে একটা সাজানো-গোজানো ছিমছাম বাড়িতে ঢুকল ; তাদের দেখে একজন মোটা-সোটা হাসি-খুশি মহিলা বেরিয়ে এলেন! কিন্তু পাখি দেখে তিনি একটুও খুশি হলেন না, বললেন, "কি একটা বাজে মেঠো পাখি এনেছ!" তবু এবারের মতো ওদের ক্ষমা করতে রাজি হলেন, বললেন জানলার কাছে ঝোলানো খালি খাঁচায় এ পাখিটাকে ওরা রাখতে পারে। "তাতে আমার টিয়া-সোনা খুশি হতে পারে। আজ ওর জন্মদিন, কাজেই মেঠো পাখি এবার এসে ওকে শুভেচ্ছা জানাক।" এই বলে মহিলা সস্নেহে টিয়া পাখির দিকে তাকালেন! মস্ত সবুজ এক টিয়া পাখি, চমৎকার একটা খাঁচার দাঁড়ে বসে দোল খাচ্ছে।

টিয়া কোনো উত্তর না দিয়ে, ভারি গম্ভীরভাবে একবার সামনের দিকে, একবার পিছন দিকে, দোল খেতে লাগল। কিন্তু একটা ছোট্টো সুন্দর ক্যানারি পাখি ওকে দেখেই জোরে জোরে গান গেয়ে স্বাগত জানাল। মাত্র গত গ্রীষ্মকালে এ পাখিটাকে তার রোদে আর মশলার গন্ধে ভরা দেশ থেকে আনা হয়েছিল।

মহিলাটি বললেন, "চুপ কর্, তুই বড়ো গোলমাল করিস্।" এই বলে একটা রুমাল দিয়ে খাঁচাটাকে ঢেকে দিলেন। মুহুরিকে, অর্থাৎ ঐ মহিলার ভাষায় মেঠো পাখিকে, ক্যানারির পাশেই একটা খাঁচায় রাখা হল। টিয়ার খাঁচাও খুব দূরে ছিল না। টিয়াটা মানুষের ভাষায় শুধু একটি কথাই বলতে পারত, 'এসো, আমরা মানুষ হই!' কথাটা ওর মুখে ভারি মজার শোনাত। তা ছাড়া আর যা বলত, কিম্বা চ্যাঁচাত, তার মাথা-

মুণ্ডু কোনো মানে ছিল না, যেমন ক্যানারি পাখির কিচির-মিচিরেরও কোনো মানে ছিল না। তবে মুহুরি ওদের দুজনের কথার মানে বুঝতে পারল, কারণ সে-ও যে এখন পাখি হয়েছে।

ক্যানারি পাখি গান ধরল, "একদিন ছিলাম মুক্ত। সবুজ তালগাছের, ফুলে ভরা বাদামগাছের উপর দিয়ে উড়ে বেড়াতাম। সুন্দর ফুলবাগানের উপর দিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে উড়ে যেতাম; স্বচ্ছ আয়নার মতো সুন্দর সরোবর, তার ধারে
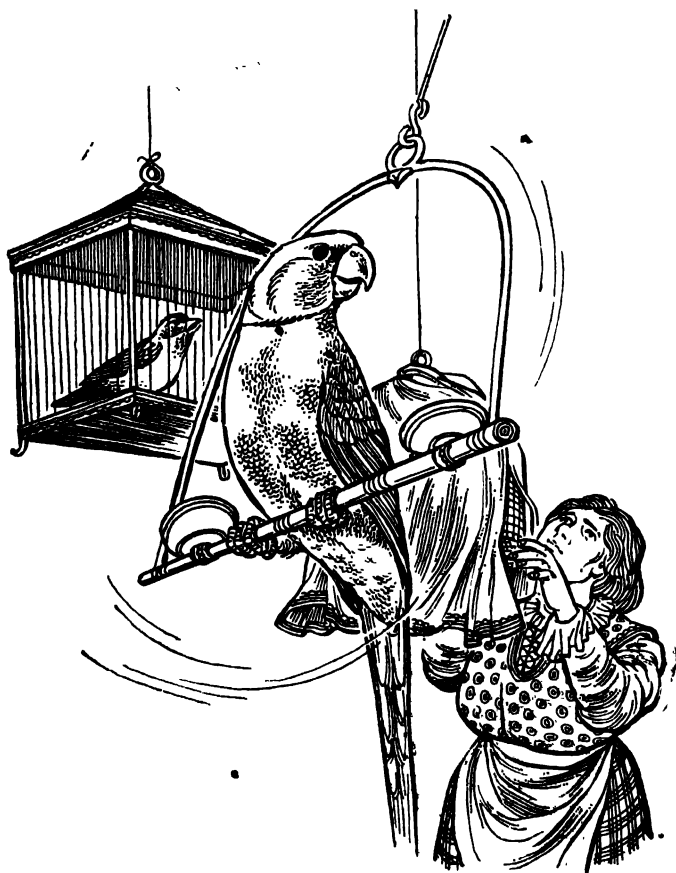
ধারে সুগন্ধি ঝোপ, তার উপর দিয়ে উড়ে যেতাম! সেখানেও কত টিয়া কাকাতুয়া, কিবা তাদের রঙের বাহার; কত লম্বা লম্বা, কত মজার, কত গল্প বলত তারা।"

উত্তরে টিয়া বলল, "যত-সব অশিক্ষিত বুনো পাখি! এসো, আমরা মানুষ হই। হাসছ না যে বড়ো? ঐ ভদ্রমহিলা আর এখানে যত বাইরের লোক আসে, তারা সবাই যদি হাসতে পারে, তা হলে তুমিও খুব পার। হাসির কথায় মজা না লাগলে বুঝতে হবে বুদ্ধির কমতি আছে। এসো, আমরা মানুষ হই!"

ক্যানারি বলল, "মনে নেই, সেই যে সুন্দরী কুমারীরা তাদের বড়ো-বড়ো তাঁবু আর উঁচু-উঁচু ফুলে ভরা গাছের ছায়ায় কেমন নাচত? ঐ গাছে কি সুস্বাদু ফল হত, ওদের পায়ের কাছে যে শ্যামল বুনো গাছ-গাছালি হত, তার রসটি কী ঠাণ্ডা কী তাজা, তা কি তোমার মনে নেই?"

টিয়া বলল, "তা আছে, কিন্তু এখানে অনেক বেশি আরামে আছি। কী ভালো খাবার দেয়, কী খাতির পাই। আমি জানি আমার ঘটে বুদ্ধি আছে, সেই আমার যথেষ্ট। এসো, আমরা মানুষ হই! তোমার অবিশ্যি যাকে বলে একটা কবিমন আছে, কিন্তু আমার আছে ভারী ভারী বিদ্যা আর প্রচুর রসবোধ। তোমার প্রতিভা থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি খাটাতে পার না; কাজে কাজেই থেকে থেকেই ঐরকম কান-ফাটানো চীৎকার করে ওঠো আর বারে বারেই তোমার মুখ বন্ধ করা হয়। কই, আমার খাঁচা ঢাকা-চাপা দেবার আস্পর্ধা তো কারও নেই। মোটেই নেই, তার কারণ তোমার চাইতে আমাকে অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হয়েছে; তার উপর ঠোঁট দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারি, বুদ্ধি দিয়ে জব্দ করতে পারি। এসো, আমরা মানুষ হই!"

ক্যানারি পাখি গান ধরল, "হে আমার প্রিয় আর রূপসী মাতৃভূমি। তোমার সুঘন শ্যামল গাছে তোমার প্রশান্ত উপসাগর, যেখানকার গাছের লম্বা পাতা ঝুলে পড়ে চঞ্চল ঢেউয়ের মাথায় চুমো খায়, এদের আমি বন্দনা করি। আমার ঝক্‌ঝকে রঙিন ভাইবোনরা কী আনন্দের সঙ্গে অপূর্ব সব মনসা-গাছের মাঝে খেলা করে, গান গায়, আমি সদাই সেই কথাই বলি!" টিয়া চীৎকার করে বলল, "অনুগ্রহ করে তোমার কাঁদুনে সুরটি থামাও দিকি। আরে, কিছু হাসির কথা বল। হাসিই হল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির লক্ষণ। কুকুর কিম্বা ঘোড়া হাসতে পারে? মোটেই না, ওরা শুধু কাঁদতে পারে; খালি মানুষরা হাসতে জানে। হা-হা-হা!" তার পর তার ঐ একটিমাত্র রসিকতা করল, "এসো, আমরা মানুষ হই!"

তখন ক্যানারি পাখি বলল, "শোনো, শোনো, ছোটো ধূসর ডেনমার্কের পাখি, তুমিও এখানে বন্দী। তোমার দেশটা বেজায় ঠাণ্ডা হতে পারে, কিন্তু সেখানে তুমি স্বাধীন। যাও, উড়ে পালাও। ওরা তোমার খাঁচার দরজা বন্ধ করতে ভুলে গেছে; জানলাটাও খোলা আছে; উড়ে পালাও!"

আপনা থেকেই মুহুরি লাফাতে লাফাতে খাঁচার বাইরে এল। ঠিক সেই সময় ঘরের আধখোলা দরজাটাও ক্যাঁচ করে উঠল আর ঘরে এসে ঢুকল চকচকে সবুজ চোখওয়ালা এক বেড়াল। ক্যানারি পাখি খাঁচার মধ্যে ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠল, টিয়া পাখি ডানা ঝাপটিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, "এসো, আমরা মানুষ হই!" মুহুরিও প্রাণের ভয়ে খোলা জানলা দিয়ে উড়ে গেল! অনেকক্ষণ ধরে বাড়িঘর পথঘাটের উপর দিয়ে উড়ে, শেষে ক্লান্ত হয়ে একটা বিশ্রামের জায়গা খুঁজতে লাগল। রাস্তার ও-ধারের বাড়িটাকে কেমন চেনা-চেনা মনে হল। একটা

জানলা খোলা ছিল। মুহুরি উড়ে ভিতরে ঢুকল, এ যে তার নিজের ঘর। সে টেবিলের উপর নামল। টিয়া পাখির রসিকতাটি নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "এসো, আমরা মানুষ হই!" পর মুহূর্তেই পাখি আবার মুহুরি হয়ে, আরাম করে নিজের জায়গাটিতে বসে পড়ল।

কাঠের জুতোর শেষ এবং শ্রেষ্ঠ উপহার

পরদিন ভোরে, মুহুরি তখনো বিছানা ছেড়ে ওঠে নি, এমন সময় কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল ; ভিতরে এল পাশের ঘরের ভাড়াটে, একজন ধর্মতত্ত্বের ছাত্র।

সে এসেই বলল, "তোমার ঐ কাঠের জুতো-জোড়া একটু ধার দেবে, ভাই ? খাসা রোদ উঠেছে, কিন্তু বাগানের মাটি বড়ো স্যাঁৎস্যাঁতে। তা হলে বাইরে গিয়ে একটু তামাক খাই।"

একটু পরেই দেখা গেল কাঠের জুতো পায়ে দিয়ে ছাত্র বাগানে বেড়াচ্ছে। সবে ছটা বেজেছে, রাস্তা থেকে ডাকবাহী ঘোড়ার গাড়ির শিঙা বাজল। তাই শুনে ছাত্র বলল, "আহা, ভ্রমণ করার সুখ এ দুনিয়ায় আর নেই! ঐ আমার প্রথম ও প্রধান ইচ্ছা। ভ্রমণ করতে পারলে আমার মনের চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা হত। ইচ্ছা করে অপূর্ব দেশ সুইট্জারল্যাণ্ড দেখি, ইটালি যাই, আমার ইচ্ছা করে…"

ছাত্রের এবং আমাদের কপাল ভালো যে জাদুর জুতো তখুনি তার ইচ্ছা পূরণ করল, নইলে আরো কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতে হত কে জানে। মোট কথা, সে ভ্রমণ করতে লাগল।

চেয়ে দেখে সে সুইট্‌জারল্যাণ্ডে, সত্যি সত্যি ভ্রমণ করছে। একটা ঘোড়ায়টানা বড়ো যাত্রীগাড়িতে আরো আটজন যাত্রীর সঙ্গে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে চলেছে। মাথায় ভীষণ ব্যথা, পিঠে তার চাইতেও বেশি, অনেকক্ষণ আঁটো বুট পরে থাকার ফলে পা ফুলে ঢোল। চলেছে যেন ঠিক ঘুমিয়েও নয়, আবার জেগেও নয়। ডান পকেটে হুণ্ডি, বাঁ পকেটে পাস্‌পোর্ট, ফতুয়ার ভিতরে একটা থলিতে গুটিকয় মোহর সেলাই করা। ঘুমোলেই স্বপ্নে দেখে এই তিনটি বহুমূল্য জিনিসের একটা-না-একটা খোয়া গেছে। কাজেই থেকে থেকে চমকে উঠে ওগুলো নিরাপদে আছে কি না দেখবার জন্য পাগলের মতো হাত দিয়ে যেন একটি ত্রি-কোণ আঁকে, এ পকেট থেকে ও পকেট, ও পকেট থেকে ফতুয়া। গাড়ির ছাদ থেকে গোছা গোছা ছাতা, লাঠি, টুপি ঝুলছে, মাথার উপর ঠোকাঠুকি খাচ্ছে, বাইরের অপূর্ব দৃশ্যপট আড়াল করে দিচ্ছে।

বরফ পড়তে আরম্ভ করল, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া।

ছাত্র ফোঁস্‌ করে একটি নিশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলল, "আহা, যদি পাহাড়ের ও-ধারটায় থাকতাম, তা হলে সেখানে গ্রীষ্মকাল পেতাম, হুণ্ডিগুলো ভাঙাতে পারতাম। খরচের টাকার কথা ভেবে ভেবে এমন সুন্দর জায়গায় বেড়ানোটাই উপভোগ করতে পারছি না। ইচ্ছা করছে পাহাড়ের ওধারে চলে যাই।'

আর যায় কোথা! পর মুহূর্তেই ছোকরা দেখে যে সে পাহাড়ের ওপারে ইটালিতে ফ্লরেন্স শহর আর রোমের মাঝখানে ভ্রমণ করছে। সামনে ঘন নীল পাহাড়, তার মাঝখানে থ্রাসিমিনি হ্রদে সূর্যাস্তের অপরূপ রঙিন আকাশের ছায়া পড়ে ঝক্‌ঝকে সোনালি রঙ ধরেছে। চারদিকে আঙুর লতার শুঁয়ো যেন পরম স্নেহভরে এ ওকে জড়িয়ে ধরেছে; পথের ধারে

সুগন্ধি লরেলগাছের তলায় একদল প্রায় খালি-গা, সুন্দর দেখতে ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে একপাল কুচ্‌কুচে কালো শুয়োর চরাচ্ছে। যদি উপযুক্তভাবে এ-সবের একটা ছবি আঁকা যেত, যে দেখত সেই আনন্দের চোটে চেঁচিয়ে উঠত, 'ইটালি কী সুন্দর!' কিন্তু আমাদের ধর্মতত্ত্বের ছাত্র আর তার সহ-যাত্রীরা কেউ একটি কথাও বলল না। তাদের চারদিকে হাজার হাজার বিষাক্ত মাছি আর মশা ঝাঁক বেঁধে উড়ছিল। মার্ট্‌ল্‌গাছের ডাল দিয়ে তারা বৃথাই সেগুলোকে তাড়াতে চেষ্টা করছিল। মাছিদের তাতে থোড়াই এসে গেল, বরং যেন হুল ফোটাবার উৎসাহ আরো বেড়ে গেল! গাড়িতে এমন একটিও মানুষ ছিল না পোকা-মাকড়ের কামড়ে যার চোখ-মুখ ফুলে কদাকার দেখতে হয় নি। আর ঘোড়া বেচারাদের কথা আর কী বলব, তাদের সর্বাঙ্গে লাখে লাখে মশা মাছি বসছিল; গাড়ির চালক মাঝে মাঝে নেমে মশা মাছি তাড়ালে কি হবে, পর মুহূর্তে আবার তারা সদলবলে ফিরে আসছিল!

সূর্য অস্ত গেল; চারদিকের দৃশ্যপটে হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা নেমে এল; মনে হল যেন সারাদিন ধরে গ্রীষ্মের মিষ্টি উত্তাপ উপভোগ করার পর এখন নাকে ঢুকছে কবরের ভিতরকার ঠাণ্ডা স্যাঁৎস্যাঁতে হাওয়া। প্রাচীন রঙিন ছবিতে যেমন একটি অদ্ভুত সবুজ রঙ দেখতে পাওয়া যায়, মেঘের আর চারদিকের পাহাড়ের গায়ে সেইরকম রঙ লাগল; যারা ও-সব দেশে ভ্রমণ করে নি তাদের চোখে রঙটাকে হয়তো কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক মনে হতে পারত। দৃশ্যটি বাস্তবিকই অপূর্ব। এদিকে কিন্তু পেট খালি, শরীর ক্লান্ত; কাজেই ওদের মনের সব কামনা বাসনা একটা আরামের আশ্রয়ের আশাকে কেন্দ্র করে ছিল। এখন সেটি পাওয়া যাবে কি না কে জানে।

দেশে যেমন আঁকা-বাঁকা উইলোগাছের বনের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় যেতে হয়, এখানে তেমনি জলপাই বনের ভিতর দিয়ে পথ গেছে। বনের মধ্যে একটা নির্জন সরাইখানা। সরাইখানার সামনে আধ কুড়ি পঙ্গু ভিখারি আস্তানা গেড়েছে; কেউ অন্ধ, কেউ-বা শীর্ণ হাত-পা নিয়ে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে, কেউ কুঁকড়ে-যাওয়া আঙুল-বিহীন হাত তুলে ধরেছে। সে বড়ো শোচনীয় দৃশ্য! সবাই কেঁদে বলছে, "রাজাবাহাদুর, আমরা বড়ো দুঃখী!" বাড়িওয়ালী ময়লা একটা জামা গায়ে দিয়ে নবাগত অতিথিদের স্বাগত জানাল, মহিলার খালি পা, উস্কো-খুস্কো চুল। দরজাগুলোর এমনই অবস্থা যে টন-সুতো দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়; ঘরের মেঝের ইঁট অর্ধেক ভাঙা; নিচু ছাদের তলায় চামচিকে উড়ে বেড়াচ্ছে, আর সে কী দুর্গন্ধ!

রাতের খাবার এল। প্রথমে এল সুরুয়া, অর্থাৎ গোল-মরিচ আর বাসি তেল মেশানো খানিকটা জল। ঐ শেষের উপাদানটি স্যালাডেরও প্রধান উপকরণ বলে মনে হল। প্রধান পদ বলতে বাসি ডিম আর মুরগির মুণ্ডু পোড়া। এমন-কি, মদটাতেও কেমন একটা হেঁসেলের গন্ধ। আসলে ওটাকে সত্যিই নানান উপকরণ মিশিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। দরজা ঘেঁষে যাত্রীদের লটবহর স্তূপ করে রাখা হল; ঠিক হল বাকি সবাই ঘুমোবে, শুধু একজন জেগে জিনিসপত্র পাহারা দেবে! সেটি পড়ল আমাদের ছাত্রের উপর। উঃ, ঘরটাতে হাওয়া নেই, দম বন্ধ হয়ে আসে; মশাগুলো কেবলই পিনপিন্ শব্দ করে আর নির্দয়ভাবে কামড়ায়; বাইরের সেই অভাগারা স্বপ্নের মধ্যেও কাতরাতে থাকে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ছেলেটি বলল, "হ্যাঁ, ভ্রমণ করাটা একটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারত বটে, যদি শরীরের বালাই না থাকত! কিম্বা যদি শরীরটা বিশ্রাম পেত আর মুক্ত আত্মা

স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারত! আর যেখানেই যাই-না কেন কী একটা প্রবল ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে আমার আত্মাটাকে অবধি জ্বালিয়ে খায়! যা পাওয়া যায়, তার চাইতেও ভালো কিছু চাই; এমন কিছু যার শেষ নেই, খুঁত নেই; কিন্তু সে জিনিসটা কি আর কোথায় গেলে তাকে পাব? তা সত্ত্বেও আমি ভালো করেই জানি যে আমি যা চাই, সেটা হল আনন্দ, পরিপূর্ণ চিরস্থায়ী আনন্দ!”

যেই-না এ কথা বলা, ছাত্র দেখে সে তার নিজের বাড়িতেই রয়েছে। জানলায় লম্বা লম্বা সাদা পরদা ঝুলছে। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর একটা কালো কফিন। তার মধ্যে ও নিজে মৃত্যুর শান্তিময় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে, শুয়ে আছে। ওর ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে; শরীরটা বিশ্রাম পাচ্ছে আর আত্মাটা তার পার্থিব দেহমন্দির থেকে মুক্তি পেয়ে, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ঘরের মধ্যে দুটি মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে; একজন হলেন ভাগ্যদেবীর দূতী, অন্যজন ভাবনা। তাঁরা নিচু হয়ে মৃত লোকটিকে দেখছেন।

ভাবনা বললেন, “দেখলে তো তোমার দেওয়া কাঠের জুতো মানুষকে কি ধরনের সুখ এনে দেয়?”

সুখ বলল, “কিন্তু আর যাকে যাই দিক-না কেন, এই ঘুমন্ত মানুষটিকে তো সত্যি সত্যি সুখ দিয়েছে।”

ভাবনা বললেন, “না, এ তো ইচ্ছা করেই মরেছে, ডাক আসার জন্য অপেক্ষা করে নি। ওর আত্মার চোখই ফোটে নি যে, যে-সব গোপন ধনে পৃথিবীটা ভরা আছে, তা দেখে চিনতে পারবে; ওর নির্ধারিত কাজ তো ও শেষ করে যাচ্ছে না। আমি ওকে একটা বরের মতো বর দিচ্ছি।” এই বলে ভাবনা তার পা থেকে কাঠের জুতো-জোড়া খুলে নিলেন।

অমনি সেই মরণ-ঘুম ভেঙে গেল ; মরা লোকটা নতুন প্রাণ, নতুন উদ্যম নিয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবনা অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তাঁর সঙ্গে কাঠের জুতো-জোড়াও অদৃশ্য হয়ে গেল। নিশ্চয়ই ওঁর মতে ওগুলো যে ওঁরই ন্যায্য সম্পত্তি সেটা প্রমাণ হতে বাকি ছিল না।

পরী-টিলার কথা

বুড়ো গাছের ফাটলে ফোকরে অনেকগুলো গিরগিটি চট্‌পট্‌ দৌড়োদৌড়ি করছিল। একজন বলল, "শোনো একবার পুরনো পরী-টিলায় কিসের হড়্‌হড়্‌ ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ! দুরাত্তির চোখের দুপাতা এক করতে পারি নি, দাঁত-ব্যথার চাইতে কিসে কমটা হল বল দিকিনি!"

অন্য গিরগিটি বলল, "ওখানে একটা কিছু ব্যাপার পাকাচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। ভোরে মোরগ-ডাকা পর্যন্ত চারটে লাল থামের ওপর টিলাটাকে তুলে রাখে; আর সে কী ঝাঁটপাট ধুলো ঝাড়ার ঘটা! ওদের মেয়েরা নতুন নতুন নাচ শিখছে, তাতে সে কী পা ঠোকার ধুম! একটা কিছু যে ঘনাচ্ছে সেটা ঠিক।" পরী-টিলাতে ক্ষুদে-ক্ষুদে এক জাতের পরী থাকে, তাদের বলে এল্‌ফ্‌।

তৃতীয় গিরগিটি বলল, "যা বলেছ। আমার চেনা একটা কেঁচোর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হচ্ছিল। সে সবেমাত্র ওখান থেকে এসেছে, বেশ কিছুকাল ওখানে দিনরাত মাটি তুলতে তুলতে অনেক কথাই ওর কানে গেছে। অবিশ্যি বেচারা চোখে কিছু দেখতে পায় না, কিন্তু বুঝতে শুনতে ওর জুড়ি নেই। ওখানে নাকি বাইরে থেকে গণ্যি-মান্যি অতিথি আসবে; তবে

কারা আসবে সে কথা কেঁচো জানে না। যত রাজ্যের জোনাকিদের বায়না দিয়েছে, মশাল-মিছিল করতে হবে, তাই নাকি বলল ওরা। তা ছাড়া পরী-টিলার সোনা-রুপোর চাঁইয়ের কথা তো সবাই জানে, সেগুলোকে ঘষে মেজে চাঁদের আলোয় পেতে রাখা হবে, তাতে জৌলুস বেরুবে।"

ঠিক সেই সময় পরী-টিলা দুফাঁক হল আর ভিতর থেকে এক বুড়ি-মতো পরী মহিলা বেরিয়ে এল। তার কাজ হল পরী-রাজার ঘর-সংসার দেখা; এদিকে তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়া হয়, তাই কপালে একটি হলদে পাথরের হরতন বাঁধা, পরনে কাপড়-চোপড় অবিশ্যি খুব সাদাসিধে। সব ক্ষুদে পরীদের মতো বুড়ির পিঠটাও ফোঁপরা। ভারি তাড়াতাড়ি খুর্‌খুর্ করে হাঁটে। খুট্‌খুট্ করে সোজা জলার ধারে গেল বুড়ি; সেখানে রাত-জাগা দাঁড়কাক থাকে। তাকে বলল, "আজ রাতে তোমার পরী-টিলায় নেমন্তন্ন। কিন্তু ভাই, তার আগে আমাদের একটি মস্ত উপকার করবে কি? অন্য অতিথিদের কাছে নেমন্তন্ন পৌঁছে দেবে? তুমি নিজে তো আর সংসারী নও, কাজেই এটুকু করতে তোমার কোনোই অসুবিধা হবে না! আমাদের ওখানে ভারি গণ্যমান্য অতিথি আসবার কথা, অর্থাৎ কিনা উত্তর দেশের ট্রোলরা। আমাদের রাজামশাই নিজে তাদের অভ্যর্থনা করবেন।"

দাঁড়কাক জিজ্ঞাসা করল, "কার কার নেমন্তন্ন হচ্ছে?"

"দুনিয়াসুদ্ধ সবাই আসতে পারে; এমন-কি, যে-সব মানুষ ঘুমের ঘোরে কথা কয়, কিম্বা অন্য কোনোভাবে আমাদের মতো আচরণ করে, তারা পর্যন্ত বাদ নয়। তবে ভোজসভায় শুধু বাছা বাছা লোকদের ডাকা হচ্ছে, সবচাইতে উঁচু পদের লোক ছাড়া আর কেউ আসতে পাবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এই নিয়ে রাজামশাইয়ের সঙ্গে আমার একটু তর্কাতর্কি হয়ে গেছে। আমি

জোর গলায় বলেছি আজ রাতে ভূত-প্রেতদের পর্যন্ত বলা হবে না। সবার আগে সাগররাজ আর তাঁর মেয়েদের বলতে হবে; তারা অবিশ্যি শুকনো ডাঙায় আসাটা খুব-একটা পছন্দ করে না, তবে আমি কথা দেব যে প্রত্যেককে বসবার জন্য একটা করে ভিজে পাথর, কিম্বা তার চেয়েও ভালো কিছু দেওয়া হবে।

এ কথা শুনলে আমার মনে হয় এবার আর ওদের কোনো আপত্তি থাকবে না। প্রথম শ্রেণীর বুড়ো ট্রোলদের সকলকেই ডাকতে হবে তা ছাড়া নদীর দেওকে আর নিস্‌-পরীদের বলতে হবে। মরণ-ঘোড়া আর কির্কেগ্রিমকে বাদ দেওয়া চলে না। এটা সত্যি যে এরা কেউই আমাদের দলের নয়, কি গম্ভীর রে

বাবা! তবে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, নিয়মিত যাওয়া আসা করে, কাজেই বলতেই হয়।”

দাঁড়কাক বলল, “ক্ক!” এই বলে নেমন্তন্ন পৌঁছে দিতে উড়ে চলল।

টিলার বড়ো সভাঘরটিকে খালি করে নিয়ে তক্‌তকে পরিষ্কার করা হল। চাঁদের আলো দিয়ে মেঝে ধোয়া হল, দেয়ালে কষে ডাইনীর চর্বি ঘষা হল, যতক্ষণ না টিউলিপ ফুলে আলো পড়লে যেমন রঙ বেরোয় সেইরকম ছটা দিতে লাগল। রান্নাঘরে ব্যাঙের শিককাবাব হচ্ছিল; তা ছাড়া আরো কত মুখরোচক জিনিস রান্না হচ্ছিল, যেমন ব্যাঙের-ছাতার বীচি, বিষ-পাতার সুরুয়া ইত্যাদি। কিছু কিছু আগেই হয়ে গেছিল। এই হল প্রথম দিকের পদ। শেষে মিষ্টিমুখ করার জন্য কত কিসের ব্যবস্থা ছিল, মর্চেধরা পেরেক, রঙিন কাঁচের কুচি, এই-সব। তা ছাড়া ছিল সোরার সোরাব, জলার পেত্নীর ঘরে চোলাই করা মদ।

আয়োজন যাতে নিখুঁত হয়, তাই শ্লেট-পেনসিল গুঁড়ো করে, তাই দিয়ে পরীরাজের সোনার মুকুট পালিশ করা হয়েছিল।

সবচেয়ে ছোটো রাজকন্যে বললেন, “বাবা গো, এই-সব গণ্য-মান্য অতিথিরা কারা, তা বলবে না?”

রাজামশাই বললেন, “বেশ, কথাটা আর গোপন করে কি লাভ? ব্যাপারটা কিছুই নয়, আমার মেয়েদের মধ্যে দুজন যেন বিয়ের জন্য তৈরি থাকে! দুজনের নিশ্চয়ই এবার বিয়ে হয়ে যাবে। নরওয়ের ট্রোলদের সর্দার আসছেন। তাঁদের দেশের পাথুরে পাহাড়-পর্বতের মধ্যে তাঁর মেলা প্রাসাদ দুর্গ ইত্যাদি আছে, তা ছাড়া সোনার খনি আছে। সোনার খনি থাকা বড়ো ভালো, এই আমি বলে দিলাম। মোট কথা তিনি এখানে

আসছেন, সঙ্গে আনছেন তাঁর দুই ছেলে, তারা নিজেরা কনে পছন্দ করবে। এই পাহাড়ী সর্দারের মতো সাধু, খোলাখালা, আদর্শ উত্তর দেশবাসী আর হয় না। তার উপর কী অমায়িক আর ফুর্তিবাজ! আমার পুরনো বন্ধু; অনেককাল আগে একবার এসেছিলেন নিজের জন্য কনে দেখতে। শুনেছি নাকি ছেলে দুটো ভারি অভদ্র অসভ্য, তবে শোনা কথা ভুলও হতে পারে। সে যাই হোক, বছর দুই যেতে না যেতেই নিশ্চয় ওদের স্বভাব শুধরোবে।”

ছোটো রাজকন্যে বললেন, “কত শিগ্‌গির আসবে ওরা ?” রাজামশাই বললেন, “সেটা নির্ভর করছে জল-হাওয়ার উপর। ওরা কম খরচে যাতায়াত করে, জাহাজের যেমন সুবিধা পায়। আমার ইচ্ছা ছিল সুইডেন পার হয়ে আসে, তা বুড়ো কিছুতেই রাজি হল না। বড্ডো সেকেলে, ঐ ওর একটিমাত্র দোষ।”

ঠিক সেই সময় দুটো আলেয়া ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এসে হাজির, কে কার আগে আসতে পারে, এই চেষ্টা, খবরটা কে আগে দেবে!

এসেই দুজনে একসঙ্গে বলে উঠল, “আসছে! আসছে!” রাজামশাই বললেন, “দাও দেখি মুকুটটা, চাঁদের আলোয় দাঁড়াই গিয়ে।” সাত রাজকন্যে তখন তাদের লম্বা-লম্বা শালগুলি তুলে ধরে মাটি পর্যন্ত নিচু হয়ে নমস্কার করল।

মাথায় বরফের ঝালর আর পালিশ করা সরলগাছের গুটির মুকুট পরে ট্রোল সর্দার সামনে এসে দাঁড়ালেন। গায়ে ভালুক ছালের পোশাক আর হাঁটু ঢাকা, ভিতরে লোম দেওয়া, শ্লেজ-গাড়িতে চড়বার বুট। তাঁর ছেলেদের কাপড়-চোপড় অনেক হাল্‌কা ধরনের, দুজনারই গলা খোলা। সবাই জানুক যে শীতকে তারা পরোয়া করে না।

বুড়ো বললেন, "দেখ, বাপু, ভদ্র ব্যবহার করবে। যাঁর বাড়িতে এসেছ তিনি যেন আবার ভেবে না বসেন যে তোমরা কখনো ভদ্র সমাজে মেশ নি!"

তার পর সবাই মিলে পরী-টিলার ভিতরে, সেই চমৎকার সভাঘরে গেলেন! সেখানে বাছাই করা উচ্চপদস্থ কয়েকজন বসেছিলেন। প্রত্যেকটি অতিথির আদর-আপ্যায়নের জন্য যতদূর পারা যায় ভালো ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যেমন, সাগর-রাজের পরিবারের সবাই জল-ভরা বড়ো-বড়ো টবে বসে খেলেন। সবাই একবাক্যে বললেন, যে-যার নিজেদের বাড়ির মতো আরামে আছেন, কারও কোনো সঙ্কোচ হচ্ছে না। সকলেই অতি ভদ্র কায়দা-দুরস্ত ভাবে আচরণ করতে লাগলেন, উত্তর-দেশের সেই দুই ট্রোল ছোকরা বাদে। তারা দুজন ভদ্রতা ভুলে টেবিলের উপর ঠ্যাং তুলে দিল।

তাদের বাবা চটে লাল। "এ কি! থালার পাশে ঠ্যাং রাখা! নামা বলছি!" ঠ্যাং নামাল তারা, তবে যতটা তাড়াতাড়ি নামান যেত, ততটা তাড়াতাড়ি নয়। তার পর দুই ছোঁড়া পকেট থেকে সরলগাছের গুটি বের করে, দুজনার মাঝে যে মহিলাটি বসেছিলেন, তাঁর গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। তার পর বুট পায়ে দিয়ে সুবিধা হচ্ছিল না বলে, জুতো খুলে মহিলা বেচারাকে ধরতে বলল! কিন্তু ওদের বাবা, বুড়ো সর্দারের ব্যবহার একেবারে অন্যরকম। কী সুন্দর কথাবার্তা তাঁর! কত কথাই-না বললেন, নরওয়ের আকাশ-ছোঁয়া পাহাড়-পর্বতের কথা, সেখানকার ঝর্নার কথা সেখানে ফিন্‌কি দিয়ে জল ছোটে, ফেনায় ফেনায় সাদা! সে-দেশে ঝড়ের দেবতা তাঁর সোনার বীণায় সুর তুললে, উদ্দাম সাগরের ঢেউ থেকে সামন মাছরা লাফিয়ে ওঠে। তারার আলোয় ভরা শীতের রাতে সেখানে স্লেজ-গাড়ির

ঘণ্টায় সে কী উল্লাস! হাতে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে, বরফের উপর দিয়ে যুবকরা কেমন দৌড়-বাজ খেলে। কাঁচের মতো পাতলা স্বচ্ছ সে বরফ, তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় জলের নীচে মাছরা ভয়ের চোটে পাগলের মতো পাক খাচ্ছে! আরো কত কি বললেন সর্দার, উত্তর দেশের বাহাদুর জোয়ানরা আর সুন্দরী মেয়েরা কেমন সেকালের কথা গান গেয়ে শোনায়, কেমন, হালিঞ্জ নাচ নাচে তারা। কি চমৎকার গল্প বলার ধরন বুড়োর, শুনে মনে হচ্ছিল যেন সব কিছু স্পষ্ট চোখে দেখা যাচ্ছে, কানে শোনা যাচ্ছে।

তার পর পরী-মেয়েদের নাচ দেখাবার জন্য ডাক পড়ল। প্রথমে তারা সহজ নাচ দেখাল; তার পর পা ঠুকে তাল রেখে নাচল; দুরকম নাচই চমৎকার হল। সবার শেষে সবচাইতে কঠিন নাচ। তাকে বলে নাচের সেরা নাচ! সাবাস, সাবাস! মনে হল ওদের পাগুলো যেন টান খেয়ে লম্বা হয়ে উঠেছে! সে কী ঘুর্নি-ঘোরা আর পাক-খাওয়ার ধুম! সে কী দোলন-দোলা, ঝুলন-দোলা, সে কী বোঁ-বোঁ ঘোরা! শেষপর্যন্ত তাই দেখে মরণ-ঘোড়ার এমনি মাথা ঘুরতে লাগল যে সে টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে বাধ্য হল।

পাহাড়ী সর্দার বললেন, "বাহবা! বাহবা! হাত-পা চালাতে তো দারুণ শিখেছে! কিন্তু নাচ ছাড়া আর কিছু জানে না নাকি?"

রাজামশাই বললেন, "সেটা আপনি নিজেই পরখ করে দেখুন-না।" এই বলে বড়ো মেয়েকে ডাকলেন। তার গায়ের রঙ চাঁদের আলোর মতো সাদা, স্বচ্ছ। রাজকন্যে নিজের ঠোঁটের ফাঁকে যেই-না একটা সাদা কাঠি রাখলেন, অমনি তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঐ তাঁর বিদ্যে।

কিন্তু পাহাড়ী সর্দার বললেন, "বাবা! এমন বিয়ে বৌয়ের না থাকাই ভালো! আমার ছেলেদেরও বোধ হয় সেই মত।"

দ্বিতীয় রাজকন্যে ছায়ার মতো নিজের পাশে পাশে হাঁটতে পারতেন। ছোটো পরীদের কিম্বা ট্রোলদের ছায়া থাকে না।

তৃতীয় রাজকন্যের অন্যরকম গুণ। জলার পেত্নীর কাছ থেকে তিনি মদ চোলাই শিখেছিলেন। তা ছাড়া জোনাকি পোকা দিয়ে অল্ডার গাছের ডালে তেল লাগাতে জানতেন। বুড়ো সর্দার বললেন, "এ মেয়ে খুব ভালো গিন্নী হবে।"

চতুর্থ কন্যা নিয়ে এল একটা মস্ত সোনার বীণা, তাতে একটু তান ধরতেই সভার সকলে বাঁ পা তুললেন—ছোটো পরীরা সর্বদা বেঁয়ো হয়—দ্বিতীয় তান ধরতেই রাজকন্যে যা বলেন তাঁদের তাই করতে হল!

বুড়ো ট্রোল সর্দার বললেন, "বাপ্ রে, কী সর্বনেশে বিদ্যা!" তাঁর দুই ছেলেই পত্রপাঠ উঠে পড়ে, পরী-টিলা থেকে পিট্টান দিল! এদের বিয়ে জাহির দেখে তাদের বিরক্তি ধরে গেছিল।

পাহাড়ী সর্দার বললেন, "তার পরের কন্যে কি করতে পারে?"

সে বলল, "আমি উত্তর দেশকে ভালোবাসতে শিখেছি। সেখানে বিয়ে না হলে, আমি বিয়েই করব না।"

সবার ছোটো রাজকন্যে তখন বুড়োর কানে কানে বললেন, "তার কারণ হল দিদি একটি পুরনো ছড়া শুনেছে, তাতে আছে যে, পৃথিবী যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, নরওয়ের পাহাড়-পর্বত তখনো ধ্বংসের মাঝখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। ও মরণকে বড়ো ভয় করে, তাই নরওয়ে যেতে চায়।"

পাহাড়ী সর্দার বললেন, "ওহো, এই বুঝি ব্যাপার! কিন্তু সবার ছোটো সপ্তম রাজকন্যে কি করতে পারে শুনি?"

পরীদের রাজামশাই বললেন, "আহা, সপ্তমের আগে তো ছয় নম্বরের পালা।" রাজার গোনায় কখনো ভুল হত না। ছয় নম্বরের কিন্তু এগিয়ে আসার খুব একটা ইচ্ছা দেখা গেল না। সে বলল, "আমি খালি সবাইকে সত্যি কথা বলতে পারি। আমার জন্য কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি আমার কবর-ঢাকা সেলাই করে আর কিছু করার সময় পাই না।"

তার পর সবার ছোটো সপ্তম রাজকন্যের পালা। তিনি পরীদের গল্প বলতে পারতেন, যত শুনতে চাও তত।

পাহাড়ী সর্দার বললেন, "এই দেখ আমার হাতের পাঁচটা আঙুল, একেকটার জন্য একেকটা গল্প বল দিকিনি।"

ছোটো পরীদের রাজকন্যে তখন তাঁর হাতের কব্জিটি-না ধরে একটার পর একটা গল্প বলতে লাগলেন। হাসতে হাসতে সর্দারের পেটে খিল ধরে গেল। গল্প বলতে বলতে রাজকন্যে যখন বুড়োর আংটি পরার আঙুলে পৌঁছলেন—আঙুলটা মনে হল আগে থেকেই জেনে রেখেছিল যে একটা আংটির দরকার হবে—তখন সর্দার বলে উঠলেন, "রোখো! এই হাতটাই তোমাকে দিলাম। আমি নিজেই তোমাকে বিয়ে করব। বাকি গল্পগুলো শীতকালের জন্য তুলে রাখ। তখন শোনা যাবে। আমরা, নরওয়ের লোকরা, পরীদের গল্প শুনতে বেজায় ভালোবাসি আর তোমার মতো এমন ভালো গল্প কেউ বলতে পারে না। শীতকালে আমরা আমাদের পাথরের ঘরে বসব, উনুনে ঝাউ-গাছের গুঁড়ি দাউদাউ করে জ্বলবে, মট্‌মট্‌ করে ফাটবে; সেকালে নর্স রাজাদের সোনার শিঙায় ভরে মদ খাব—কী মজাই না হবে। আরে! ছেলেদুটো গেল কোথায়?"

কোথায় আবার যাবে? তারা তখন মাঠেঘাটে আলেয়া তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল! সে বেচারিরা সবে মশাল-মিছিলের জন্য তৈরি হচ্ছিল!

বুড়ো বললেন, "এরকম দাঙ্গা-হাঙ্গামা করার মানেটা কি শুনি? এতক্ষণ আমি তোমাদের জন্য একটা মা পছন্দ করতে ব্যস্ত ছিলাম। এবার এসো দিকি বাছাধনরা, মাসিদের মধ্যে থেকে একটা করে বৌ বেছে নাও।"

ছেলেরা বলল বিয়েটিয়ে তাদের দিয়ে হবে না, তার চাইতে বরং তারা বক্তৃতা দিতে আর অভিনন্দন করতে রাজি আছে। শেষপর্যন্ত তাই হল; ছেলেগুলো বক্তৃতা দিল, অভিনন্দন জানাবার জন্য টপাটপ্ মদের গেলাস খালি করে, টেবিলের উপর সারি সারি সাজিয়ে রাখল, যাতে সবাই বুঝতে পারে গেলাসগুলো খালি। তার পর গায়ের জামা খুলে, আদব-কায়দা ভুলে, টেবিলের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, ভোঁস্-ভোঁস্ করে ঘুমুতে লাগল। এদিকে বুড়ো সর্দার নতুন বৌয়ের সঙ্গে সভা-ঘরের চারদিক ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগলেন। তার পর বুট বদল করে বিয়ে হল; তাতে আংটি বদলের মতো অতটা অভদ্রতা হয় না।

তার পর যে ভদ্রমহিলা রাজামশাইয়ের সংসার দেখতেন, তিনি এসে বললেন, "ঐ শোনো, মোরগ ডাকছে। এবার তাড়াতাড়ি করে জানলার খড়খড়ি বন্ধ করা যাক, নইলে রোদ ঢুকে আমাদের গায়ের রঙ ঝলসে দেবে!"

তখন পরী-টিলা বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে কিন্তু সেই ফাটল-ধরা গাছের গুঁড়িতে গিরগিটিরা তখনো ছুটে ছুটে একবার উঠছে, একবার নামছে! তারা সবাই বলল, "বুড়ো ট্রোল্ সর্দার কিন্তু খাসা লোক!" শুধু কেঁচো বলল, "না বাপু, আমার ঐ ছেলেদুটোকে বেশি পছন্দ।" তবে সে বেচারা তো আর ছেলেদেরও দেখে নি, তাদের বাপকেও দেখে নি, কাজেই তার মতামতের কতটুকুই-বা দাম!

ঝাউগাছের কথা

অনেক দূরে ঘোর বনের মাঝখানে, এক ঝাউগাছ গজালো। তার সারা গায়ে রোদ লাগত, তার চারদিকে খোলা বাতাস খেলে বেড়াত। আশেপাশে তারই মতো আরো অনেক ঝাউগাছ ছিল, কেউ ওর চেয়ে বড়ো, কেউ ছোটো। কিন্তু ছোটো ঝাউগাছের মনে সুখ ছিল না। ওর সদাই ইচ্ছা আরো উঁচু হয়। গরম রোদ, খোলা বাতাসের কথা একবার ভাবতও না। চাষীদের ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা বনে ফল কুড়ুতে এসে কত হাসত, কত গল্প করত, ও তাদের দিকে ফিরেও তাকাত না। ঘটে জল ভরা আর খড়ের সুতোয় ছোটো-ছোটো ফল গাঁথা হয়ে গেলে, ওরা মাঝে-মাঝে ছোটো ঝাউগাছটিকে ঘিরে বসে বলত, "এই ছোটো ঝাউগাছটি বড়ো সুন্দর!" তাই শুনে ছোটো ঝাউ-গাছ বেজায় বিরক্ত হত।

দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে সে বলত, "আহা, যদি দাদাদের মতো উঁচু হতাম, তা হলে ঐ অত দূর অবধি ডালপালা মেলে দিতাম আর সবার উপরে মগডালটি তুলে চারদিকের বিশাল জগৎটাকে কেমন দেখতাম! পাখিরা এসে আমার ডালপালায় বাসা বাঁধত। বাতাস বইলে আমার দাদাদের মতো আমিও সগর্বে মাথা নুইয়ে ভদ্রতা করতাম।

গায়ে মিঠে সূর্যের আলো লাগলে, পাখিদের গান শুনলে, সকাল সন্ধ্যায় মাথার উপর দিয়ে লালচে মেঘ বয়ে গেলে, ঝাউ-গাছ এতটুকু আনন্দ পেত না।

শীতকালে মাটিটা সাদা ঝক্‌ঝকে বরফে ঢেকে যেত। তখন একটা খরগোস বেরিয়ে এসে ছুটোছুটি করত, কখনো-বা ক্ষুদে ঝাউগাছের মাথার উপর দিয়েও লাফিয়ে যেত; তাতে ঝাউ যা চটত! এইভাবে দুটো শীত কাটল। তৃতীয় শীত যখন এল, ঝাউগাছ এতটা উঁচু হয়ে উঠেছে যে খরগোসকে তার চারদিক ঘুরে দৌড়তে হত, মাথা ডিঙোবার জো ছিল না। গাছটা কেবলই ভাবত, 'আহা, আরো বাড়ব, আরো অনেক বাড়ব, এই এত উঁচু হব, বয়স হবে, নইলে পৃথিবীতে বেঁচে থেকে কি লাভ!'

হেমন্তকালে কাঠুরেরা এসে সবচাইতে বড়ো-বড়ো গাছগুলোর কয়েকটাকে কেটে ফেলল। প্রত্যেক বছরেই এমনি হত। ততদিনে ছোটো ঝাউগাছটিও দিব্যি উঁচু হয়ে উঠেছিল, ঐ বিশাল বিশাল সুন্দর গাছগুলোকে ভীষণ শব্দ করে, ঝোপঝাড় ডালপালা ভেঙে মাটিতে পড়তে দেখে, বেচারা শিউরে উঠত। মাটিতে পড়বার পর, গাছগুলির ডালপালা সব কেটে ফেলা হত; কাণ্ডটাকে বিশ্রী ন্যাড়া, রোগা, লম্বা দেখাত; চেনাই যেত না। তার পর বড়ো-বড়ো গাড়িতে একজনের উপর একজনকে চাপানো হত। শেষে গাড়িগুলোকে ঘোড়ায় টেনে নিয়ে যেত জঙ্গলের বাইরে, অনেক দূরে, কোথায় কে জানে!

কোথায় যাচ্ছে, তাদের কপালে কি আছে কে বলবে?

পরের বছর বসন্তকালে, দোয়েল ফিঙে সারসরা যখন বিদেশে শীত কাটিয়ে আবার ফিরে এল ছোটো ঝাউ তাদের জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কি জানো গাছগুলিকে কেটে কোথায় নিয়ে গেল?"

দোয়েল ফিঙেরা কিছুই জানত না। সারস একটু ভেবে নিয়ে, মাথা নেড়ে বলল, "মনে হচ্ছে যেন দেখেছি ওদের। মিশর দেশ থেকে এখানে আসবার পথে, অনেক জাহাজ দেখলাম, তাদের মাস্তুলগুলো কী উঁচু, কী চমৎকার! ঐ নিশ্চয়ই তোমার সেই ঝাউগাছ, সেইরকম গন্ধও পেলাম। আহা, কি অপূর্ব ভঙ্গিতে জাহাজগুলো ভেসে যাচ্ছিল, তাই তোমাদের অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।"

"আহা, আমি যদি ঐরকম উঁচু হতাম, তা হলে আমিও সাগরের বুকে ভেসে পড়তাম। বলো-না, ঐ সাগর জিনিসটি কিরকম, সে দেখতে কেমন?"

সারস বলল, "আরে না, না, অত সব বলতে গেলে মেলা সময় লাগবে।" এই বলে খুট্‌খুট্‌ করে সে সরে পড়ল।

সূর্যের কিরণ বলল, "তোমার এই নবীন বয়সের জন্য খুশি হও, ভাই। কি সজীব তুমি, তোমার ডালপালায় প্রাণের স্রোত বইছে, তাই আনন্দ কর।"

বাতাস এসে ঝাউগাছকে চুমো খেল, শিশির কত চোখের জল ফেলল; ঝাউগাছ কিন্তু তার কিছুই বুঝল না।

তার পর বড়োদিন কাছে এল, তখন বেশ ছোটো-ছোটো অনেক গাছ কাটা হল। সে-সব গাছের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের ঐ অস্থির ঝাউগাছটির মতোই লম্বা, কিম্বা তার চেয়েও ছোটো। এদিকে আমাদের গাছ তো অন্য কোথাও যেতে পারলে আর কিছু চায় না। বেছে বেছে সবচাইতে সুন্দর দেখতে গাছগুলিকে কাটা হল! ওদের ডালপালা ছাঁটা হল না; একটি ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে চাপিয়ে ওদের বনের বাইরে অনেক অনেক দূরে নিয়ে যাওয়া হল।

আমাদের ঝাউগাছ জিজ্ঞাসা করল, "ওরা কোথায় যাচ্ছে?

ওরা তো আমার চেয়ে লম্বা নয়, একজন তো দস্তুরমতো বেঁটে ! ওদের ডালপালা ছাঁটিল না কেন ? কোথায় গেল কে জানে ?”

চড়াইরা অমনি কিচির-মিচির করে উঠল, “আমরা জানি ! আমরা জানি ! নীচের শহরের বাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেছি ! কোথায় গেছে আমরা জানি ! আহা, ওদের কত আদর, কি সম্মান, সে তুমি ভাবতেই পার না ! জানলার শার্সী দিয়ে দেখলাম একটা গরম ঘরে নিয়ে গিয়ে টবে পুঁতে ওদের সারা গায়ে কী সুন্দর সুন্দর জিনিস ঝুলিয়ে সাজানো-গোজানো হল, রাঙতা মোড়া আপেল, মিষ্টি, খেলনা আর শত শত ঝলমলে মোমবাতি !”

ঝাউগাছ বলল, “তার পর ? তার পর ? তার পরে কি হল ?”

“কি জানি, তার বেশি কিছু দেখি নি ! কিন্তু যা দেখলাম সে যে কী সুন্দর, কী যে সুন্দর, তার তুলনা হয় না !”

আহ্লাদে গলে গিয়ে ঝাউগাছ বলল, “আহা, আমার কপালেও কি এত সম্মান লেখা আছে ? সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলার চেয়ে এ যে অনেক বেশি ভালো। আমার যে আর তর সয় না। আবার কবে বড়োদিন আসবে ! এখন আমি মাথায় উঁচু হয়েছি, কত ডালপালা আমার, গত বছর যাদের কেটে নিয়ে গেছিল, ঠিক তাদের মতোই ; এক্ষুণি যদি সেই গাড়িতে চাপতে পারতাম, সেই গরম ঘরটিতে গিয়ে যদি সেই-রকম আদরযত্ন পেতাম ! তার পরে—তার পরে নিশ্চয়ই আরো ভালো কিছু হয়, নইলে অত সাজাবে-গোজাবে কেন ? নিশ্চয়ই তার চেয়েও সুন্দর, তার চেয়েও জমকাল কিছু হয়—কিন্তু সেটা কি ? উঃ, এ কি জ্বালা, আগ্রহের কি জ্বালা ! আমার মনের মধ্যে কেমন হচ্ছে, সে আমি ভাষায় বলতে পারছি না !”

তখন বাতাস আর রোদ তাকে বলল, "আমরা তোমাকে ভালোবাসি, তাই জেনে সুখী হও। তোমার এই তরুণ বয়স, এই স্বাধীনতা নিয়ে আনন্দ কর!"

কিন্তু আনন্দ করা ওকে দিয়ে হল না। কি শীতে কি গ্রীষ্মে গাছটি কেবলই বাড়তে লাগল ; গাঢ় সবুজ পাতায় সেজে, যেন সবুজ পোশাক পরে, বনের মাঝখানে তার সে কী শোভা! যারাই তাকে দেখত তারাই বলত, "আহা, কী সুন্দর গাছ!" তার পরের বছর বড়োদিনের আগে সব গাছের আগে ওকেই কাটা হল। তার কাঠের গায়ে যেই কুড়ুলের কোপ পড়ল, গভীর একটা ব্যথার শব্দ করে গাছটি পড়ল মাটিতে। এত বেদনা, এত দুর্বলতা সে আশাই করে নি। এখন তার সৌভাগ্যের কথা মনেই পড়ল না, এই তার চিরদিনের আবাস, তার জন্মস্থান ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে মনটা দুঃখে ভরে গেল।

মনে মনে সে বুঝল আজন্মের এই-সব প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে, ওরই ছায়ায় যে-সব ছোটো-ছোটো ঝোপঝাপ, ফুলের গাছ বেড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে, এমন-কি, হয়তো পাখিদের সঙ্গেও আর কখনো দেখা হবে না। গাড়ি চড়ে যেতেও এতটুকু ভালো লাগল না।

অন্য গাছদের সঙ্গে তাকে একটা উঠোনে নিয়ে ফেলা হল। সেখানে একজন লোকের কথা শুনে তার প্রথম চেতনা হল। সে লোকটি বলল, "বাঃ, এই তো খাসা একটি গাছ, ঠিক এমনটিই তো আমরা খুঁজছিলাম।"

তার পর ফিটফাট পোশাক পরা দুজন চাকর এসে ঝাউ-গাছটিকে কাঁধে করে চমৎকার একটা মস্ত বৈঠকখানায় নিয়ে গেল। ঘরের দেয়ালে কত ছবি, তাকের উপরে বড়ো-বড়ো চীনে

ফুলদানি, তাদের ঢাকনিতে সিংহের নক্‌শা করা। কত দোলা-কেদারা, রেশমী কৌচ, টেবিলে কত ছবির বই, কত খেলনা!

মস্ত একটা বালি ভরা পিপের মধ্যে ঝাউগাছটাকে পোঁতা হল। সবুজ কাপড়ে জড়িয়ে নানা রঙের নক্‌শা করা গালচের উপর যখন সেটাকে বসানো হল, পিপে বলে চেনে কার সাধ্যি! গাছটা তো কেঁপেই অস্থির। এর পর না জানি কী হবে! একজন অল্পবয়সী মেয়ে এসে তাকে সাজাতে বসল, চাকররা তাকে সাহায্য করতে লাগল। রঙিন কাগজ কেটে ছোটো-ছোটো সাজি বানিয়ে, তাতে ফলের মোরব্বা ভরে, ডালে ডালে ঝুলিয়ে দিল। কোথাও-বা রাঙতা মোড়া আপেল কিম্বা আখরোট ঝোলালো! দেখে মনে হচ্ছিল যেন সেগুলো ঐভাবেই ফলেছে। তা ছাড়া একশোর বেশি ক্ষুদে-ক্ষুদে লাল নীল সাদা মোমবাতি ডালপালার মধ্যে এখানে ওখানে বসিয়ে দিল। কত পুতুল, দেখতে যেন সত্যিকার মানুষ, পাতার রাশির মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে; ঝাউগাছ এমনটি দেখে নি কোনোদিনও। আর সবার উপরে, একেবারে গাছের মগডালে সোনালি রাঙতার তৈরি মস্ত একটি তারা! বাস্তবিক এত সাজ, এত শোভার তুলনা হয় না।

ওরা বলাবলি করছিল, "আজ সন্ধেবেলায় সব আলোগুলো জেলে দেওয়া হবে।"

গাছ ভাবল, 'আহা, এখনি যদি সন্ধেবেলা হত! আহা, সব আলো যদি জেলে দেওয়া হত! তা হলে—তা হলে কি হত? বন থেকে কি গাছরা সবাই আমাকে দেখতে আসবে? চড়াইরা কি উড়ে এসে জানলার কাঁচের ভিতর দিয়ে আমাকে দেখবে? আমি কি এইরকম সেজেগুজে সারা শীত, সারা গ্রীষ্ম কাটাব?'

কেবলই ঐ এক ভাবনা। ভাবতে ভাবতে গাছের ছালে

ব্যথা ধরে গেল, তাতে আমাদের মাথা ধরলে যেমন কষ্ট পাই, গাছেরও তেমনি কষ্ট হয়।

শেষে মোমবাতিগুলো সত্যি জ্বালানো হল। সে কী আলোর ছটা! গাছটির ডালপালা উত্তেজনার চোটে কাঁপতে লাগল। একটি ডালে আগুন ধরে গেল! অল্পবয়সী মেয়েটি বলল, "ও মা ও কি হল!" তাড়াতাড়ি আগুন নিবিয়ে দেওয়া হল।

ভয়ের চোটে গাছটার কাঁপবারও জো রইল না। তার মনে বড়ো ভয়, কি জানি, শেষটা যদি সাজসজ্জা নষ্ট হয়! এত ঘটা, এত আলো দেখে বেচারি হকচকিয়ে গেছিল। অবশেষে হঠাৎ দুই ঘরের মাঝখানের মস্ত-মস্ত দরজা দুটি হাট করে খুলে দেওয়া হল, একদল ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়ে হুড়্মুড়্ করে ঘরে এসে ঢুকল; তাদের উৎসাহ দেখে মনে হল এই বুঝি গাছের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! বড়োরা ধীরে সুস্থে ঘরে ঢুকলেন। এক মুহূর্তকাল ছোটোরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর তাদের ফুর্তি দেখে কে! এমনি চ্যাঁচাতে লাগল সবাই যে দেয়ালগুলো গম্‌গম্ করে উঠল। তার পর গাছের চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে কী নাচ! একটি একটি করে উপহার গাছ থেকে পেড়ে ফেলা হল।

গাছ ভাবল, 'ও কি! ওরা করছে কি! এবার তা হ'লে কি হবে?' মোমবাতিগুলো জ্বলে জ্বলে ফুরিয়ে এসেছিল, পাছে ডালপালায় আগুন লেগে যায়, তাই সেগুলোকে নিবিয়ে দেওয়া হল। ছেলেমেয়েদের বলা হল, গাছের সাজসজ্জা যার যা খুশি পেড়ে নিতে পারে। অমনি তারা গাছের উপর হুড়্মুড়্ করে পড়ল, ডালপালাগুলো চড়্চড়্ করে উঠল। ভাগ্যিস মগডালের তারাটি ছাদের সঙ্গে ঝক্‌ঝকে মালা দিয়ে বাঁধা ছিল, নইলে গাছটাই উলটে পড়ত আর কি!

গাছের চারদিকে ছেলেমেয়েরা তাদের সুন্দর সুন্দর খেলনা নিয়ে নেচে-কুঁদে হেসে-খেলে বেড়াতে লাগল। কিন্তু শুধু বুড়ি ধাই-মা ছাড়া গাছের কথা কারও মনেও এল না। ধাই-মা এসে ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল, অবিশ্যি তার মনে শুধু একটি কথাই ছিল, যদি ফাঁকতালে একটি পাকা ডুমুর কিম্বা আপেল খুঁজে পায়।

একটা মোটা বেঁটে লোককে গাছের দিকে টানতে টানতে ছেলেমেয়েরা বায়না ধরল, "গল্প বলো, গল্প বলো!" লোকটি গাছ-তলায় বসে পড়ে বলল, "বাঃ, সবুজ ডালপালার তলায় বসতে কি আরাম! তা ছাড়া আমার গল্প শুনলে এই গাছটিরও উপকার হতে পারে। কিন্তু শুধু একটি গল্প বলব। কোনটা শুনতে চাও, ইবেদি-আবেদির গল্প, নাকি সেই যে হাম্পটি-ডাম্পটি ধুপ্ করে একতলায় পড়েও রাজ্য আর রাজকন্যে পেয়েছিল, তার গল্প?"

কয়েকজন চ্যাঁচাতে লাগল, "ইবেদি-আবেদির গল্প!" আবার কেউ-বা বলল, "হাম্পটি-ডাম্পটির গল্প।" মহা হট্টগোল শুরু হল!

খালি ঝাউগাছ চুপ করে ভাবছিল, 'আমারও কি ওদের মতো চ্যাঁচামেচি করা উচিত? নাকি কিছু না করাই ভালো?' সেও তো ওদের দলের একজন, তার যা যা করবার কথা ছিল সবই তো সে করেছে।

মোটা বেঁটে লোকটি হাম্পটি-ডাম্পটির গল্প বলল। হাম্পটি-ডাম্পটি একতলায় গড়িয়ে পড়লেও, রাজ্য আর রাজকন্যে দুইই পেয়েছিল। গল্প শুনে ছেলেমেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল। তার পর আরো গল্পের বায়না ধরল। ওদের ইবেদি-আবেদির গল্পটিও শোনার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে আর হল না।

এদিকে ঝাউগাছ গল্প শুনে চুপ করে ভাবতে লাগল!

বনের পাখিরা তো কখনো এমন কথা বলে নি। ঝাউগাছ মনে মনে বলল, 'হাম্পটি-ডাম্পটি একতলায় পড়ে গেছিল, তবু সে সিংহাসনে উঠল, রাজকন্যেকে পেল! পৃথিবীতে কী আশ্চর্য ঘটনাই-না ঘটে!' তার ধারণা ঐরকম ভালোমানুষ যখন রয়েছে; তখন গল্পটি নিশ্চয় সত্যি। সে ভাবল, 'কে জানে, আমিও হয়তো একদিন পড়ে গিয়ে, তার পর রাজকন্যে পাব!'

তার মনে ভারি আনন্দ, সে আশায় আশায় রইল যে পরদিন আবার তাকে মোমবাতি আর খেলনা, রাঙতা আর নানারকম ফল দিয়ে সাজানো হবে। সে মনে মনে ঠিক করল, 'কাল আর কেঁপে-টেঁপে একসা হব না! কাল সাজগোজ নিয়ে আনন্দ করব। কাল আবার হাম্পটি-ডাম্পটির গল্প শুনব; কে জানে হয়তো ইবেদি-আবেদির গল্পও শুনব।' এই সুখের স্বপ্নেই গাছ রাত কাটাল।

সকালবেলায় দাসীরা এল। গাছ ভাবল, 'এবার আমার নতুন করে সাজসজ্জা শুরু হবে!' কিন্তু তারা করল কি, ওকে ধরে টেনে হিঁচড়ে সিঁড়ির ওপরে চিলেকোঠার ঘরে তুলে, একটি অন্ধকার কোণে গুঁজে রাখল। সেখানে এক চিলতে আলো পর্যন্ত পৌঁছয় না। গাছ মনে মনে বলল, 'এর কি কোনো মানে হয়? এখানে করবটাই-বা কি আর শুনবটাই-বা কি?' এই বলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে প্রাণপণে ভাবতে লাগল। ভাববার সময়ও পেল ঢের; দিনের পর দিন গেল, রাতের পর রাত কাটল, চিলেকোঠার ঘরে কারও পা পড়ল না। শেষটা একদিন একজন কেউ এল বটে, কিন্তু এক পাশে কয়েকটি তোরঙ্গ ঠেসে দিয়েই সে চলে গেল। গাছটি এবার একেবারে আড়াল হয়ে গেল; তার মনে হল সবাই তার কথা ভুলেই গেছে।

গাছ ভাবল, 'আবার শীত এসেছে, বাইরের মাটি বরফে ঢাকা, বেজায় শক্ত। এখন আমাকে মাটিতে পোঁতা যাবে না, সেই বসন্তকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। মানুষরা বড়ো ভেবেচিন্তে কাজ করে। তবে এত অন্ধকার আর এমনি বেজায় একলা না হলে বেশ হত।

ঠিক সেই সময় কিচ্‌কিচ্‌ শব্দ করে ছোট্টো একটি ইঁদুর এগিয়ে এল! তার পিছনে আরেকটি। তারা ঝাউগাছের আশেপাশে ছোঁকছোঁক করে খানিক শুঁকে বেড়ালো, তার পর ডালপালার মধ্যে ছুটোছুটি করতে লাগল।

তারা বলল, "বাপ্‌-রে, কী শীত!
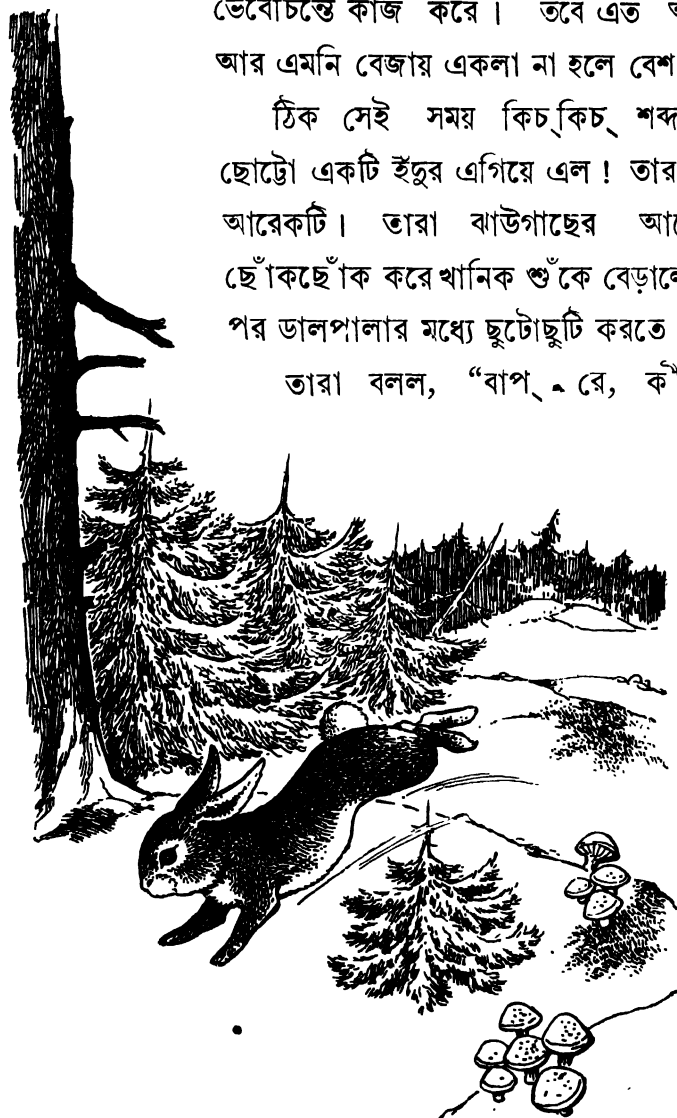
নইলে এ জায়গাটা বেশ আরামের ছিল, কি বল বুড়ো ঝাউগাছ ?”

ঝাউগাছ বলল, “আমি কিছু বুড়ো নই। আমার চাইতে ঢের ঢের বুড়ো অনেকে আছে।”

তারা জিজ্ঞাসা করল, “তা তুমি এখানে এলে কি করে ? কি কি জানো তুমি ?” তাদের বেজায় কৌতূহল। “বলো-না পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে ভালো জায়গাটা কোথায় ! সেখানে কখনো গেছ নাকি ! ভাঁড়ারঘরে গেছ কখনো ? সেখানে তাকের ওপর গোটা গোটা পনীর পড়ে থাকে, ছাদ থেকে শুকনো মাংস ঝোলে। সেখানে চর্বি দিয়ে তৈরি মোটা-মোটা মোমবাতির ওপর নাচানাচি করা যায় ; সেখানে রোগা হয়ে ঢুকে, মোটা হয়ে বেরিয়ে আসা যায় !”

গাছ বলল, “কই, না তো, ও-সব কথার তো আমি কিছুই জানি না ! তবে বনকে জানি, সেখানে সূর্য রোদ দেয়, পাখিরা গান গায়।” তার পর সে তার ছোটোবেলাকার কথা বলতে লাগল, কি আনন্দেই না ছিল তখন। ইঁদুররা এরকম কথা জন্মে শোনে নি ! তারা খুব মন দিয়ে সব শুনে বলল, “বাঃ, বাঃ, যা বলেছ ! কত কি দেখেছ ভাই, কি আনন্দেই না দিন কাটিয়েছ !”

গাছ অবাক হয়ে বলল, “আনন্দে ?” তার পর তাদের কথাটি নিয়ে একটু ভেবে আবার বলল, “তা মোটের ওপর আনন্দেই দিন কাটত !” তখন সে ইঁদুরদের কাছে সেই বড়ো-দিনের উৎসবের কথাও বলল, তাকে কেমন মোমবাতি দিয়ে, মিষ্টি দিয়ে সাজানো হয়েছিল।

ছোটো-ছোটো ইঁদুরগুলো তো অবাক ! “ইস্, কি মজাই না করেছ, বুড়ো ঝাউগাছ !”

ঝাউগাছ আবার বলল, “মোটেই আমি বুড়ো নই। মাত্র গত শীতকালে বন ছেড়েছি; এই তো আমার উঠতি বয়স!”

ইঁদুররা বলল, “বাঃ, তুমি কী সুন্দর কথা বলো ভাই!”

পরদিন রাতে ইঁদুররা আবার এল, সঙ্গে নিয়ে এল আরো চারটে ইঁদুর, তারাও গাছের জীবনের গল্প শুনতে চায়। যতই না গাছ বনের মধ্যে তার ছোটোবেলার কথা বলে, ততই তার আরো স্পষ্ট করে সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে যায়। গাছ বলল, “হ্যাঁ, সে বড়ো সুখের সময় ছিল, তবে আবার সে দিন ফিরে আসতে পারে, আবার ফিরে আসতে পারে। হাম্পটি-ডাম্পটি নীচের তলায় পড়ে গেল, তবু সে রাজকন্যে পেল; কে জানে, আমিও হয়তো একদিন রাজকন্যে পাব!” অমনি তার সেই বনের একটি সুন্দর কচি বার্চগাছের কথা মনে পড়ে গেল। ঝাউগাছের মনে হল সে-ই একজন রাজকন্যের মতো, কী সুন্দর সে-ই রাজকন্যে! ক্ষুদে ইঁদুররা জিজ্ঞাসা করল, “আচ্ছা, এই হাম্পটি-ডাম্পটিটি আবার কে?” তখন ঝাউগাছ ওদের হাম্পটি-ডাম্পটির কথা বলল। গল্পটির প্রত্যেকটি কথা তার মনে ছিল। শুনে আনন্দের চোটে তারা গাছের মাথায় চড়ে বসে আর কি! পরের রাতে আরো অনেকগুলো নেংটি ইঁদুর এল; রবিবার দিন তাদের সঙ্গে এল দুটো বড়ো ইঁদুর। তারা কিন্তু গল্প শুনে বলল, “এ কি বাজে গল্প!” ছোটো ইঁদুররা তাতে চটে গেল! কিন্তু তাদের কথা শোনার পর ওদেরও আর গল্পটাকে তেমন ভালো লাগল না!

বড়ো ইঁদুররা জিজ্ঞাসা করল! “তুমি কি শুধু ঐ একটি গল্পই জানো নাকি?”

গাছ বলল, “হ্যাঁ, ভাই, ঐ একটাই জানি। আমার

জীবনের সবচাইতে সুখের সন্ধ্যায় ঐ গল্পটি শুনেছিলাম। অবিশ্যি তখন আমি নিজেই জানতাম না আমি কত সুখী।"

"কি যা তা গল্প! শুকনো মাংস কি চর্বির মোমবাতির গল্প জানো না? ভাঁড়ারঘরের কথা বলতে পারো না?"

গাছ বলল, "না, ভাই।"

বড়ো ইঁদুররা বলল, "ঢের হয়েছে, আর শুনে কাজ নেই!" এই বলে যে যার পথ দেখল। ছোটো ইঁদুররাও আর এল না। গাছ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "বেশ লাগত, ওরা কেমন আমাকে ঘিরে বসে আমার কথা শুনত, এদিকে কেমন চুলবুলে চটপটে সব। এখন সে-সবই চুকেবুকে গেল। যাই হোক, এখান থেকে যখন আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে, এ-সব কথা মনে করতে ভালোই লাগবে।"

কিন্তু সেদিন কবে আসবে? একদিন সকালে লোকজন এসে চিলেকোঠা সাফ করতে লেগে গেল। তোরঙ্গগুলোকে সরানো হল, গাছটিকেও কোনা থেকে টেনে বের করা হল। ওকে ওরা অযত্নে মাটিতে ফেলে রেখেছিল কিন্তু একজন চাকর ওকে তুলে নীচে নিয়ে গেল। আবার সে আলোর দেখা পেল। গাছ ভাবল, 'এই আমার নতুন জীবন শুরু হল।' গায়ে খোলা হাওয়া লাগল, নরম রোদ লাগল। তাকে আবার টেনে উঠোনে এনে ফেলা হল। সব কিছু এমনিই তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে গাছটির আর নিজের দিকে তাকাবার কথা মনেই হল না। চারদিকে তাকিয়ে দেখবার মতো কত জিনিস। উঠোনের পাশেই বাগান। সেখানকার সব কী সবুজ, কী সুন্দর! বেতের বেড়ার উপর থোপা থোপা গোলাপ ফুল, কী তাদের রঙের বাহার, কি-বা সুগন্ধ! লেবুগাছ ফুলে ভরা, সোয়ালো পাখিরা কিচির-মিচির করতে করতে একবার আসছে, একবার যাচ্ছে।

ঝাউগাছের মন আশার আনন্দে ভরে উঠল। 'আমি বাঁচব! আমি বাঁচব!' ডালপালাগুলিকে সে মেলে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু হায়, সেগুলি শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছিল! আগাছা আর বিছুটির গাদার উপর ঝাউগাছকে ওরা ফেলে রাখল। তার মাথার উপরে যে সোনালি রাঙতার তারা পরানো ছিল, রোদ লেগে সেটি ঝক্‌মক্ করে উঠল। আশেপাশে যারা ছিল, তার মধ্যে সবচাইতে ছোটো যারা, তাদের একজন সোনালি রঙের তারাটিকে দেখতে পেয়ে, সেটাকে খুলে নেবার জন্য ছুটে এল।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, "দেখ, দেখ, বিশ্রী পুরনো গাছটির মাথায় এখনো তারাটি আটকে আছে!" গাছের ডালপালা মাড়িয়ে ভেঙে ছেলেটি একাকার করল।

ঝাউগাছ তখন বাগানের ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখল, কী তাদের শোভা, কী সজীব, সুন্দর! নিজের দিকে তাকিয়েই মনে হল, 'হায়, হায়, এর চাইতে যে চিলেকোঠার অন্ধকার কোণে পড়ে শুকিয়ে মরাও শত গুণে ভালো ছিল!' কত কথাই তার মনে পড়ল, বনের মাঝে সেই সুখের জীবনের কথা, বড়োদিনের উৎসবের আনন্দের কথা, সেই ছোটো-ছোটো ইঁদুরদের কথা, আহা ওদের হাম্পটি-ডাম্পটির গল্প বললে, কি আগ্রহেই না শুনত!

গাছ বেচারি মনে মনে বলতে লাগল, 'সব গেল, সব গেল! আহা কত সুখীই-না হতে পারতাম! এখন সব শেষ।'

তার পর চাকররা এসে গাছটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল। তার পর টুকরোগুলো এক জায়গায় জড়ো করে, তাতে আগুন লাগিয়ে দিল। গাছের বুক থেকে গভীর বেদনার শব্দ বেরিয়ে এল, মনে হল যেন পটকা ফাটছে। ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এসে, আগুনের সামনে লাফালাফি করতে লাগল।

একেকটি বেদনার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গাছটির কিন্তু কত কি মনে পড়তে লাগল, বনের মাঝে একটি রোদে ভরা দিনের কথা, তারা ভরা রাতের কথা, বড়োদিনের কথা, হাম্পটি-ডাম্পটির কথা, ঐ একটি বৈ আর গল্প গাছ জানতও না, বলতেও পারত না। শেষে গাছটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

ছেলেরা উঠোনে খেলে বেড়াতে লাগল। জীবনের সবচেয়ে সুখের সন্ধ্যায় গাছের মাথায় যে সোনালি তারাটি পরানো ছিল, সবার ছোটো ছেলেটির বুকে আজ সেই তারা জ্বলজ্বল করতে লাগল। কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে গেল, গাছও শেষ হল, গল্পও শেষ হল। কোনো-না-কোনো সময়ে সব গল্পেরই শেষ হয়।

দেবদূতের কথা

'যখনই কোনো লক্ষ্মী ছেলে কি মেয়ে মারা যায়, স্বর্গ থেকে একজন দেবদূত নেমে এসে তাকে কোলে করে, বড়ো-বড়ো সাদা ডানা মেলে, তার সব ভালোবাসার জায়গাগুলো দেখিয়ে আনে। দেবদূত সেই সঙ্গে একমুঠি ফুল তুলে ভগবানের কাছে নিয়ে যায়; স্বর্গে তারা পৃথিবীর চাইতেও আরো সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠে।'

ছোটো একটি মরা ছেলেকে কোলে নিয়ে স্বর্গে যাবার পথে ভগবানের দেবদূত এ কথা বলেছিল। ছোটো ছেলেটি যেন স্বপ্নের মধ্যে তার কথা শুনছিল, দুজনে তখন যে-সব জায়গাগুলিতে ছেলেটি আগে খেলা করত তার উপর দিয়ে উড়ে চলল; কত সুন্দর ফুলে ভরা বাগান পেরিয়ে গেল তারা।

দেবদূত বলল, "বল তো কোন ফুল নিয়ে গিয়ে স্বর্গের মাটিতে পুঁতব?"

সেখানে সুন্দর চিক্কণ একটি গোলাপগাছ হয়েছিল, কিন্তু কোনো দুষ্টু লোক তার গুঁড়ি ভেঙে দিয়েছিল, তাই বড়ো-বড়ো আধ-খোলা কুঁড়িসুদ্ধ ডালপালাগুলি শুকিয়ে মাটিতে নুইয়ে পড়েছিল। ছেলেটি বলল, "আহা, বেচারা গাছ! ওপারে নিয়ে যাই, স্বর্গে গিয়ে আবার ফুটুক।"

দেবদূত তখন গোলাপগাছটিকে তুলে নিয়ে, ছেলেটিকে চুমো খেল। ছেলেটিও তার চোখ দুটি অর্ধেক খুলল। বাগান থেকে ওরা অনেক ভালো জাতের ফুল নিল আর সেই সঙ্গে ছোটো নম্র ডেজি ফুল আর একটি বুনো প্যানজি ফুলও নিল। ছেলেটি তখন বলল, "এই তো অনেক হল।" দেবদূতেরও বোধ হয় সেই মত, তবু তখনই সে স্বর্গের দিকে রওনা দিল না।

তখন রাত নেমেছে ; চারদিকে একেবারে চুপচাপ। ওরা একটা শহরের কাছে থেমে, সবচাইতে সরু রাস্তাগুলোর মধ্যে একটার উপরে আকাশে ভেসে রইল। রাস্তাটার উপরে খড়-কুটো, ছাই আর নানারকম আবর্জনা ছড়ানো ছিল। সেদিন কেউ তার পুরনো বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিল ; চারদিকে মাটিতে ছড়ানো ছিল ভাঙা থালা, দেয়ালের পলেস্তারার কুচি, ন্যাকড়া, পুরনো টুপির টুকরো, ইত্যাদি, এক কথায় যত রাজ্যের বিশ্রী জিনিস ছাড়া আর কিছু নয়।

আবর্জনার ঢিপির মধ্যে একটা পুরনো ফুলের টবের ভাঙা টুকরোর দিকে দেবদূত দেখাল, টবের ভিতর থেকে একদলা মাটি বাইরে পড়ে গেছিল, একটা শুকনো বড়ো ফুলের গাছের শিকড়ে জড়িয়ে মাটিটুকু দলা পাকিয়ে ছিল। ফুলগাছটিতে আর দেখবার কিছু নেই, তাই কেউ ওটাকে পথে ফেলে দিয়েছিল।

দেবদূত বলল, "ওটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই ; উড়তে উড়তে ওর কথা তোমাকে বলছি।"

তার পর তারা উড়ে স্বর্গের দিকে চলল। যেতে যেতে দেবদূত বলল, "এক সময় ঐ ছোটো সরু গলিটার মধ্যে, মাটির তলায় একটা খুপরি ঘরে একজন রুগ্ন গরিব ছেলে থাকত। খুব ছোটোবেলা থেকেই সে বিছানা থেকে উঠতে পারত না। মাঝে

মাঝে যদি-বা লাঠিতে ভর দিয়ে ছোটো ঘরটার মধ্যেই একটু পাইচারি করত, তার বেশি কিছু করতে পারত না। গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো মাটির তলায় ঘরটার ছোটো জানলা দিয়ে সূর্যের কিরণ ভিতরে ঢুকত! সেই সময় যদি উঠে বসে টের পেত তার গায়ে নরম-গরম রোদ পড়েছে, যদি আলোর দিকে তার শুকনো পাতলা কাঁচের মতো হাত দুখানি তুলে ধরে শিরার ভিতর লাল রক্ত দেখতে পেত, তা হলে সে বলে উঠত, 'আজ আমি বাইরে বেরিয়েছিলাম!' সুন্দর বনভূমির আর তার গ্রীষ্মকালে ঝলমলে সবুজ রঙের সঙ্গে তার কতটুকুই-বা পরিচয়; বীচ্‌গাছে নতুন পাতা বেরুলে পাশের বাড়ির ছেলে হয়তো কয়েকটা ডাল এনে দিল, সেইগুলোকে নিজের মাথার উপর তুলে ধরে ছেলেটা ভাবত এই বুঝি সে বীচ্‌গাছের ছায়ায় বসে আছে, ঐ বুঝি পাখিরা গান গাইছে, সূর্য চারদিকে রোদ ছড়াচ্ছে।

"বসন্তকালে একদিন পাশের বাড়ির ছেলেটি তাকে কয়েকটা মেঠো ফুল এনে দিল। তার মধ্যে একটার শিকড় ছিল, কাজেই সেটাকে একটা টবে বসিয়ে বিছানার কাছে, জানলার উপর রাখা হল। যত্ন করে লাগানো হয়েছিল বলে গাছটা বাড়তে লাগল, তার নতুন নতুন ডালপালা বেরুত, বছরে বছরে ফুল ধরত। ঐ একটা ফুলগাছই ছোটো ছেলেটার কাছে একটা বাগানের মতো মনে হত, পৃথিবীতে ঐ তার সামান্য সম্পদ। গাছটাতে সে জল দিত, যত্ন নিত, ঘরের নিচু ছোটো জানলা দিয়ে সূর্যের যতগুলি কিরণ ভিতরে আসত, তার প্রথমটি থেকে শেষটি পর্যন্ত সবগুলি যাতে গাছের গায়ে লাগে, ছোটো ছেলেটার সর্বদা সেদিকে দৃষ্টি ছিল! ফুলগুলোর কী মোলায়েম রঙ, কী সুগন্ধ! ছেলেটার স্বপ্নের সঙ্গে সেই রঙ আর গন্ধ মিশে যেত, মরবার সময় ঐ ফুলের দিকেই সে ফিরেছিল। একবছর হল ঐ ছেলে

স্বর্গে গেছে, এই একবছর ধরে গাছটা ঐ জানলার ধারেই ছিল, তার ফুল পাতা শুকিয়ে গেছিল, সবাই তার কথা ভুলে গেছিল। আজ সেটাকে অন্য আবর্জনার সঙ্গে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই ফুলগাছটাকেই আমরা এক্ষুণি তুলে নিলাম, কারণ কোনো রানীর বাগানের জমকাল ফুলের চাইতে এই সামান্য শুকনো মেঠো ফুল বেশি আনন্দ দিয়েছে।"

যে ছোটো ছেলেকে দেবদূত স্বর্গে নিয়ে যাচ্ছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি এত কথা কি করে জানলে?"

দেবদূত বলল, "বলব কি করে জানলাম? আমিই যে ঐ রুগ্ন ছোটো ছেলে ছিলাম, লাঠি দিয়ে হাঁটতাম। আমার নিজের ফুল আমি চিনব না?"

তখন ছোটো ছেলেটি বড়ো-বড়ো করে চোখ খুলে, দেবদূতের উজ্জ্বল সুন্দর মুখের দিকে চাইল—আর সেই মুহূর্তেই ওরা স্বর্গে পৌঁছে গেল।

তার পর মরা ছেলেটিও দেবদূতের মতো ডানা পেল, তার হাত ধরে তার সঙ্গে উড়ে চলল। ঐ সামান্য শুকনো মেঠো ফুলকে কণ্ঠ দেওয়া হল, দেবদূতদের সঙ্গে সেও গান গাইতে লাগল, তারা মহান ভগবানের চারদিকে ঘিরে ছিল, কেউ কেউ তাঁর খুব কাছে, বাকিরা গোল হয়ে কিছু দূরে, তার বাইরে গোল হয়ে আরো দেবদূত, দূর থেকে দূরান্তরে তারা রইল, অসীম আনন্দ পর্যন্ত, কিন্তু সকলের উপর সমানভাবে আশীর্বাদ ঝরে পড়ল।

তখন তারা সকলে একসঙ্গে গাইতে লাগল, দেবদূতরা, সেই ছোটো ছেলেটি আর সেই সামান্য শুকনো মেঠো ফুল, যে অন্ধকার সরু গলিতে আবর্জনার মধ্যে পড়েছিল।

স্বর্গের বাগিচা, প্যারাডাইস

অনেকদিন আগে একজন রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর বয়স বেশি ছিল না, কিন্তু তাঁর মেলা ভালো-ভালো বই ছিল। সে-সব বইতে যার যা জানবার ইচ্ছা হত, সব পাওয়া যেত। শুধু একটি খবর কোনো বইতে ছিল না। সেটি হল কোথায় গেলে স্বর্গের বাগিচা প্যারাডাইস দেখতে পাওয়া যায়।

রাজপুত্র যখন খুব ছোটো ছিলেন, সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছেন, তখন তাঁর ঠাকুরমা বলতেন যে স্বর্গের বাগিচার ফুল নাকি ভালো-ভালো পিঠের মতো মিষ্টি ; ফুলের কেশরের স্বাদ চমৎকার ফলের রসের মতো। আর নাকি সেখানে একটা গাছে ইতিহাস ফলে, একটাতে ভূগোল, একটাতে জর্মান ভাষা। যে গাছের ফুল খাওয়া যায়, অমনি সেই বিষয়ে শেখা হয়ে যায়। যত বেশি ফুল খাওয়া যায়, নাকি তত বেশি করে ইতিহাস, ভূগোল, জর্মান ভাষা জানা যায়।

তখন রাজপুত্র এ-সমস্তই বিশ্বাস করেছিলেন, কিন্তু পরে যখন বয়সের সঙ্গে বিদ্যা-বুদ্ধি বাড়ল, তখন বুঝতে পারলেন যে স্বর্গের বাগিচা প্যারাডাইস একেবারে অন্য জিনিস।

একদিন রাজপুত্র বনের মধ্যে বেড়াতে গেলেন। একাই গেলেন, কারণ একা বেড়াতেই তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগত।

সন্ধ্যা নেমে এসেছে, এদিকে আকাশে মেঘ জমল। তার পর এমনি বৃষ্টি নামল যে মনে হল আকাশের সব বাঁধ ভেঙে গেছে। চারদিকে এমনি অন্ধকার যেন ঘোররাতে গভীর কুয়োর ভিতরটা!

রাজপুত্র এখানে ভিজে ঘাসে পা পিছলে পড়েন, ওখানে শক্ত মাটি থেকে উঁচিয়ে-থাকা ন্যাড়া পাথরে হোঁচট খান। দেখতে দেখতে সব কিছু জলে সপ্‌সপ্‌ করতে লাগল; রাজপুত্রের পরনে কাপড়-চোপড়ের একটি সুতোও শুকনো রইল না।

শরীরের সব শক্তি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় কানে এল অদ্ভুত একটা খস্‌খস্‌ শব্দ। চেয়ে দেখলেন সামনেই একটা বড়ো গুহার মধ্যে আলো। গুহার মাঝখানে গণগণে আগুন জ্বলছে, তাতে একটা চমৎকার আস্ত হরিণ ঝলসানো হচ্ছে। আগুনের ধারে এক বুড়ি বসেছিল। বয়স হলেও, দিব্যি লম্বা জোয়ালো চেহারা, যেন পুরুষমানুষ মেয়ে সেজেছে। বুড়ি একটার পর একটা কাঠের টুকরো নিয়ে আগুনে ফেলছিল। রাজপুত্রকে দেখে ডেকে বলল, "আরো কাছে এসো বাছা, আগুনের সামনে বসে কাপড়-চোপড় শুকাও।"

রাজপুত্র আগুনের সামনে মাটিতে বসে পড়ে বললেন, "বাবা! এখানে বাতাসের কি জোর!" উত্তরে বুড়ি বলল, "আমার ছেলেরা বাড়ি ফিরলে বাতাসের জোর আরো বাড়বে। এটা হল বাতাসদের গুহা। আমার চার ছেলে হল চার বাতাস। আমার কথা বুঝতে পারলে?"

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার ছেলেরা কোথায়, বুড়ি-মা?"

বুড়ি বলল, "বোকার মতো প্রশ্নের উত্তর দেবার কোনো

মানে হয় না। আমার ছেলেরা যা খুশি তাই করে। মাথার ওপরের ঐ মেঘের সঙ্গে বল খেলে।”

রাজপুত্র বললেন, “তাই বুঝি? কিন্তু তোমার কথা বলার ধরনটা তো বড়ো কর্কশ, বুড়ি-মা; আমার চেনাজানা মেয়েদের মতো তুমি নরম-সরম নও!”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাদের যে কোনো কাজকম্ম নেই। আরে আমার ছেলেগুলোকে সামলাতে হলে কর্কশ না হয়ে করি কি! অবিশ্যি আমি ওদের ঠিক বাগ মানাই, তা ওরা যতই গোঁ দেখাক-না। দেয়ালে ঐ যে চারটে থলি ঝোলানো দেখছ? তুমি ছোটোবেলায় আয়নার পেছনে লুকোনো লাঠিগাছাকে যেমন ভক্তি করতে, ওরাও ঐ থলিগুলোকে ঠিক তেমনি ভক্তি করে। সবকটাকে একসঙ্গে তেড়েফুঁড়ে দিই থলিতে ভরে। তার পর যতক্ষণ না আমার মরজি হয়, ততক্ষণ ওদের ঐ থলির মধ্যেই বসে থাকতে হয়। এই যে একজন এলেন!”

এল উত্তুরে বাতাস। সঙ্গে নিয়ে এল হাড়-কাঁপানো শীত। বড়ো-বড়ো শিলা মাটিতে পড়ে লাফাতে লাগল, বরফের কুচি চারদিকে উড়তে লাগল। তার পরনে ছিল ভালুকের চামড়ার তৈরি জামা-পাজামা; মাথায় সীলমাছের ছালের কানঢাকা টুপি; দাড়ি থেকে ঝুলছিল লম্বা লম্বা বরফের টুকরো; জামার কলারের তলা থেকে গড়িয়ে পড়ছিল একটার পর একটা শিলা।

রাজপুত্র বললেন, “ভাই, ওভাবে অমনি আগুনের কাছে যেও না, তোমার হাত-মুখে বরফ-লাগা ঘা হয়ে যেতে পারে।”

হা হা করে হেসে উত্তুরে বাতাস বলল, “বরফ লেগে ঘা হবে! আরে, বরফ লাগলেই তো আমি সবচেয়ে আনন্দ পাই। কিন্তু তুমি কে বট হে সরু-ঠ্যাং ছোকরা? বাতাসদের গুহায় এলেই-বা কি করে?”

বুড়ি বলল, "ও আমার অতিথি। তাতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তা হলে স্বচ্ছন্দে থলিতে ঢুকতে পার। এবার শুনলে তো আমার মনের কথা।"

ও-ই যথেষ্ট। উত্তুরে বাতাস তখন কোথা থেকে এসেছে, গতমাসটা কিভাবে কাটিয়েছে, এই-সব গল্প বলতে শুরু করল।

সে বলল, "আমি উত্তর মেরু থেকে ঘুরে এলাম। রুশ তিমি-শিকারীদের সঙ্গে ঋক্ষ দ্বীপে গেছিলাম। সে যে কী চমৎকার জায়গা কি আর বলব। সেখানকার জমি হল থালার মতো চ্যাপটা, যেন কেউ নাচবে বলে তৈরি। আধগলা বরফের ওপর শ্যাওলা গজিয়ে অমন হয়েছে। তার ওপরে খোঁচা খোঁচা পাথর আর তিমি আর সাদা ভালুকের কংকাল ছড়ানো, দেখায় যেন রাক্ষসদের হাত-পা, তাতে আবার সবুজ ছ্যাৎলা পড়েছে। দেখে মনে হল ওগুলোর ওপর কোনো জন্মে সূর্যের আলো পড়ে নি। আমি মেঘের গায়ে একটু ফুঁ দিলাম, যাতে শিকারীরা ভাঙা জাহাজের টুল তক্তার ওপর তিমি মাছের চামড়া দিয়ে তৈরি কুঁড়েঘরটিকে দেখতে পায়। কুঁড়ের চালের ওপর একটা জ্যান্ত সাদা ভালুক বসে দাঁত খিঁচোচ্ছিল। সমুদ্রের তীরে খানিক বেড়ালাম, পাখিদের বাসায় উঁকি মেরে দেখলাম ন্যাড়া ন্যাড়া বাচ্চাগুলো ঠোঁট খুলে এই এত বড়ো হাঁ করে চ্যাচাচ্ছে! ওদের ক্ষুদে-ক্ষুদে গলায় একটু করে হাওয়া দিতেই সবাই চুপ করল। দেখলাম জলের তলায় সমুদ্রের ঘোড়াগুলো বিশাল কেঁচোর মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাদের মাথাগুলো শুয়োরের মতো, দাঁতগুলো আড়াই হাত লম্বা।

তার পর মাছধরা শুরু হল। সমুদ্রের ঘোড়ার বুকে বর্শা বিঁধল, ফোয়ারার মতো ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটে সাদা বরফের উপর দিয়ে গড়িয়ে চলল। অমনি মনে পড়ে গেল, এ খেলায়

আমাকেও তো যোগ দিতে হবে। আমার জাহাজ হল পর্বত-প্রমাণ বরফের চাঁই; তাই দিয়ে শিকারীদের নৌকো ঘিরে ফেললাম। নৌকোর মাঝিদের সে কী শিস্ দেওয়া আর চীৎকার! আমি তার চেয়েও জোরে শিস্ দিতে লাগলাম! শেষপর্যন্ত আগে সব মরা তিমি, তার পর নিজেদের বাক্স-প্যাঁটরা, দড়া-দড়ি, বরফের ওপর টেনে ফেলে দিতে ওরা বাধ্য হল। তখন আমি ওদের ওপর নরম বরফের কুচি ঢেলে, ওদের তাড়িয়ে দক্ষিণ মুখো নিয়ে গেলাম, খাক্ যত ইচ্ছা নোনা জল! বাছাধনরা আর কখনো ঋক্ষ দ্বীপে আসছে না!"

বাতাসদের মা বলল, "তার মানে যথেষ্ট কুকর্ম করে এসেছ!"

উত্তুরে বাতাস বলল, "ভালো কাজ কি করেছি না করেছি, সে আমার নিজের মুখে বলবার নয়, বলবে অন্য লোকে। সে যাই হোক, এই যে আমার পশ্চিমা ভায়া এসে হাজির! ওকে আমি সবার চেয়ে বেশি ভালোবাসি; ওর গায়ে সাগরের গন্ধ লেগে থাকে, ওর ঠাণ্ডা ভাবটি মানুষকে চাঙা করে তোলে!"

রাজপুত্র অবাক হয়ে বললেন, "এই কি তবে সেই মৃদুমন্দ পশ্চিম হাওয়া?"

বুড়ি বলল, "পশ্চিম হাওয়া বটে, তবে আজকাল আর তেমন মৃদুমন্দ নেই। সেকালে ভারি সভ্যভব্য ছিল, কিন্তু অনেক কাল হল সে-সব গেছে।"

বাস্তবিক পশ্চিম হাওয়া দেখতে বুনো জংলির মতো, ওদিকে মাথায় একটা তুলো-পোরা টুপি আঁটা, যাতে চোটচোট না লাগে। হাতে মার্কিনী বন থেকে কেটে আনা মেহগিনির মুগুর। অমন আর কোথাও হয় না।

ওদের মা বলল, "তুমি কোথা থেকে এলে, বাছা?" সে

বলল, "বাদাবন থেকে। সেখানে গাছের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটা লতার ঝোপ, সেখানে ভিজে ঘাসে জোলো সাপ ঘুমোয়, মনে হয় মানুষের সেখানে কোনো কাজ নেই।"

"তুমি সেখানে কি করলে ?"

"আমি গভীর নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উঁচু পাথরের ওপর থেকে নীচে আছড়ে পড়েই, কেমন গুঁড়িগুঁড়ি ধুলোর মতো হয়ে আবার মেঘের দিকে উড়ে চলেছে, যাতে তার কোলে রামধনু জন্মায়। দেখলাম বুনো মহিষ সাঁতরে নদী পার হতে গিয়ে কেমন স্রোতের টানে ভেসে যাচ্ছে। একঝাঁক বুনো হাঁসও ঐ নদীতে সাঁতার দিচ্ছিল। নদী যেখানে ঝাঁপ দিয়ে নেমেছে, ওরা বোধ হয় সেখান থেকেই উড়ে চলে গেল। কিন্তু মহিষটা জলের তোড়ে নীচে পড়ল। তাই দেখে আমার মনটা বড়ো খুশি হল, তাই এমনি ঝড় তুললাম যে আদ্যিকালের বিশাল গাছগুলো ভীষণ শব্দ করে মাটিতে আছড়ে পড়ে, ভেঙে খান্‌খান্ হল !"

বুড়ি বলল, "আর কিছু কর নি ?"

সে বলল, "মার্কিন দেশের মাঝখানে বিশাল ঘাসজমি আছে, সেখানে একটাও গাছ জন্মায় না ; সেই সাভানাতে তাণ্ডব নাচন নেচে এলাম। বুনো ঘোড়ার পিঠে চাপলাম ; নারকেলগাছ ধরে ঝাঁকানি দিলাম ; সব কথা যদি বলি, তোমরা চমকে উঠবে। কিন্তু মনের মধ্যে যা থাকে, তার সবটা কি আর বলা চলে, কি বল বুড়ি-মা ?" এই বলে মাকে ধরে সে এমনি ভালুকে আদর করল যে সে বেচারা পড়ে যায় আর কি ! বড়ো জংলি লোকটা।

তার পর এল দখিন হাওয়া, মাথায় পাগড়ি, গায়ে বেদুইনদের পোশাক উড়িয়ে। এসেই আগুনে কতকগুলো কাঠ চাপিয়ে

বলল, "উঃ, এখানে বেজায় শীত। আমার আগে যে উত্তুরে হাওয়া হাজির হয়েছে, সেটা বেশ জানান দিচ্ছে।"

উত্তুরে হাওয়া বলল, "উঃ, বড্ডো গরম! এই আঁচে একটা আস্ত সাদা ভালুক রান্না করা যায়!"

দখনে হাওয়া বলল, "তুমি নিজেই একটা সাদা ভালুক।" মা চটে গেল, "বলি, তুজনেরই কি থলিতে ঢুকবার সাধ হয়েছে নাকি? চুপ করে বসে, এবার বল দিকিনি কোথায় গেছিলে?"

দখিন হাওয়া বলল, "আফ্রিকাতে, মা। কাফ্রিদের দেশে সিংহ শিকার করে এলাম। ও দেশের উপত্যকায় কী সুন্দর ঘাস গজায়, মা, জলপাইয়ের মতো সবুজ তার রঙ। ন্যু বলে এক জাতের হরিণ সেখানে নেচে বেড়ায়। উটপাখির সঙ্গে দৌড় বাজি খেললাম, কিন্তু সে আমার সঙ্গে পারবে কেন! মরুভূমির হলুদ বালির ধারে গিয়ে পৌঁছলাম; মনে হল বুঝি সাগরের তলায় নেমেছি! যাত্রীদের দল দেখলাম, জলের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে; শেষ উটটিকে মেরেও তার কুঁজের মধ্যে সামান্য এতটুকু জল পেল! ওদের মাথার উপর রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, গরম বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছিল! উঃ! মরুভূমির যেন শেষ নেই। আমি করলাম কি, ঝুরো বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে বালিগুলোকে একটা প্রকাণ্ড থামের মতো করে পাকিয়ে নিলাম; তার পর কী নাচই নাচল আমার থামটা! একটা এক-কুঁজওয়ালা উট তাই দেখে হকচকিয়ে গেল আর বণিকটা কাফতান টেনে মাথা ঢেকে, আল্লার সামনে যেমন মাটিতে শুয়ে পড়ে, তেমনি করে আমার সামনে শুয়ে পড়ল! সকলে বালি চাপা পড়ে গেল; ওদের ওপর একটা বালির বিরাট স্তূপ তৈরি হয়ে গেল! একদিন যদি গিয়ে স্তূপটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিই, ওদের হাড়গোড় বেরিয়ে পড়ে, রোদ লেগে খট্‌খটে

সাদা হয়ে যাবে! পরে যখন অন্য যাত্রীরা ঐ পথে যাবে, তারা বুঝতে পারবে তাদের আগেও অন্য লোকে এ-পথে গেছে।"

শুনে বুড়ি-মা বলল, "তা হলে তুমি খুব খারাপ কাজ করেছ। ঢোক থলির মধ্যে!" এই বলে দখিন হাওয়া কিছু টের পাবার আগেই, তার ঘাড় ধরে বুড়ি তাকে থলি বন্ধ করে ফেলল। থলিটা মাটিতে গড়াতে লাগল, অগত্যা বুড়ি তার ওপর চেপে বসল, দখিন হাওয়া তখন বাধ্য হয়ে চুপ করল।

রাজপুত্র বললেন, "বাপ্‌রে, কি ছেলে?"

বুড়ি বলল, "যা বলেছ! তবে আমার কথা মেনে চলতেই হয়। ঐ এলেন চার নম্বর!"

এবার এল পুবের বাতাস, পরনে তার চীনে পোশাক। তার মা বলল, "ওহো, তুমি তা হলে পৃথিবীর ঐ কোণটি থেকে ঘুরে এলে। আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি স্বর্গের বাগিচার দিকে যাবে।"

পুবের হাওয়া বলল, "কাল যাব যে মা, শেষবার গেছিলাম, তার পর কাল একশো বছর পূর্ণ হবে! এখন আসছি চীন দেশ থেকে। ওখানকার একটা চীনে-মাটির মিনারের চারদিকে খুব খানিকটা নেচে, সব ঘণ্টাগুলোকে বাজিয়ে দিলাম! নীচের রাস্তায় দেখলাম কর্মচারীদের এমনি বেত মারা হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত ওদের পিঠেই বেতগুলো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাচ্ছে! তবু প্রথম থেকে নবম শ্রেণীর বহু লোক খালি খালি বলছিল, 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, বাবা আমার বড়োই উপকার করলেন!' অবিশ্যি ওটা মোটেই তাদের মনের কথা নয়। আমিও ঘণ্টা নেড়ে গান জুড়লাম, ৎসিং—ৎসাং—ৎসু?"

তার মা বলল, "বাবা, কি দুরন্ত ছেলে তুমি? ভাগ্যিস্‌

কাল স্বর্গের বাগিচায় যাচ্ছ! ওখানে গেলেই তোমার স্বভাবের উন্নতি দেখা যায়। মনে করে জ্ঞানের ঝরনার জল একটু বেশি করে খেও আর আমার জন্যেও এক শিশি ভরে এনো।"

পুবের হাওয়া বলল, "তাই হবে, তাই হবে। কিন্তু দখনে ভায়াকে থলিতে ভরেছ কেন? ওকে বেরুতে দাও মা। ফীনিক্স বলে একরকম পাখি আছে, ওর কাছে তার কথা শুনতে হবে। প্যারাডাইসে এক রাজকন্যা থাকেন, একশো বছর পর পর যেই তাঁর কাছে যাই, অমনি তিনি আমাকে ফীনিক্স পাখির কথা জিজ্ঞাসা করেন। লক্ষ্মী মাগো, থলিটা একবারটি খোল-না। তা হলে আমি তোমাকে দু পেয়ালা চা দেব; কী তাজা, কী সবুজ, যেন এইমাত্র গাছ থেকে তোলা হল!"

মা বলল, "বেশ তাই হবে, চা খাওয়াবে বলে আর তুমি আমার আদুরে গোপাল বলে, দিচ্ছি খুলে।" এই বলে বুড়ি থলির মুখ খুলে দিল আর দখিন হাওয়া গুটিগুটি বেরিয়ে এল। অচেনা রাজপুত্রের সামনে এভাবে জব্দ হওয়াতে সে ভারি অপ্রস্তুত।

দখিন হাওয়া বেরিয়ে এসেই বলল, "এই নাও, রাজকন্যার জন্য তালপাতার পাখা। পৃথিবীর একমাত্র বুড়ো ফীনিক্স পাখির কাছে ওটাকে পেয়েছি। দেখ, পাখার ওপর ঠোঁট দিয়ে আঁচড় কেটে ফীনিক্স তার জীবন-কাহিনী লিখে রেখেছে। রাজকন্যা নিজেই সে কথা পড়ে দেখতে পারবেন। দেখলাম ফীনিক্স পাখি কেমন নিজের বাসায় নিজে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, তার মধ্যে বসে হিন্দু বিধবার মতো দেখতে দেখতে পুড়ে গেল। শুকনো ডালপালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল, আর আগুনধরা বাসা থেকে কী মিষ্টি একটা গন্ধ বেরুল। শেষপর্যন্ত সব জ্বলে

পুড়ে খাক্ হয়ে গেল; বুড়ো ফীনিক্স পাখি এক মুঠো ছাই হয়ে গেল। তার পর দেখলাম আগুনের মধ্যে একটা ডিম জ্বলজ্বল করছে। দুম্ করে ডিমটা ফেটে একটা বাচ্চা ফীনিক্স উড়ে বেরিয়ে এল। সেই ফীনিক্সটাই এখন সব পাখিদের রাজা; ও ছাড়া পৃথিবীতে আর একটিও ফীনিক্স পাখি নেই। তালপাতার পাখায় ফীনিক্স ঠুক্‌রে একটা ফুটো করে দিয়েছে দেখ। ঐভাবেই রাজকন্যাকে সে নমস্কার জানিয়েছে।"

বাতাসদের মা বলল, "বেশ তা হলে এখন খেতে বসা যাক।" কাজেই সকলে মিলে ঝলসানো হরিণের মাংস খেতে বসল। রাজপুত্র বসলেন পুবের হাওয়ার পাশেই। দেখতে দেখতে দুজনার মধ্যে ভারি ভাব হয়ে গেল।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "ও কোন রাজকন্যার কথা হচ্ছিল, ভাই? আর স্বর্গের বাগানটাই-বা কোথায়?"

পুবের হাওয়া হা হা করে হেসে বলল, "কেন, সেখানে যাবার ইচ্ছা হয়েছে নাকি? বেশ তো, কাল আমার সঙ্গেই উড়ে চলো। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখা উচিত; কথাটা হল যে আদম আর ইভের সময়ের পর থেকে কোনো জ্যান্ত মানুষ সেখানে যায় নি। ওদের দুজনকে যখন সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, বাগিচাটা একেবারে মাটির তলায় নেমে গেল। কিন্তু এখনো সেখানে তেমনি মিষ্টি রোদ ওঠে, তেমনি মধুর বাতাস বয় আর দেখতেও তেমনি সুন্দর। পরীদের রানী সেখানে ঘর বেঁধেছেন। ওখানে সুখ দ্বীপ আছে, সেখানে মৃত্যুর প্রবেশ নিষেধ, সেখানকার জীবন বড়ো আনন্দের। কাল যদি আমার পিঠে চড়ে বসো, আমি তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব। তাতে বোধ হয় কারও কোনো আপত্তি হবে না। এখন চুপ কর দিকিনি, বড্ডো ঘুম পাচ্ছে।"

কাজেই তখনকার মতো যে যার শুতে গেল। ভোরে ঘুম ভাঙতেই, নিজেকে মেঘের অনেক উপরে উঠতে দেখে রাজপুত্র অবাক হলেন না। দেখেন তিনি পুবের হাওয়ার পিঠে চেপে আছেন, সে তাঁকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। এত উঁচু দিয়ে তাঁরা ছুটে চলেছেন যে নীচের বন মাঠ নদী সাগর দেখে মনে হচ্ছে যেন মস্ত একটা রঙিন মানচিত্রে আঁকা।

পুবের হাওয়া বলল, "সুপ্রভাত! আরেকটু ঘুমোলে পারতে। আমাদের নীচেকার চ্যাপ্টা জমিতে দেখবার মতো কিছু নেই, এক যদি গির্জে গুণে আনন্দ পাও। ঐ দেখ-না সবুজ তক্তার ওপর যেন সাদা সাদা খড়ির টুকরো।" ও যাকে তক্তা বলল, সেগুলো আসলে খেত আর মাঠ।

রাজপুত্র বললেন, "তোমার মা ভাইদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে আসাটা আমার ভারি অভদ্রতা হয়েছে।" পুবের হাওয়া বলল, "আরে ছিলে তো ঘুমিয়ে, কাজেই ও-সব মাপ করা যায়।" এবার ওরা আরো বেগে ছুটে চলল, এত বেশি বেগে যে গাছের মাথা দুলে উঠল, ডালপালা পাতা থেকে মর্মর ধ্বনি উঠল। যখনই ওরা সাগর হ্রদ পার হয়, জলে বড়ো-বড়ো ঢেউ ওঠে, রাজহাঁসের মতো জাহাজগুলোও যেন জলের মধ্যে মাথা ডোবায়!

সন্ধ্যায় যখন আঁধার নামল, বড়ো-বড়ো শহরগুলোকে কী অদ্ভুত দেখাতে লাগল। এখানে ওখানে আলো জ্বলছে; ঠিক যেন এক টুকরো পোড়া কাগজ থেকে আগুনের ফুলকি একটার পর একটা উড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার পর সব শেষ।

রাজপুত্র হাততালি দিয়ে উঠলেন, পুবের হাওয়া বলল, "চুপ, ভাই, চুপ। আমাকে কষে আঁকড়ে ধর, নইলে যদি পড় তো কোনো গির্জার চুড়ো থেকে চ্যাং-দোলা হয়ে ঝুলে থাকবে!"

তার পর পুবের হাওয়া বলল, "ঐ হিমালয় পাহাড়। এশিয়াতে এত উঁচু পাহাড় আর নেই। দেখতে দেখতে আমরা এবার স্বর্গের বাগিচায় পৌঁছে যাব।" তার পর তারা খানিকটা দক্ষিণমুখো হয়ে চলল; একটু পরেই নাকে এল মসলার আর ফুলের সুগন্ধ। বুনো ডুমুর আর ডালিম যেখানে সেখানে হয়ে আছে। লতা থেকে লাল সাদা আঙুরের থোপা ঝুলছে। এইখানে নেমে ওরা নরম ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। বাতাসকে দেখে ফুলগুলো মাথা নাড়তে লাগল, যেন আদর করে বলছে, "এসো, এসো।"

রাজপুত্র বললেন, "এই কি তবে স্বর্গের সেই বাগান?

পুবের হাওয়া বলল, "না, না, এখনো নয়। তবে শিগ্‌গিরই পৌঁছব। ঐ যে পাথরের পাহাড় দেখছ, ঐ যে মস্ত গুহা, তার সামনে আঙুর-লতা বড়ো-বড়ো সবুজ পরদার মতো ঝুলে রয়েছে? ওরই মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। গায়ে কাপড় জড়িয়ে নাও। এখানে রোদে পুড়ছ, কিন্তু এক পা এগুলেই বরফে জমে যাবে। ঐ যে পাখি গুহার সামনে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওর এক ডানায় গ্রীষ্মের তাপ, আর এক ডানায় শীতের হিমঠাণ্ডা।"

রাজপুত্র বললেন, "স্বর্গের বাগিচায় যাবার এই তবে পথ।"

ওরা গিয়ে গুহায় ঢুকল। বাবা, সব যেন জমে যায়! তবে বেশিক্ষণের জন্যে নয়। পুবের হাওয়া ডানা মেলে ধরল, সে ডানা পবিত্র আগুনের মতো ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। গহ্বর বলে গহ্বর! মাথার উপর থেকে অদ্ভুত আকারের প্রকাণ্ড সব পাথরের চাংড়া ঝুলছে, তাদের গা থেকে জল ঝরছে। গুহাপথ কখনো এত সরু যে চার হাত-পায়ে হামা দিয়ে এগুনো ছাড়া উপায় নেই, আবার কখনো এত উঁচু, এত প্রশস্ত, মনে হয় যেন মাথার উপরে খোলা আকাশ।

রাজপুত্র বললেন, "নিশ্চয়ই আমরা মৃত্যুপথ দিয়ে স্বর্গের বাগিচায় যাচ্ছি।" কিন্তু পুবের হাওয়া মুখে রা কাড়ল না, আঙুল দিয়ে শুধু সামনে দেখিয়ে দিল, কী সুন্দর নীল আলোর ছটা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। মাথার উপরের পাথরগুলো ক্রমে যেন কুয়াশার রূপ নিতে লাগল; শেষে দেখতে হল যেন জ্যোৎস্নামাখা সাদা মেঘ, তেমনি স্বচ্ছ, তেমনি ঝল্‌মলে। নাকে এল মৃদু মধুর বাতাস, পাহাড়ের হাওয়ার মতো নির্মল, পাহাড়তলীর গোলাপের মতো তার সুবাস।

রাজপুত্র দেখলেন বাতাসের মতো স্বচ্ছ এক নদী বয়ে যাচ্ছে।

তাতে সোনালি রুপোলি মাছ সাঁতরে বেড়াচ্ছে ; জলের নীচে বেগ্‌নি বান মাছ খেলা করছে, এতটুকু নড়লে চড়লে তাদের গা থেকে নীল আলো ঝলকাচ্ছে। জলের উপর সাফলা ফুলের চওড়া পাতায় রামধনুর রঙ লেগেছে, ফুলটি যেন কমলা রঙের উজ্জ্বল আগুনের শিখা। নদীর উপরে একটা সাঁকো, ঝক্‌ঝকে মুক্তোর মতো শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি, তাতে কী অপরূপ সূক্ষ্ম কারিকুরি! সাঁকোর উপর দিয়ে জলটুকু পেরিয়ে সুখ দ্বীপে যেতে হয়। সেইখানেই স্বর্গের বাগিচা।

পুবের হাওয়া রাজপুত্রকে ওপারে বয়ে নিয়ে গেল। রাজপুত্র শুনতে পেলেন সেখানকার ফুল-পাতারা তার ছোটোবেলার বিষয়ে গান গাইছে। কাঁপা-কাঁপা কোমল তাদের গলার সুর, মানুষের গলা তেমন হয় না। রাজপুত্র গাছ দেখলেন, কিন্তু সে কি তালগাছ, নাকি বিশাল জলজ গাছ তা বুঝতে পারলেন না। এত বিশাল, এমন সরস গাছ তিনি আগে কখনো দেখেন নি। লম্বা লম্বা ফুলের মালার মতো কত আশ্চর্য লতা-গুল্ম গাছের চারদিকে ঝুলে আছে। পাখি, ফুল আর নক্‌শার কি অপূর্ব সমাবেশ। তারই কাছে, ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে ঝক্‌মকে পেখম ধরে একঝাঁক ময়ূর। কিন্তু যেই-না রাজপুত্র তাদের গায়ে হাত দিলেন, অমনি বুঝলেন তারা পাখি নয়, গাছ। কলাগাছের মতো একরকম গাছ, তার বড়ো-বড়ো পাতাগুলি ময়ূরের পেখমের মতো জমকাল। জলপাইয়ের ফুলের মতো সুগন্ধি সবুজ ঝোপঝাড়ের উপর দিয়ে বাঘ সিংহ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা সবাই পোষমানা। ভীরু বুনো ঘুঘু পাখির মুক্তোর মতো উজ্জ্বল সুন্দর পালক ; সিংহের কেশরের উপর তারা ডানা ঝাপটাচ্ছে। ভীরু হরিণও সেখানে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে, যেন তার বড়ো ইচ্ছা ওদের খেলায় যোগ দেয়।

এবার এলেন স্বর্গের বাগিচার সেই পরী। তাঁর পরনের কাপড় সূর্যের আলোর মতো উজ্জ্বল; তাঁর মুখের ভাব এত কোমল, যেন কোনো বড়ো সুখী মা তাঁর সন্তানকে নিয়ে আনন্দ করছেন। পরীর বয়স খুব কম, পরী বড়ো রূপসী। তাঁর সঙ্গে চলেছে সুন্দরী সখীরা, তাদের ফুলে একটি করে তারা জ্বলজ্বল করছে।

পুবের হাওয়া তাঁর হাতে ফীনিক্স পাখির দেওয়া সেই তাল-পাতাটি দিল; আনন্দে তাঁর চোখ দুটি উদ্ভাসিত হল। রাজ-পুত্রের হাত ধরে তিনি তাঁকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সে প্রাসাদের দেয়ালের রঙ হল সূর্যের দিকে মুখ ফেরানো অপরূপ একটি টিউলিপ ফুলের পাপড়ির মতো। প্রাসাদের গম্বুজটি যেন একটি সুন্দর ফুল, তার পাপড়ির আধারের মাঝখানে যতই চেয়ে থাকা যায়, ততই তা গভীর বলে মনে হয়।

রাজপুত্র জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে শার্শীর ভিতর দিয়ে চেয়ে দেখলেন। ঐ তো জ্ঞানবৃক্ষ দেখা যায়, তার পাশে দাঁড়িয়ে সাপ, আদম, ইভ। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে না ওদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল?" পরী হেসে বললেন, "ঐ শার্শীর প্রত্যেকটির উপরে কাল সব কিছুর ছাপ রেখে গেছে; অবিশ্যি আমরা যেমন ছবির মূর্তি দেখে থাকি, এ ঠিক তেমন নয়। বরং বলা যায় এ যেন সত্যিকার জীবনের রূপ। আয়নায় যেমন দেখা যায়, গাছের পাতা নড়ছে, মানুষজন আসছে যাচ্ছে।"

রাজপুত্র তখন আরেকটা শার্শীর মধ্যে দিয়ে চাইলেন। দেখলেন পুরাণে যেমন ইয়াকুবের স্বপ্নের কথায় লেখা আছে, সেই সিঁড়ি স্বর্গ অবধি উঠে গেছে আর বড়ো-বড়ো ডানা মেলে দেবদূতরা সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছেন। পরী ঠিকই

বলেছেন, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, তার জীবন্ত ছায়া এই ঘরের শার্শীর মধ্যে ধরা আছে। একমাত্র কালের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব।

আবার হেসে পরী রাজপুত্রকে বিশাল উঁচু একটা সভা-ঘরে নিয়ে গেলেন। এ ঘরের দেয়ালগুলি যেন স্বচ্ছ ছবি দিয়ে ঢাকা আর সে ছবিতে আঁকা মুখগুলি অপূর্ব সুন্দর। ওরা হল হাজার হাজার পবিত্র আত্মা। ওরা হেসে হেসে গান গাইতে লাগল।

সভাঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড এক গাছ, কী ঘন সবুজ তার ডালপালা। সবুজ পাতার মধ্যে নানান মাপের সোনালি আপেল ঝুলে আছে। এই তো সেই জ্ঞানবৃক্ষ, আদম ইভ যার ফল খেয়েছিলেন। গাছের প্রত্যেকটি পাতা থেকে টকটকে লাল রঙের শিশিরের ফোঁটা ঝরছিল, গাছ যেন রক্ত-অশ্রু ফেলছে।

পরী বললেন, "চলো, নৌকোয় উঠি, শরীর মন তাজা হবে। নৌকো এক জায়গাতেই থাকবে একটুও নড়বে না, শুধু ঢেউয়ের দোলায় দোল খাবে। কিন্তু দেখে মনে হবে যেন পৃথিবীর সব দেশ আমাদের পাশ দিয়ে ভেসে চলে যাচ্ছে।"

বাস্তবিকই তীরের রেখা কেমন সরে সরে যাচ্ছিল দেখতে অদ্ভুত লাগছিল। প্রথমে দেখা গেল বরফে ঢাকা উঁচু অ্যাল্পস্ পাহাড়; পাহাড়ের শিখরে মেঘমালা, গায়ে ঝাউগাছ। শিকারীর শিঙার বিষণ্ণ গম্ভীর সুর শোনা গেল; নীচের উপত্যকায় রাখালরা মনের আনন্দে গান গাইছে, তাও শোনা গেল।

তার পরেই নৌকোর উপর এসে পড়ল বটগাছের লম্বা ঝুরি; কুচকুচে কালো রাজহাঁস পাশ দিয়ে ভেসে চলল; তীরে দেখা অদ্ভুত দেখতে কত জানোয়ার, কত ফুল; আকাশ ছোঁয়া নীল অ্যাল্পসের পরেই দেখা গেল নব-হল্যাণ্ড দেশ।

তার পর শোনা গেল পুরোহিতদের বন্দনা, অসভ্যদের নাচের শব্দ, তার সঙ্গে ঢাকঢোল, কাঠের তূরী। পাশ দিয়ে ভেসে গেল মিশর দেশের আকাশ ছোঁয়া পিরামিড, ধুলোয় লুটিয়ে পড়া থাম, স্ফিঙ্কসের মূর্তি।

তার পর উত্তর মেরুর বরফের পাহাড়ের উপর দিয়ে মেরু-জ্যোতি দেখা গেল। এমন সুন্দর আতসবাজি দেখলেও মানুষে তৈরি করতে পারে না। এ-সব দেখে রাজপুত্রের সে কী আনন্দ! এখানে যেটুকু বলা হল, আসলে তার শত গুণ আশ্চর্য জিনিস সেদিন তিনি দেখলেন।

শেষে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি চিরকাল এখানে থাকতে পারব?"

পরী বললেন, "পারবে কি না পারবে, সেটা তোমার নিজের হাতে। আদমের মতো যদি অবাধ্য না হও, তা হলে চিরদিন থাকতে পারবে।"

রাজপুত্র বললেন, "জ্ঞানবৃক্ষের আপেল আমি ছোঁব না। ওরই সমান সুন্দর ফল এখানে তো হাজার হাজার রয়েছে।"

পরী বললেন, "নিজের মনকে পরীক্ষা করো। যদি তেমন মনের জোর না থাকে, তা হলে যে পুবের হাওয়ার সঙ্গে এসেছ, তারই সঙ্গে ফিরে যেও। ও একটু পরেই যাবে, তার পর একশো বছরের মধ্যে আর আসবে না। এখানে সেই একশো বছরকে মনে হবে যেন মাত্র একশো ঘণ্টা। কিন্তু লোভে পড়ার জন্যে, পাপ করার জন্যে অনেক সময় পাবে। রোজ সন্ধ্যায় বিদায় নেবার সময়, আমি তোমাকে বলব, 'এসো আমার সঙ্গে।' হাতছানি দিয়ে তোমাকে ডাকব। কিন্তু খবরদার, আমার ডাক শুনো না। আমার সঙ্গে কখনো এসো না। এলে, প্রতি পদে তোমার লোভ বেড়ে যাবে। পায়ে

পায়ে তা হলে তুমি যে ঘরে জ্ঞানবৃক্ষ আছে, সেখানে পৌঁছে যাবে। আমি ঐ গাছের সুগন্ধে-ভরা ঝোলা ডালপালার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকব। তুমি আমার উপর ঝুঁকে পড়বে, কিন্তু এতটুকু ছোঁও যদি, অমনি স্বর্গের এই সুন্দর বাগিচা মাটির তলায় বসে যাবে, আর তাকে খুঁজে পাবে না।

তখন তোমার চারদিকে মরুভূমির ধারালো বাতাস বইতে থাকবে, তোমার চুল থেকে হিমশীতল জল ঝরবে, তোমার কপালে লেখা থাকবে শুধু দুঃখ আর দুশ্চিন্তা।"

রাজপুত্র বললেন, "আমি এখানেই থাকব।" পুবের হাওয়া তাঁর কপালে চুমো খেয়ে বলল, "বলবান হও। একশো বছর পরে আবার দেখা হবে। বিদায়! বিদায়!" এই বলে সে দুই বিশাল পাখা মেলে দিল। পাখা থেকে আলোর ছটা বেরুতে লাগল, ফসলকাটার সময়ে যেমন করে বিদ্যুৎ চমকায়, কিম্বা উত্তরে শীতকালে যেমন মেরুজ্যোতি দেখা যায়। বাগানের গাছপালা ফুল সবাই প্রতিধ্বনি করে উঠল, "বিদায়! বিদায়!"

সারসরা আর পেলিক্যান পাখিরা লম্বা রেশমী ফিতের মতো সারি দিয়ে বাগানের সীমানা পর্যন্ত তার সঙ্গে গেল।

তার পর পরী বললেন, "এবার আমাদের নাচের পালা শুরু হবে। তার পর যখন সূর্য ডুবতে আরম্ভ করবে, দেখবে তোমার সঙ্গে নাচতে নাচতে আমি তোমাকে ডাকছি, বলছি 'এসো আমার সঙ্গে।' কিন্তু এসো না তুমি। একশো বছর ধরে রোজ সন্ধ্যায় এমনি করে তোমাকে ডাকব। রোজ দেখবে তোমার মনের জোর বাড়ছে, শেষটা আমার সঙ্গে যেতে তোমার এতটুকু ইচ্ছা করবে না। আজ সন্ধ্যায় তোমাকে প্রথমবার ডাকব। এই দেখ, তোমাকে সাবধান করে দিলাম।"

তার পর পরী তাঁকে নিয়ে গেলেন মস্ত একটা ঘরে, সেটি

আগাগোড়া স্বচ্ছ সাদা লিলি ফুলের তৈরি। লিলি ফুলের হলদে কেশরগুলো পাকিয়ে ছোটো-ছোটো সোনালি বীণা হয়ে গেছে। সেই বীণা থেকে বাঁশির মতো মিষ্টি সুর বেরুচ্ছে।

সূর্য ডুবে যাচ্ছে; সমস্ত আকাশ যেন খাঁটি সোনার, বেগনি আবছায়ার মধ্যে লিলি ফুলগুলি অপূর্ব সুন্দর গোলাপ ফুলের মতো জ্বলজ্বল করছে। রাজপুত্র দেখলেন সভাঘরের পিছনের দেয়ালটি খুলে গেল; জ্ঞানবৃক্ষ দেখা গেল; কী তার মহিমা, চোখ ঝলসে যায়! একটা গান ওঁকে যেন ঘিরে রইল, কী মিষ্টি, কী কোমল, যেন ওঁর মার গলার সুরের মতো। মনে হল তিনি ডাকছেন, "বাছা রে, ওরে আমার বাছা রে।"

তার পর পরী কি সুন্দর ইশারা করে ডাকল, "আমার সঙ্গে

এসো, এসো আমার সঙ্গে!” অমনি সব প্রতিজ্ঞা ভুলে রাজপুত্র সেদিকে ছুটে গেলেন, সেই প্রথম রাত্রেই।

চারদিকের সৌরভ, মসলার সুগন্ধের মতো আরো ঘন হয়ে এল, বীণার সুর আরো মিষ্টি শোনাল। যে ঘরে জ্ঞানবৃক্ষ ছিল, সেখানে মনে হল লক্ষ লক্ষ মাথা নড়ছে আর হাসিমুখে বলছে, “সব জানতে দাও। মানুষই তো পৃথিবীর প্রভু!” আরো মনে হল জ্ঞানবৃক্ষের পাতা থেকে ঐ যে টস্‌টস্ করে ঝরছে, ও তো রক্তের অশ্রু নয়, ও যে উজ্জ্বল লাল তারা!

কাঁপা কাঁপা গলায় পরী ডাকলেন, “এসো, আমার সঙ্গে এসো!” এই বলে জ্ঞানবৃক্ষের ডাল সরিয়ে, তিনি তার আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন।

রাজপুত্র বললেন, “এখনো পাপ করি নি; কখনো করবও না!” এই বলে গাছের শাখা সরিয়ে দেখলেন তার আড়ালে পরী ঘুমিয়ে আছেন। এত সুন্দর স্বর্গের কাননের পরী ছাড়া আর কেবা হতে পারে?

রাজপুত্র ঝুঁকে পড়ে দেখলেন পরীর চোখের পলকের পিছনে অশ্রুর ফোঁটা থর্‌থর্ করে কাঁপছে। আস্তে আস্তে বললেন, “তুমি কি আমার জন্য কাঁদছ?” এই বলে চুমো খেয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিলেন।

অমনি বজ্রপাতের মতো ভীষণ শব্দ হল, এত জোরে এত গম্ভীরভাবে বাজ কখনো পড়ে না। চারদিকের সব কিছু কি রকম গোলমাল হয়ে গেল, সুন্দরী পরী অদৃশ্য হয়ে গেলেন, অমন ফুলে ফলে ভরা স্বর্গের কানন কত নীচে তলিয়ে গেল, সে যে কত নীচে! রাজপুত্র দেখলেন রাতের অন্ধকারে বাগানটি ডুবে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ অনেক দূরে ছোটো একটি তারার মতো মিট্‌মিট্ করতে লাগল! তার পর তাঁর সারা দেহের মধ্যে

দিয়ে সে কী হাড় জমানো শীতের ঢেউ খেলে গেল। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, কিছুক্ষণ তিনি মরার মতো পড়ে রইলেন।

যখন রাজপুত্রের জ্ঞান ফিরে এল, তখন মুখের উপর বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাট লাগছে, কপালে তীক্ষ্ণ বাতাস বইছে।

তিনি বলে উঠলেন, "হায়, এ কি করলাম! আদমের মতো আমিও পাপ করলাম? স্বর্গের কানন পৃথিবীর চেয়েও নীচে নেমে গেল?" চোখ খুলে দেখেন দূরে একটা তারা মিট্‌মিট্‌ করছে, সেই তাঁর হারানো স্বর্গের মতো, আকাশের বুকে ঐ হল শুকতারা।

রাজপুত্র উঠে দেখেন বাতাসদের গুহার বাইরে সেই বনের মধ্যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পাশে বাতাসদের মা বসে। দেখে মনে হল বুড়ি খুব চটেছে। এক চড় তুলে সে বলল, "প্রথম রাত্রেই এমন করলে! যা ভেবেছিলাম! তুমি যদি আমার ছেলে হতে তো থলিতে ভরতাম!"

মৃত্যু বলল, "থলির মধ্যেই যাবে।" লোকটা বয়সে বড়ো কিন্তু দেখতে জোরালো, হাতে একটা কাস্তে, পিঠে দুটি মস্ত ডানা।

"শেষপর্যন্ত কফিনেই শোবে, তবে এখনো নয়। ওর উপর আমি নজর রাখব, পৃথিবীতে আরো কিছুদিন ঘুরে বেড়াক; পাপের জন্য অনুতাপ করুক। হয়তো ওর উন্নতি হতে পারে, শেষে হয়তো ভালো হয়ে যাবে। তার পর একদিন যখন ও মোটেই আশা করবে না যে আমি আসব, ঠিক সেই সময় এসে ওকে কফিনে শুইয়ে দেব। ওর মগজ আর হৃদয় তখনো যদি পাপে ভরা থাকে, তা হলে ও স্বর্গের কাননের চেয়েও নীচে নেমে যাবে। কিন্তু ততদিনে যদি ও ভালো হয়, পুণ্যবান হয়, তা হলে আমি কফিনটাকে মাথায় তুলে ঐ দূরে যে তারা দেখা যাচ্ছে, সেখানে চলে যাব। ওখানেও স্বর্গের বাগিচায় ফুল ফোটে। ঐ তারা, ঐ ঝলমল উজ্জ্বল তারায় ও স্থান পাবে, ওখানেই ও চিরকাল থাকবে।"

দেশলাই-বাক্সের কথা

এক সেপাই চলেছে রাজপথ ধরে, ডান-বাঁ, ডান-বাঁ। পিঠে তার পুঁটলি, পাশে ঝুলছে তলোয়ার; যুদ্ধ থেকে সে বাড়ি যাচ্ছে। পথের মধ্যে এক বুড়ি ডাইনীর সঙ্গে দেখা, তার বিকট চেহারা।

ডাইনী বলল, "নমস্কার,সেপাই। বাঃ, তোমার তলোয়ারটি যেমনি ঝক্‌ঝকে, পুঁটলিটিও তেমনি বড়ো। আছ বেশ! বলব কি তোমাকে, ইচ্ছা করলেই যত চাও তত টাকা পেতে পার।"

সেপাই বলল, "ধন্যবাদ, বুড়ি-মা!"

পথের ধারের একটা গাছ দেখিয়ে বুড়ি বলল, "ঐ যে প্রকাণ্ড গাছটা দেখছ? ওটি একেবারে ফোঁপরা। গাছের আগায় চড়লে দেখবে একটা মস্ত ফুটো; তার ভেতর দিয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে গলে একেবারে গাছের গুঁড়ির ভিতর দিয়ে নেমে যেতে পারবে। আমি তোমার কোমরে একটা দড়ি বেঁধে বসে থাকব, ডাক দিলেই তোমাকে টেনে তুলব।"

সেপাই বলল, "গাছের ভেতর নেমে করতে হবেটা কি?" ডাইনী বলল, "কি করতে হবে? কেন, টাকা আনতে হবে নিশ্চয়। তলায় পৌঁছলেই দেখবে একটা চওড়া পথ চলে গেছে। প্রচুর আলো পাবে, একশোর বেশি বাতি জ্বলছে

সেখানে। তার পর দেখবে তিনটি দরজা, প্রত্যেকটার গায়ে চাবি লাগানো। প্রথম দরজা খুলে যে ঘরে ঢুকবে তার মধ্যিখানে, মেঝের ওপর, দেখবে একটা মস্ত সিন্দুক। সিন্দুকের ওপর দেখবে একটা কুকুর বসে আছে ; তার চোখ দুটো চায়ের পেয়ালার মতো বড়ো। তা হোক গে, তাই নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না। আমার এই নীল চাদরটা তোমাকে দিচ্ছি, এটাকে মেঝের ওপর পেতে, চট্ করে কুকুরটার কাছে গিয়ে, তাকে পাকড়ে ধরে চাদরের ওপর নামিয়ে রেখ। তার পর সিন্দুক খুলে যত খুশি পয়সাকড়ি বের করে নিও। ওতে তামার পয়সা ছাড়া কিচ্ছু পাবে না। অবিশ্যি যদি তোমার রুপো বেশি পছন্দ হয়, তা হলে পাশের ঘরে গেলেই হল। সেখানে দেখবে একটা কুকুর, তার চোখ দুটো জাঁতাকলের মতো বড়ো। তাই দেখে একটুও ভয় পেয়ো না ; ওকেও আমার চাদরের ওপর নামিয়ে রেখে, আয়েস করে সিন্দুক খালি করতে পারবে। অবিশ্যি তামা রুপোর চাইতে যদি তোমার সোনা বেশি পছন্দ হয়, যত সোনা বইতে পার তত সোনা যদি চাও, তা হলে তৃতীয় ঘরটিতে যেও। সেখানকার সিন্দুকের ওপরে বসা কুকুরটার চোখ দুটো আমাদের গোল মিনারের মতো প্রকাণ্ড। কোনো ভয় নেই, তাকেও যদি ধরে আমার চাদরের ওপর বসাও, সে-ও তোমাকে কিচ্ছু বলবে না ; তার পর যত চাও তত সোনা সিন্দুক থেকে বের করে নিও।”

সেপাই বলল, “যা বলেছ, মতলবটা মন্দ নয় ! কিন্তু বুড়ি-মা, তার পর তোমাকে কত টাকা দিতে হবে শুনি ?” ডাইনী বলল, “কিচ্ছু না, একটা পয়সাও চাই না। তবে আমার ঠাকুমা শেষ যে-বার নীচে নেমেছিলেন, ভুলে একটা পুরনো দেশলাই-বাক্স ফেলে এসেছিলেন। সেইটি আমাকে এনে দিয়ো।”

সেপাই বলল, "বেশ, তা হলে দড়িগাছা দাও, আমি পথ দেখি।"

ডাইনী বলল, "এই নাও দড়ি আর এই নাও আমার নীল চাদর।"

সেপাই তখন গাছে চড়ে, গাছের আগার সেই গর্তটা দিয়ে ভিতরে নেমে দেখে কি না, ঠিক ডাইনী যেমন যেমন বলেছিল, একটা চওড়া পথ, তাতে কয়েকশো বাতি জ্বলছে।

সেপাই প্রথম দরজাটা খুলে দেখল, আরে বাবা! ঐ তো চায়ের পেয়ালার মতো বড়ো চোখওয়ালা কুকুরটা বসে বসে অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে!

সেপাই চাদরটা মাটিতে পাততে পাততে বলল, "বাঃ, লক্ষ্মী কুকুর! সোনা কুকুর!" এই বলে টপ্ করে তাকে চাদরের ওপর নামিয়ে ফেলল। তার পর বাক্স থেকে মুঠো মুঠো তামার পয়সা তুলে পকেট বোঝাই করে, সিন্দুকের ডালা বন্ধ করে, কুকুরটাকে আবার যথাস্থানে তুলে রেখে, সেপাই পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

উরি বাবা! এ কুকুরটার চোখ দুটো জাঁতাকলের চাকার মতো বড়ো। সেপাই বলল, "আমার দিকে অমন করে তাকিও না তো, চাঁদ, ওতে তোমার চোখ খারাপ হয়ে যাবে!" এই বলে কুকুরটাকে ডাইনীর চাদরের ওপর নামিয়ে ফেলল। তার পর সিন্দুক খুলে যেই-না দেখল ভেতরে রাশি রাশি রুপোর টাকা, অমনি সে পকেট থেকে তামার পয়সাগুলোকে ঘেন্নার সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, তাড়াতাড়ি পকেট আর পোঁটলা রুপোর টাকা দিয়ে বোঝাই করে ফেলল।

তার পর সে গিয়ে তৃতীয় ঘরে ঢুকল। এ ঘরের কুকুরটার চোখ দুটো সত্যি সত্যি গোল মিনারের মতো বড়ো। শুধু তাই নয়, তার ওপর চোখ দুটো সারাক্ষণ চাকার মতো ঘুরছিল।

তাকে দেখে, মাথা থেকে টুপি খুলে, সেপাই বলল, "সেলাম, জাঁহাপনা!" বাস্তবিক এমন একটা দৈত্যের মতো কুকুর সে জন্মে দেখেও নি, শোনেও নি। মিনিট দুই সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুকুরটাকে দেখল, তার পর ভাবল যত শিগ্‌গির কাজ সারা যায় ততই ভালো। এই ভেবে বিরাট কুকুরটাকে ধরে সিন্দুক থেকে নামিয়ে চাদরের ওপর রাখল। তার পর সিন্দুকের ডালা তুলল। ইস্‌, কত তাল তাল সোনার মোহর! এত সোনা দিয়ে শুধু যে কোপেনহাগেন শহরটাকে কিনে ফেলা যায় তাই নয়, তার ওপর পৃথিবীতে যেখানে যত কেক আর ফলের মোরব্বা আর টিনের সেপাই আর লাট্টু আর দোলনা-ঘোড়া আছে, সব কেনা যায়!

এবার সেপাইয়ের মন উঠল। তাড়াতাড়ি রুপোর টাকাগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে পকেট আর ঝুলি খালি করে, সেগুলোকে সোনার মোহর দিয়ে ঠাসল। আর শুধু পকেট আর ঝুলিই নয়, টুপিতে মোহর ভরল, জুতোয় ভরল; সব মিলে এমনি ভারী হল যে হাঁটাই মুস্কিল হয়ে দাঁড়াল। তার পর কুকুরটাকে আবার সিন্দুকের ওপর তুলে দিয়ে, দুম্‌ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে, হাঁক দিল, "কই, ডাইনীবুড়ি, এবার আমাকে তোল দিকিনি।"

বুড়ি বলল, "দেশলাই-বাক্স পেয়েছ?" সেপাই বলল, "ঐ যাঃ! একেবারে ভুলেই গেছিলাম!" এই বলে ফিরে গিয়ে তাক থেকে দেশলাই-বাক্সটা নিয়ে এল। তার পর বুড়ি ওকে টেনে তুলল। দেখতে দেখতে পকেট, জুতো, পুঁটলি, টুপিভরা সোনার মোহর নিয়ে সেপাই আবার রাজপথে নেমে দাঁড়াল।

নেমেই বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, "দেশলাই-বাক্স দিয়ে তুমি কি করবে?"

বুড়ি চটে গেল। "তোমার তাতে কি দরকার শুনি? টাকা পাবার কথা, টাকা পেয়ে গেছ; এক্ষুণি আমার দেশলাই-বাক্স আমাকে দিয়ে দাও, বলছি!"

সেপাই বলল, "বেশ, তুমিই বল কি চাও, দেশলাই-বাক্স দিয়ে কি করবে তাই বলবে, নাকি তোমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলে দেবে?"

বুড়ি চীৎকার করে বলল, "না, বলব না!" কাজে কাজেই তলোয়ারটা-না বের করে এক কোপে সেপাই ডাইনীবুড়ির মুণ্ডু কেটে ফেলল। তার পর মোহরগুলোকে দিব্যি করে বুড়ির নীল চাদরে বেঁধে নিয়ে সেটাকে পিঠে ঝুলিয়ে, দেশলাই-বাক্স পকেটে ফেলে, কাছেই একটা শহর ছিল, তাতে গিয়ে ঢুকল।

চমৎকার প্রকাণ্ড এক শহর। সেখানকার সবচাইতে ভালো হোটেলে গিয়ে, সবচাইতে ভালো ঘর ভাড়া নিয়ে, সেপাই সব-চাইতে বাছাই করা খাবার ফরমায়েস দিল। এখন সে বড়োলোক হয়েছে, হাতে তার দেদার টাকাকড়ি।

হোটেলের যে চাকরটা ওর জুতো সাফ করল, তার এ কথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে এমন এক ধনী মক্কেলের জুতো কেন এত ছেঁড়া-ময়লা হবে। সে যাই হোক, পরদিনই সেপাই গিয়ে নতুন জুতো, শৌখিন পোশাক কিনে আনল। এখন সে একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি হয়েছে, হোটেলের লোকদের ডেকে জানতে চাইল এ শহরে আমোদ-আহ্লাদের কি কি ব্যবস্থা আছে, তাদের রাজা কেমন লোক, তাঁর মেয়ে ওদের সুন্দরী রাজকুমারীই-বা কেমন।

সেপাই বলল, "ঐ রাজকুমারীকে একবার দেখতে ইচ্ছা করে।"

ওরা বলল, "তা তো হবার জো নেই, তাঁকে কেউ দেখতে

পায় না, কারণ তিনি একটা প্রকাণ্ড তামার তৈরি প্রাসাদে বাস করেন। প্রাসাদটা উঁচু পাঁচিল আর দুর্গ দিয়ে ঘেরা। রাজা ছাড়া কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পায় না, কারণ কে নাকি গণনা করে বলেছে যে রাজার মেয়ের সঙ্গে একটা সাধারণ সেপাইয়ের বিয়ে হবে। রাজার সেটা একেবারেই পছন্দ নয়।”

সেপাই মনে মনে বলল, ‘তা হতে পারে, তবু রাজকন্যাকে অন্তত একবার দেখতে ইচ্ছা করে।’

যাই হোক আমোদ-আহ্লাদে তার দিন কাটতে লাগল। সে প্রায় রোজ নাটক অভিনয় দেখত, রাজার বাগিচায় বেড়াতে যেত, গরিবদের অনেক টাকা দান করত। সে তো নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই জানত ট্যাঁক খালি থাকার কী কষ্ট! সর্বদা সে সেজেগুজে, একপাল বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়াত। বন্ধুরা সবাই একবাক্যে বলত তার মতো খাসা লোক হয় না, একেবারে অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি! এ-সব কথা শুনে সেপাই তো মহা খুশি। কিন্তু একদিকে এত দান-খয়রাত আর খরচ করলে, আর অন্য দিকে ঘরে এক পয়সা না আনলে, শেষটা তার টাকা-কড়ি তো ফুরিয়ে যাবেই।

তার পর এমন দিন এল. হাতে যখন দুটি পয়সা ছাড়া আর কিছু রইল না। তখন বেচারা ঐ শৌখিন ঘরদোর ছেড়ে দিয়ে, একটা বাড়ির চিলেকোঠায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হল। সেখানে তাকে নিজেই নিজের জুতো সাফ কবতে আর ছেঁড়া জামায় রিপুকর্ম করতে হত। বন্ধুরা কেউ ধারে কাছে আসত না, নাকি অতগুলো সিঁড়ি ভাঙতে তাদের বেজায় কষ্ট হয়!

একটা ঘুটঘুটে অন্ধকার সন্ধ্যায় একটা খড়ের মশাল জ্বালবার পয়সা পর্যন্ত হাতে নেই, এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই যে ফোঁপরা গাছের ভেতর থেকে ডাইনীবুড়ির দেশলাই-

বাক্স এনেছিল, তার মধ্যে কয়েকটা দেশলাই ছিল। যেই-না মনে পড়া, অমনি সেপাই বাক্সটা বের করে দেশলাই জ্বালতে গেল। একবার দেশলাই ঘষেছে, একটা দুটো ফুলকি ছুটেছে, অমনি হঠাৎ হুস্ করে ঘরের দরজা খুলে গেল। তার পর খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল গাছের তলাকার গহ্বরে দেখা, চায়ের পেয়ালার মতো চোখওয়ালা সেই কুকুরটা। সে বলল, "প্রভু দাসকে আজ্ঞা করুন।"

সেপাই বলল, "এ তো বেড়ে মজা! দেশলাই-বাক্সটাও তো খাসা, যদি তার সাহায্যে যা চাই তাই পাওয়া যায়!"

তার পর কুকুরকে বলল, "এক্ষুণি কিছু টাকাকড়ি নিয়ে এসো।" বলবামাত্র কুকুরটা অদৃশ্য হয়ে গেল আর নিমেষের মধ্যে মুখে এক থলি তামার পয়সা নিয়ে ফিরে এল।

এতক্ষণে ঐ চমৎকার দেশলাই-বাক্সের আসল গুণ বোঝা গেল। একবার দেশলাই ঘষলে তামার সিন্দুকের কুকুর আসে, দুবার ঘষলে রুপোর সিন্দুকের পাহারাদার কুকুর আসে আর তিনবার ঘষলে, তক্ষুণি সোনার মোহরের বিকটাকার পাহারাদার এসে হাজির হয়।

এখন আর তার আগেকার সেই রাজার যোগ্য ঘর-বাড়িতে ফিরে যেতে কোনো বাধা রইল না। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নতুন পোশাক কেনা হল; বন্ধুবান্ধবদের আবার তার কথা মনে পড়ে গেল, তারা তাকে আবার আগের মতোই ভালোবাসতে লাগল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ তার একটা খেয়াল চাপল; সে ভাবল, 'এ তো ভারি অদ্ভুত যে এখানকার রাজকন্যাকে কেউ দেখতে পায় না! সবাই বলে তিনি নাকি ভারি রূপসী অথচ ঐ বিরাট তামার প্রাসাদে তাঁকে বন্ধ করে রাখা হয়;

এ তো বড়ো অন্যায় কথা। আমার এদিকে বড়োই ইচ্ছা করে তাঁকে একবার দেখি। আচ্ছা, আমার দেশলাই-বাক্সটা গেল কোথায়?' এই বলে যেই-না সে একবার তাতে কাঠি ঘষেছে, অমনি চায়ের পেয়ালার মতো চোখওয়ালা কুকুরটা এসে হাজির!

সেপাই বলল, "আমি জানি এখন অনেক রাত হয়েছে, কিন্তু বুঝলে কিনা তবু এক মিনিটের জন্যে হলেও, রাজকন্যাকে একবার দেখতে চাই।"

অমনি কুকুরটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল আর সেপাই কি বলবে বা কি করবে ভাববার আগেই, ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পিঠে নিয়ে ফিরে এল।

বাঃ! এই তো সত্যিকার রাজকন্যা, কী সুন্দর দেখতে, কী অপরূপ রূপসী! সেপাই আর থাকতে পারল না; হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তাঁর হাতে একটা চুমো খেল। পর মুহূর্তেই ঘুমন্ত রাজকন্যাকে পিঠে নিয়ে, কুকুরটা তামার প্রাসাদে ফিরে গেল। পরদিন সকালে রাজা-রানীর সঙ্গে খেতে বসে রাজকুমারী বললেন, যে কাল রাতে তিনি বড়ো অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বপ্নে-দেখলেন যেন একটা প্রকাণ্ড কুকুরের পিঠে চড়ে কোথায় গেলেন, সেখানে এক সেপাই হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর হাতে চুমো খেল।

শুনে রানী চটে বললেন, "বাঃ, বাঃ, খুব স্বপ্ন দেখেছ দেখছি!" পরদিন রাতে রানী জেদ করে তাঁর বুড়ি সখীদের একজনকে রাজকুমারীর খাটের পাশে পাহারায় রাখলেন, পাছে আবার কোনো স্বপ্ন তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়।

সন্ধ্যাবেলায় আবার সেপাই কুকুরকে ডেকে হুকুম করল রাজকন্যাকে নিয়ে আসতে। প্রাণপণে দৌড়ে তাই আনলও কুকুর; কিন্তু যতই দৌড়াক-না কেন, সেই পাহারাওয়ালা বুড়ি

তার পিছু নিল। বুড়ি দেখল রাজকন্যাকে নিয়ে কুকুর একটা প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বুড়ি ভাবল, 'ঠিক হয়েছে!' এই ভেবে কোঁচড় থেকে একটা খড়ি বের করে বাড়িটার দরজায় মস্ত একটা ক্রুশ এঁকে দিল। 'কিন্তু ফিরবার সময় ক্রুশ চিহ্নটা কুকুরের চোখে পড়ল। সে-ও অমনি আরেকটা খড়ি নিয়ে, শহরের প্রত্যেকটা দরজায় একটা করে ক্রুশ এঁকে রাখল।

ভোরবেলায় রাজা, রানী, সেই বুড়ি ভদ্রমহিলা, রাজবাড়ির সব আমলারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। সকলের বেজায় কৌতূহল রাজকন্যা রাতে কোথায় যান দেখতে হবে। রাস্তার প্রথম সদর-দরজায় ক্রুশ চিহ্ন দেখে রাজা বলে উঠলেন, "এই তো এইখানে!" রানী দেখলেন পাশের বাড়িতেও একটা ক্রুশ চিহ্ন। অমনি বলে উঠলেন, "তুমি কি চোখের মাথা খেলে গো? এই দেখ, এই বাড়ি!" তখন সবাই মিলে বলে উঠল, "না, না, ওটাও নয়, এই যে এখানে! এখানেও যে ক্রুশ আঁকা!" শেষে সবাই বুঝলেন 'সব দরজাতেই ক্রুশ আঁকা রয়েছে! অতএব আর খোঁজার কোনো মানে হয় না। সবাই মিলে বাড়ি ফিরে গেলেন।

রানী কিন্তু ভারি বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণ ছিলেন। বাড়ি গিয়ে সোনার কাঁচি বের করে, বড়ো একটা রেশমী কাপড়কে টুকরো টুকরো করে কেটে, আবার সেলাই করে জোড়া দিয়ে, চমৎকার একটা ছোট্টো থলি বানালেন। থলিটাকে রানী মিহি সাদা ময়দা ভর্তি করে, রাজকুমারীর কোমরে বেঁধে দিলেন! তার পর কাঁচি দিয়ে থলির গায়ে ছোট্টো একটা ছ্যাঁদা করে দিলেন, যাতে এতটুকু নড়লে চড়লে, ফুটো দিয়ে একটু একটু ময়দা ঝরে।

সেদিন রাতে কুকুর আবার এসে, রাজকন্যাকে পিঠে

তুলে সেপাইয়ের কাছে নিয়ে গেল। তার একবারও খেয়াল হল না যে প্রাসাদ থেকে সেপাইয়ের বাড়ি অবধি, আবার সেপাইয়ের বাড়ি থেকে প্রাসাদ অবধি, আসতে যেতে সারা পথ থলির ছোট্টো ফুটো দিয়ে ঝুরঝুর করে ময়দা ঝরেছে। কাজেই পরদিন সকালে রাজা-রানী খুব সহজেই টের পেলেন তাঁদের মেয়েকে রাতে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন সেপাইকে ধরে কারাগারে বন্দী করা হল।

বেচারি সেখানে বসে রইল, সে কী অন্ধকার, কী বিরক্তিকর! তার উপর কারারক্ষী একটুক্ষণ পর পর এসে তাকে মনে করিয়ে দিতে লাগল যে পরদিন তার ফাঁসি হবে। এমন খবর শুনতে কার ভালো লাগতে পারে? এদিকে তাড়াতাড়িতে সেপাই দেশলাই-বাক্সটাকে আবার বাসায় ফেলে এসেছিল।

সকাল হলে, সরু জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সেপাই দেখল শহরের লোকেরা কেমন দলে দলে তার ফাঁসি দেখতে চলেছে! দূরে ঢাক বাজছে; তার পর সেপাই দেখল রাজ-সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করে বধ্যভূমিতে যাচ্ছে। আর সে কি ভিড়, সবাই ছুটে চলেছে! তাদের মধ্যে ছিল এক মুচির শিক্ষা-নবীশ ছোকরা। সে এমনি ছুটে চলেছিল যে পা থেকে এক পাটি চটি ছিট্‌কে গিয়ে, সেপাইয়ের জানলার গরাদে লাগল।

সেপাই তাকে ডেকে বলল, "ও ভাই, থাম, থাম, অত তাড়াতাড়ি কিসের? আমি না গেলে তো মজা আরম্ভ হবে না। কিন্তু তার আগে যদি এক দৌড়ে আমার বাসায় গিয়ে আমার দেশলাই-বাক্সটা এনে দাও, তা হলে দুটো পয়সা পাবে! প্রাণপণে ছুটতে হবে কিন্তু।" দুপয়সা পাবে শুনে ছেলেটা মহা খুশি। অমনি এক ছুটে নিমেষের মধ্যে দেশলাই-বাক্সটা সেপাইকে এনে দিল। তার পর—এক্ষুনি বলছি তার পর কি কাণ্ড হল।

শহরের বাইরে ফাঁসি-কাঠ খাড়া করা হয়েছিল। তার চারদিকে রাজ-সৈনিকরা দাঁড়িয়েছিল আর লক্ষ লক্ষ লোক। রাজা-রানী চমৎকার দুটো সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁদের সামনে বিচারকরা আর সমস্ত সভাসদরা।

সেপাইকে বের করে আনা হল। ঘাতক সবে তার গলায় ফাঁসির দড়ি পরাতে যাবে, এমন সময় সেপাই রাজা-রানীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল শেষ এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিতে পারে কি না। এমন সামান্য একটা প্রার্থনায় রাজা আর না করেন কি করে? অমনি সেপাই দেশলাই-বাক্স বের করে প্রথমে একবার, তার পর দুবার তার পর তিনবার, তাতে কাঠি ঘষল আর অমনি সেই তিনটে জাদুর কুকুর এসে হাজির হল!

সেপাই বলল, "এবার আমাকে সাহায্য কর! দেখো যেন ওরা আমাকে ফাঁসি না দেয়!" বলামাত্র সেই বিকট কুকুর তিনটে বিচারক আর সভাসদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, একেক-জনাকে মুখে করে তুলে এই উঁচুতে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। অত উঁচু থেকে পড়ে তারা সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল!

রাজা সবে বলতে শুরু করেছিলেন, "দেখ, আমরা এমন কিছু করব না যাতে—" কিন্তু গোল মিনারের মতো চোখ-ওয়ালা ভীষণ কুকুরটা কি যে তাঁরা করবেন না সে কথা বলবার আর সময় দিল না, অমনি রাজা-রানীকে মুখে করে তুলে সভাসদদের মতো শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

এদিকে রাজার সৈনিকরা তো ভয়ে আধমরা; তখন ভিড়ের লোকরা এক বাক্যে চেঁচিয়ে উঠল, "ও সেপাই, তুমি বড়ো ভালো, তুমিই আমাদের রাজা হবে আর সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, তিনি আমাদের রানী হবেন।"

এলডার-মার কথা

অনেকদিন আগে একটি ছোটো ছেলে ছিল ; এক দিন পা ভিজিয়ে ঠাণ্ডা লেগে, তার হল জ্বর। এদিকে খট্‌খটে চমৎকার দিন তবু পা যে কি করে ভেজাল, তা কেউ ভেবেই পেল না। ওর মা কাপড়-চোপড় ছাড়িয়ে দিলেন বিছানায় শুইয়ে। তার পর মা ছোট্টো একটা চা-দানি নিয়ে এলেন, এল্‌ডার গাছের ফুল দিয়ে ছেলের জন্য ওষুধ তৈরি হবে। ঠিক সেই সময়, ওদের বাড়ির সব চাইতে উপর তলায় যে বুড়ো থাকত, সে-ও নেমে এল। বেচারি একেবারে একা থাকত, ওর না ছিল একটা বৌ, না ছিল ছেলেপুলে! কিন্তু পাড়া-পড়শীদের ছেলে-মেয়েদের বুড়ো বেজায় ভালোবাসত আর তাদের কত যে চমৎকার সব রূপকথা আর গল্প বলত যে দেখলেও ভালো লাগত।

মা বললেন, "এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো ওষুধটা খেয়ে ফেল দিকিনি, তা হলে কে জানে হয়তো একটা গল্প শুনতে পাবে।"

বুড়ো হেসে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক তাই, তবে কিনা, এখন নতুন কিছু মনে পড়লে হয়। আচ্ছা, ছেলেটা পা ভেজাল কোথায় ?"

মা বললেন, "কি জানি, কেউ তো ভেবে পাচ্ছে না!"
ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, "তা হলে কি গল্প শুনতে পাব না ?"

বুড়ো বলল, "নিশ্চয় পাবে ; যদি আমাকে বলতে পার তোমাদের স্কুলে যাবার গলির নালায় কতখানি জল। আগে সেইটে জানা দরকার।"

ছেলে বলল, "এ আর এমন কি, আমার বুট-জোড়ার অর্ধেক অবধি জল ; তাও যদি নালার গর্তটার মধ্যে নামি।"

বুড়ো বলল, "তাই বলো, ঐখানেই বুঝি জুতো-জোড়া ভিজে গেছিল ?- তা হলে এবার বোধ হয় গল্প শুনতে চাইবে ; কিন্তু সত্যি বলছি, আর নতুন গল্প আমার জানা নেই।"

ছেলেও নাছোড়বান্দা, "তুমি তো এক নিমেষে গল্প বানাও। মা বলেছেন তুমি যে জিনিসের দিকে তাকাও সেটাই রূপকথা হয়ে যায়, তুমি যাতে হাত দাও অমনি সেটা গল্প হয়ে যায়।"

"তা হয় ; তবে ও-সব গল্প এমন কিছু ভালো হয় না। আসল গল্পটা নিজে থেকেই তৈরি হয় ! তারা আমার কপালে টোকা দিয়ে বলে 'এই যে আমরা এসেছি' !"

ছোটো ছেলেটি বলল, "তা হলে আশা করি এক্ষুণি ওরা এসে তোমার কপালে টোকা দেবে।" ওর মা তাই শুনে খুব হেসে, ছোট্টো চা-দানিতে এল্‌ডার ফুলের উপর খানিকটা ফুটন্ত জল ঢেলে দিলেন।

ছেলেটা বলল, "এবার, গল্প হোক ; বলো না একটা !"

"আরে, গল্প এলে তো বলব। ওনার ভারি দেমাক ; যখন ইচ্ছে হবে, শুধু তখন আসবে। এই, চুপ !" তার পর হঠাৎ বুড়ো বলল, "এই এল বলে ! নজর রাখ, ভাই, হাঁড়িটাতে ঢুকল গিয়ে।"

ছোটো ছেলেটি তার মায়ের চা-দানির দিকে তাকাল। দেখল ঢাকনিটা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে আর এল্‌ডার ফুল বেরিয়ে

আসছে। কী সুন্দর দেখতে, কী ভালো গন্ধ! দেখতে দেখতে ফুল থেকে মোটা মোটা লম্বা লম্বা ডালপালা গজিয়ে গেল, এমন-কি, চা-দানির নল থেকেও ডালপালা বেরুল! দেখতে দেখতে চারদিক ডালপাতায় ছেয়ে গেল; তবু গাছটা আরো বাড়তে লাগল; বেড়ে বেড়ে শেষটা খাটের পাশে দিব্যি একটা এল্‌ডার গাছ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রইল। নিখুঁত আস্ত একটা গাছ, তার ডালপালা বিছানার উপর ঝুলে থাকল, পরদা-টরদা সরিয়ে। গাছ ভরা সাদা ফুল, তার কি সুন্দর! গাছের ঠিক মধ্যিখানে একজন বুড়ি বসে আছেন, কী কোমল মিষ্টি তাঁর মুখ। অদ্ভুত পোশাক তাঁর গায়ে, এল্‌ডার গাছের পাতার মতো সবুজ, তার উপর থোপা থোপা এল্‌ডার ফুলের নক্‌শা। দেখে বোঝে কার সাধ্য যে ওটা একটা পোশাক, নাকি সত্যি গাছে সত্যি ফুলপাতা গজিয়েছে!

ছোটো ছেলেটা জিজ্ঞাসা করল, "ওর নাম কি?"

বুড়ো বলল, "সেকালের গ্রীস রোমের লোকরা তো ওঁকে 'ড্রায়াড' নামে ডাকত, তার মানে বনদেবী, ও-সব উদ্‌ভুট্টি নাম আমরা বুঝি-সুঝি না! জাহাজের নাবিকরা তার চেয়ে ভালো নাম দিয়েছিল, তারা ওঁকে ডাকত, এল্‌ডার-মা বলে। ও নামটি দিব্যি মানায়। এবার ঐ সুন্দর গাছটির দিকে তাকিয়ে আমার কথা শোন দিকি।"

"এক সময় ঠিক ঐরকম আরেকটা ফুলে ভরা বড়ো গাছ বিশ্রী এক উঠোনের কোণে গজিয়েছিল। একদিন বিকেলে, সেই গাছতলায় দুজন বুড়ো মানুষ এসে বসল। এক বেজায় বুড়ো নাবিক আর তার বেজায় বুড়ি বৌ। তাদের নাতির ছেলে জন্মে গেছিল, শিগ্‌গিরই তাদের বিয়ের পর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে, সেদিন উৎসব করার কথা, কিন্তু বিয়ের ঠিক তারিখটি দুজনের

মধ্যে কেউ মনে করতে পারছিল না। এল্ডার-মা ওদের মাথার উপরে গাছের মধ্যে বসে ছিলেন, মুখটা তাঁর ঠিক এইরকম খুশি-খুশি। তিনি বললেন, 'আহা, আমি কিন্তু ঠিক তারিখটি জানি।' ওরা ওঁর কথা শুনতেই পেল না, বসে বসে দুজনে সেকালের গল্প করতে লাগল।

"বুড়ো নাবিক বলল, 'কিগো, তোমার মনে নেই সেই যখন আমরা খুব ছোট্টো ছিলাম, তখন যেখানে এখন আমরা বসে আছি, এই উঠোনটিতেই কেমন দৌড়োদৌড়ি খেলাধুলো করতাম। মনে আছে মাটিতে কাঠি পুঁতে কেমন বাগান করতাম?'

"বুড়ি বলল, 'মনে আছে বৈকি। সেই কাঠিগুলোতে আমরা রোজ জল ঢালতাম। কিন্তু মাত্র একটা কাঠির শেকড় গজালো, সেটাই এই এল্ডার গাছটি! কেমন দিব্যি সবুজ ডাল-পালা মেলে দেখতে দেখতে এই বড়ো হয়ে গেল আর তারই নীচে আজ আমরা বুড়ো-বুড়িতে বসে আছি!'

"বুড়ো বলল, 'ঠিক তাই! ঐ কোণে বালতিভরা জল থাকত, তাতে আমি নৌকো ভাসাতাম! নিজের হাতে কাঠ কুরে নৌকো বানাতাম; কী খাসা সব নৌকো বল দিকিনি! কিন্তু দেখতে দেখতে আমাকে সত্যিকার নৌকোতে চড়ে সাগর পাড়ি দিতে হল! সে জাহাজগুলো আমারই খেলার নৌকো থেকে বেশ খানিকটা বড়ো ছিল, কি বল গিন্নী?'

"বৌ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে স্কুলে গেলাম মনে নেই? তার পর গির্জায় আমাদের কেমন দীক্ষা হল। বেশ মনে আছে দুজনে ভেউ-ভেউ করে কেঁদেছিলাম। তার পর বিকেলে হাত ধরাধরি করে গোল দুর্গের চুড়োয় উঠে দুনিয়া দেখেছিলাম, সারা কোপেনহাগেন শহর, সমুদ্র-টমুদ্র সব। তার পর ফ্রেডারিক্সবার্গে গেলাম, সেখানে খালের জলে রাজা-রানী

চমৎকার বজরায় চড়ে বেড়াচ্ছিলেন!' বুড়ো বলল, 'অবিশ্যি আমি যে-সব বিশাল বিশাল জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি দিতাম, তার কাছে আমার খেলার নৌকোও যেমন, তোমার রাজা-রানীর ঐ বজরাও প্রায় তাই! কত বছরের পর বছর জাহাজে চড়ে ঘুরতে হয়েছিল আমাকে!'

"বৌ বলল, 'হ্যাঁ। তোমার জন্য আমি কি কান্নাটাই-না কাঁদতাম! ভাবতাম নিশ্চয় মরে গেছ, চিরদিনের মতো চলে গেছ, সমুদ্রের তলায় অতল গভীরে কোথায় ডুবে গেছ! কত সময় রাতে উঠে গির্জার চুড়োয় হাওয়া-সংকেতের দিকে তাকিয়ে থাকতাম, দেখতাম হাওয়া পাল্টাল কি না। বার বার হাওয়া পাল্টাত তবু তুমি ফিরে আসতে না!

" 'একদিনের কথা আমি জন্মে ভুলব না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। যে-বাড়িতে আমি দাসীর কাজ করতাম, সেখানে জঞ্জাল কুড়োবার লোক এসেছিল, আমি জঞ্জালের ঝুড়ি নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় ডাকওয়ালা এসে আমাকে একটা চিঠি দিল। তোমার চিঠি। তখুনি খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়ে, একবার হাসি, একবার কাঁদি, এমনি আনন্দ হয়েছিল! ঐ চিঠিতে তুমি লিখেছিলে তুমি গরম দেশে গেছ, সেখানে কফির গাছ হয়—না জানি কি অপূর্ব সেই-সব দেশ! কত কথাই-না লিখেছিলে, মনে হচ্ছিল সব যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি! এদিকে ঝম্‌ঝম্‌ করে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি জঞ্জালের ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি! এমন সময় কে জানি পেছন থেকে এসে আমাকে ধরল!—'

" 'তাই বটে! আর তুমিও তার কানটা ধরে এমনি কষে প্যাঁচ দিলে, বাপ্‌ রে তার কি জ্বলুনি!'

“ ‘বাঃ রে ! আমি কি করে জানব তুমি চিঠির সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হবে ! কি ভালোই-না দেখতে ছিলে ! অবিশ্যি এখনো তাই আছ। তোমার পকেটে মস্ত একটা হলদে রঙের রেশমী রুমাল, মাথায় একটা নতুন টুপি ! কী বাদলাই করেছিল সেদিন, পথঘাট ভেসে গেছিল !’

“নাবিক বলল, ‘তার পর আমাদের বিয়ে হল, মনে আছে সে কথা ? তার পর আমাদের প্রথম ছেলে হল, তার পর মারি, নীল্‌স্, পিটার, হ্যান্স ক্রিশ্চান !’ ‘আহা, বল তো কী সুখের কথা যে ওরা সবাই বড়ো হয়ে কেমন লক্ষ্মীমন্ত হয়েছে, কী খাটতে পারে, সবাই ওদের কি ভালোই-না বাসে !’

“বুড়ো বলল, ‘আহা, ওদের ছেলেপুলেদের কথাও বল ! আমাদের ছেলেমেয়েদের আর নাতি-নাতনিদের কেমন স্বাস্থ্য, তাই বল ! কাজেই আমার মনে হচ্ছে, এইরকম সময়ই আমাদের বিয়ে হয়েছিল !’ এল্‌ডার-মা তখন দুজনার মাঝখান দিয়ে মাথা গলিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, আজই তোমাদের বিয়ের পর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল।’ ওরা কিন্তু কিছু টের পেল না, ওরা ভাবল ঐ বুঝি পাড়ার কেউ ওদের দেখে মাথা নাড়ছে। ওঁর দিকে ওরা তাকালই না, দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে, এ ওর হাত ধরে বসে রইল।

“কিছুক্ষণ বাদে ওদের ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি সবাই উঠোনে বেরিয়ে এল। তারা ভালো করেই জানত আজই ওদের বিয়ের দিন, তাই সবাই মিলে ওদের অভিনন্দন জানাতে এসেছিল। বুড়ো-বুড়ি কিন্তু তারিখটার কথা একেবারে ভুলে গেছিল, অথচ আধ শতাব্দী আগেকার সব ঘটনা তাদের পরিষ্কার মনে ছিল। গাছের ফুলের সুগন্ধে চারদিক ম-ম করছিল, সূর্য ডোবে ডোবে, তার কোমল রোদ এসে বুড়ো-বুড়ির মুখে

পড়েছিল, কী মিষ্টি লালচে রোদ সে আর কি বলব! সব-চাইতে ছোটো নাতি ওদের চারদিকে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। ফুর্তির চোটে তার সে কী চীৎকার, রাতে কিনা মহা ভোজ হবে, সে যা চমৎকার করে আলু রান্না হচ্ছে! এল্‌ডার-মাও গাছ থেকে মাথা-টাথা দুলিয়ে ওদের সমান জোর গলায় হৈ-চৈ করতে লাগলেন।”

বুড়োর গল্প বলা থামলে, ছোটো ছেলেটা বলল, “ও আবার কেমন গল্প? ওকে আমি গল্পই বলি না।” বুড়ো লোকটা ছিল ভালো। সে বলল, “বল না বুঝি? আচ্ছা, তা হলে এল্‌ডার-মার মতটাই শোনা যাক!” এল্‌ডার-মা বললেন, “না, বাছা, তুমি ঠিকই বলেছ, ওটা ঠিক গল্প নয়। এইবার গল্প শুনতে পাবে। আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব কেমন করে রোজকার সাধারণ ঘটনার ভিতর থেকে রূপকথা জন্ম নেয়। আরে তাই যদি না হত, তা হলে আমার এই সুন্দর এল্‌ডার গাছটিই-বা কি করে চা-দানির ভিতর থেকে গজাতো?”

তার পর এল্‌ডার-মা ছেলেটাকে বিছানা থেকে তুলে বুকের কাছে নিয়ে বসলেন। ফুলে ভরা ডালপালাগুলো চারদিক থেকে ওদের এমন করে ঘিরে রইল যে মনে হল যেন একটা কুঞ্জবনে বসে আছে। চারদিকে পাতার রাশি কী ঘন, কী সুন্দর তার গন্ধ! তার পর সেই কুঞ্জবনটা ওদের নিয়ে আকাশে উড়ে পড়ল, সে যে কী ভালো লাগল! এর মধ্যে হঠাৎ কখন বুড়ি এল্‌ডার-মা একজন রূপসী লাবণ্যময়ী অল্পবয়সী মেয়ে হয়ে গেলেন। এল্‌ডার-মার মতোই পোশাক তার গায়ে, তাজা সবুজ রঙের, তার উপর থোপা থোপা সাদা ফুলের নক্‌শা। তবে তার বুকে একছড়া সত্যিকার এল্‌ডার ফুল ছিল আর মাথার সোনালি কোঁকড়া চুলেও এল্‌ডার ফুলের গুচ্ছি জড়ানো! বড়ো-

বড়ো নীল রঙের চোখ, এমন সুন্দর মেয়ে দেখলেও মন খুশি হয়ে যায়। দুজনে দুজনাকে আদর করতেই, মেয়েটি ছেলেটার সমবয়সী হয়ে গেল। কী ভাব দুজনার মধ্যে, কী আনন্দ তাদের!

হাত ধরাধরি করে তারা কুঞ্জবন থেকে বেরিয়েই তাদের বাড়ির বাগানে পৌঁছে গেল সেখানকার ঘাসজমিতে ওদের বাবার লাঠিটাকে দেখতে পেল। দেখে মনে হল লাঠিটারও প্রাণ আছে। ঘোড়ায় চড়ার মতো করে লাঠিটাতে চাপতেই, লাঠির চক্‌চকে হাতলটা একটা ঘোড়ার মাথা হয়ে গেল, কী তার ডাক, কী তেজ, যেন আগুন ছুটছে! ঘোড়ার ঘাড়ের লম্বা কালো চুল বাতাসে উড়তে লাগল, চারটি সরু লম্বা পা বেরুল। নতুন ঘোড়া দেখতেও যেমন, তেমনি তার তেজ; ওদের পিঠে নিয়ে ঘাসজমির চারধারে সে ছুটতে লাগল। সে কী মজা! ছেলেটা বলল, "চল, অনেক দূরে যাওয়া যাক। গত বছর যে সুন্দর বাগান-বাড়িতে গেছিলাম, সেখানে যাওয়া যাক।" তখনো ওরা ঘাসজমির চারদিকেই ঘুরছিল, মেয়েটি খালি বলছিল—সে অবিশ্যি আসলে এল্‌ডার-মা ছাড়া কেউ নয়, "এই দেখ, পাড়াগাঁয়ে পৌঁছে গেলাম। ঐ দেখ কী সুন্দর কুটির! তার ওপর এল্‌ডার গাছটি কেমন ঝুঁকে পড়েছে। মোরগটা কেমন ঘুরে ঘুরে মাটি আঁচড়ে, মুরগিদের জন্য খাবার খুঁজছে। দেখ, ওর চলার চালটি দেখ! এবার গির্জার কাছে এলাম। ঐ দেখ পাহাড়ের উপর বড়ো-বড়ো ওক্‌গাছের মাঝখানে গির্জা! এবার কামারের দোকানে পৌঁছলাম; গন্‌গনে আগুন জ্বলছে, নেংটি-পরা লোকগুলো কেমন জোরে হাতুড়ি পিটছে, চারদিকে আগুনের ফুলকি ছুটছে! চল, চল, বাগান বাড়িতে যাই।"

ছোটো মেয়েটি যা বলে, তাই যেন ওদের পাশ দিয়ে ছুটে

চলে যায় ; ছেলেটা সব দেখতে পায়, অথচ তখনো ওরা ঘাস-জমিটার চারদিকেই ঘুরছে ! ওখানে একটা পায়ে চলার পথে ওরা খানিক খেলা করল, মাটিতে একটি ছোট্টো বাগান সাজাল, চুল থেকে একছড়া ফুল নিয়ে মেয়েটি সেই বাগানে পুঁতে দিল, অমনি সেটা গাছ হয়ে বাড়তে লাগল, ঠিক যেমন করে বুড়ো নাবিক আর তার বৌয়ের ছোটোবেলায় লাগানো গাছটি বেড়েছিল।

তার পর ছোটো মেয়েটি ছেলেটার কোমর জড়িয়ে ধরল, অমনি তারা ডেনমার্ক দেশের উপর দিয়ে উঁড়ে চলল। বসন্তকাল পূর্ণ হলে গ্রীষ্ম এল, গ্রীষ্ম পেকে হেমন্ত হল, হেমন্ত ক্রমে ফিকে হতে হতে ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে শীত দাঁড়াল। ছোটো ছেলের চোখে আর মনে হাজার ছবির ছায়া পড়ল। যেখানেই উড়ে যায় ওরা, এল্ডার ফুলের মিষ্টি গন্ধ ওদের ঘিরে থাকে। গোলাপ বাগানের ওপর দিয়ে যাবার সময় ছেলেটা গোলাপের সুবাস পায় ; বীচ্-গাছের তাজা গন্ধ বাতাসের সঙ্গে ভেসে কখনো নাকে আসে ; তবু মনে হয় সব গন্ধের সেরা হল ঐ এল্ডার ফুলের গন্ধ।

বীচ্বনে পৌঁছে মেয়েটি বলল, "বসন্তকাল কী ভালো ! আহা চিরকাল যদি বসন্ত হত !"

অমনি বীচ্বনের গাছে গাছে বোল ধরল ; গাছের গোড়ায় বুনো ফুলের সে কী মিষ্টি গন্ধ ! সবুজ পাতার মাঝখানে ফিকে রঙের মালতী ফুলকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল ! কোনো রাজার পুরনো গড়ের পাশ দিয়ে যাবার সময় মেয়েটি আবার বলল, "আহা, বর্ষাকাল কী ভালো !" গড়ের লাল রঙের ছোপ-ধরা দেয়াল, প্রাকারের ছায়া পড়েছে চারধারের পরিখার জলে। মাঠে সবুজ শস্যের খেতে বাতাস লেগে ঢেউ উঠল ; খালের ধারে ছোটো-ছোটো হলুদ লাল ফুল ফুটল, ঝোপে-ঝাড়ে বেয়ে উঠল বুনো স্বর্ণলতা আর ছোটো-ছোটো ঘণ্টার মতো দেখতে সাদা

সাদা ফুল। সন্ধ্যা হয়ে এল, আকাশে প্রকাণ্ড পূর্ণ চাঁদ উঠল, মাঠের ধারে খড়ের গাদা থেকে সুগন্ধ উঠল।

ছোটো কন্যে বলল, "হেমন্তকাল বড়ো সুন্দর!" অমনি মনে হল আকাশের গম্বুজ যেন আরো অনেক উঁচু, আরো অনেক বেশি নীল হয়ে গেল। বনে বনে রঙের জাদু লাগল, লাল, সবুজ, হলুদ। ডাকতে ডাকতে পাশ দিয়ে শিকারী কুকুরের দল ছুটে গেল, কাঁটালতায় ঢাকা পাথরের ঢিপির উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো পাখি উড়ল, তাদের চীৎকারে কানে তালা লাগল! দূরে সুনীল সুগভীর সাগরের উপর শত শত নৌকোর সাদা পাল দেখা গেল। খামারবাড়ির গোলায় কত বুড়ি, কত মেয়ে, কত ছেলেপুলে জুটে প্রকাণ্ড পিপেতে হপ্‌ফল ভরতে লাগল; তাই দিয়ে মদ তৈরি হবে। যাদের বয়স কম তারা গান ধরল, বুড়িরা গল্প বলতে লাগল, পুরনো সব রূপকথা, পরীদের কথা জাদুমন্ত্রের কথা। এর চাইতে ভালো গল্প আর কি হতে পারে?

মেয়েটি বলল, "শীতকাল কী সুন্দর!" অমনি চারদিকের গাছগুলো তুষারের গুঁড়োয় ঢেকে গেল, পায়ের নীচে বরফ কিচ্‌কিচ্‌ করে উঠল, আকাশে উল্কাপাত হতে লাগল। সবার বসবার ঘরে বড়োদিনের সাজানো গাছে আলো জ্বালা হল, সকলে উপহার পেল, সবাই বড়ো খুশি হল। পাড়াগাঁয়ে চাষীর কুঁড়েতেও বেহালা শোনা গেল, সবাই টপাটপ্‌ পিঠে পুলি খেতে লাগল। সবচাইতে গরিব যে ছোটো ছেলে তার মুখেও শোনা গেল, আহা, শীতকাল কী সুন্দর!

সত্যিই, সব কিছু কী সুন্দর! ঐ আমাদের পরীদের মেয়েই ছোটো ছেলেটাকে এত ভালো ভালো জিনিস দেখাল, তখনো তাদের চারদিকে এল্‌ডার ফুলের গন্ধ ভুরভুর করছিল।

তার পর চোখের সামনে নতুন এক দৃশ্য ভেসে উঠল, সাদা ক্রুশআঁকা একটি লাল নিশান বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। এই নিশান উড়িয়েই বুড়ো নাবিক একদিন জাহাজে চড়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিল। ছেলেটার মনে হল এখন সেও বড়ো হয়েছে, এবার তাকেও ভাগ্য পরীক্ষা করতে বিশাল পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়তে হবে। বিদায় দেবার সময় ছোটো মেয়েটি নিজের বুক থেকে এল্‌ডার ফুলটি খুলে তাকে দিল। সে সেটিকে যত্ন করে রেখে দিল, তার উপাসনার গানের বইয়ের পাতার মাঝখানে। বিদেশে যখনি সে বইটি হাতে নিত, অমনি ঐ পাতাটি খুলে যেত, যেখানে স্মৃতি-চিহ্নের ফুলটি রাখা ছিল। যতই ফুলটিকে দেখত, ততই মনে হত ফুলটি যেন আরো তাজা হয়ে উঠছে! ফুলের দিকে তাকালে যেন ডেনমার্কের বীচ্‌বনের মিষ্টি বাতাস নাকে আসত, আগের কালের কত শত মধুর দৃশ্য আপনা থেকেই মনের মধ্যে ভেসে উঠত।

এমনি করে অনেক বছর কেটে গেল, ছোটো ছেলেটা বুড়ো হয়ে বুড়ো বৌয়ের সঙ্গে একটা ফুলে ভরা গাছের নীচে বসে রইল। তারা হাত ধরাধরি করে সেকালের গল্প করতে লাগল, তাদের বিয়ের পর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার কথা বলতে লাগল। মাথায় ফুলের ছড়া পরে, নীল-চোখ ছোটো মেয়েটি গাছের মধ্যে বসে বসে ওদের দিকে মাথা দুলিয়ে বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আজই তোমাদের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবার দিন।" তার পর নিজের চুল থেকে দু ছড়া ফুল খুলে, তাতে দুবার চুমো খেল। প্রথম চুমো খেতেই ফুলগুলি রুপোর মতো ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল; দ্বিতীয় চুমো খেতেই সোনার মতো ঝক্‌ঝক্‌ করতে লাগল। তার পর যখন সে ফুলের গোছা দুটিকে বুড়ো-বুড়ির মাথায় পরিয়ে দিল, তখন সেগুলো হয়ে গেল দুটি সোনার মুকুট।

তার পর দুজন রাজা-রানীর মতো মাথায় মুকুট পরে সুগন্ধে ভরা গাছতলায় বসে রইল। বুড়ো তখন বৌকে এল্‌ডার-মার গল্প বলল। এ গল্প তার নিজের ছোটোবেলায় শোনা। তাদের তখন মনে হতে লাগল যে, গল্পটার অনেক জায়গাই তাদের নিজেদের জীবনের কথার মতো শোনাচ্ছে আর ঐ জায়গাগুলোই সবচাইতে ভালো!

গাছ থেকে ছোটো মেয়েটি বলল, "ঠিক তাই; কেউ আমাকে ডাকে এল্‌ডার-মা, কেউ-বা বলে বনদেবী, কিন্তু আমার আসল নাম হল স্মৃতি। এইখানে গাছের মধ্যে বসে থাকি আর গাছটা কেবলই বাড়তে থাকে; কিছু ভুলি না, সব স্পষ্ট মনে থাকে। এবার দেখি তো সেই ফুলটি এখনো নিরাপদে আছে কি না।"

বুড়ো নাবিক তখন তার গানের বইটি খুলে দেখল। ঐ তো ফুলটি রয়েছে বইয়ের পাতার মাঝখানে, মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র তাকে পেড়ে এনে রাখা হয়েছে। স্মৃতি মাথা দোলাতে লাগল। বুড়ো-বুড়ি মাথায় সোনার মুকুট পরে গাছতলায় বসে রইল। বিকেলের পড়ন্ত রোদের লালচে আভায় তাদের মুখ দুটি রাঙা হয়ে উঠল। দুজনে চোখ বুজল; তার পর—তার পর—তার পর গল্পও ফুরিয়ে গেল।

ছোটো ছেলেটা খাটে শুয়ে ভাবতে চেষ্টা করল এ কি স্বপ্ন দেখল, নাকি গল্প শুনল। টেবিলের উপর চা-দানি রয়েছে, তাতে গাছপালা কিচ্ছু নেই। ওর বন্ধু সেই বুড়ো গল্পওয়ালাও ঠিক সেই সময়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। চোখ ঘষে ঘুম তাড়াতে না তাড়াতে তাকে আর দেখাই গেল না।

ছেলেটা বলল, "বাঃ, কি ভালোই যে লাগল, মা, কেমন গরম দেশে বেড়িয়ে এলাম।"

মা বললেন, "তা বেড়াবে না! দু পেয়ালা কানায় কানায়

ভরা গরম সালসে খেলে গরম দেশে যাবে না তো কোথায় যাবে ?” এই বলে মা তাকে পা থেকে গলা অবধি ভালো করে ঢেকে ঢুকে দিলেন, পাছে ঠাণ্ডা লাগে। “আমি যতক্ষণ এখানে বসে বুড়োর সঙ্গে তর্ক করছিলাম ওটা গল্প নাকি সত্যি ঘটনা, তুমি ততক্ষণ যা নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে বাবা!” ছেলেটা বলল, “এল্‌ডার-মা কোথায় ?”

মা বললেন, “চা-দানিতে, আবার কোথায় ? থাকুন ওখানে !”

বড়ো ক্লাউস আর ছোটো ক্লাউসের কথা

অনেককাল আগে এক গ্রামে একই নামের দুজন লোক থাকত। একজনের ছিল চারটে ঘোড়া, অন্যজনের মোটে একটি। কাজেই দুজনকে আলাদা করে চিনবার জন্য যে লোকটার চারটে ঘোড়া তাকে সবাই বলত বড়ো ক্লাউস আর যার একটি ঘোড়া তাকে বলত ছোটো ক্লাউস।

সারা সপ্তাহ ছোটো ক্লাউসকে বড়ো ক্লাউসের খেতে লাঙল দিতে হত আর ঘোড়াটি ধার দিতে হত। তার বদলে সপ্তাহে একটি দিন বড়ো ক্লাউস তাকে তার চারটি ঘোড়া ধার দিত; সে দিনটি ছিল রবিবার।

সেদিন ছোটো ক্লাউসের কী গর্ব! পাঁচ ঘোড়ার মাথার উপর সে চাবুক ঘোরাত আর মনে মনে ভাবত, অন্তত এই একটা দিনের মতো সে পাঁচ ঘোড়ার মালিক! সেদিন গাঁয়ের সবাই সেজেগুজে গির্জা যাবার পথে দেখত ছোটো ক্লাউস তার পাঁচটি ঘোড়া হাঁকাচ্ছে! তার আহ্লাদ দেখে কে? বারে বারে চটাৎ চটাৎ করে শূন্যে চাবুক ঘোরায় আর চীৎকার করে বলে, "কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! পাঁচ-পাঁচটা সেরা ঘোড়া আর সবকটি আমার!"

তাই শুনে বড়ো ক্লাউস বলল, "ও কথা বোলো না। তুমি তো

ভালো করেই জান যে মোটে একটা ঘোড়া তোমার। কিন্তু আবার যেই একদল লোক গির্জা যাবার পথে ওর পাশ দিয়ে চলে গেল, ছোটো ক্লাউস সে-সব কথা ভুলে গিয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল, "কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ! পাঁচ-পাঁচটা সেরা ঘোড়া আর সবকটি আমার!"

তাই শুনে বড়ো ক্লাউস বেজায় রেগে গেল। চটে বলল, "বলি নি তোমাকে মুখ সামলে কথা কইতে? ফের যদি ও কথা বল, তা হলে তোমার ঐ একটা ঘোড়ার কপালে এমনি এক বাড়ি দেব যে সঙ্গে সঙ্গে ওর ভবলীলা সাঙ্গ হবে আর পাঁচ-পাঁচটা সেরা ঘোড়া নিয়ে তোমার জাঁক করাও ঘুচে যাবে!"

ছোটো ক্লাউস বলল, "দোহাই, দাদা, আর ও কথা মুখে আনব না, সত্যি আনব না।" সেইরকম ইচ্ছাই তার ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটু পরে যেই আরো কয়েকজন লোক ঐ পথ দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখে খুশি হয়ে নমস্কার জানাল, ওর এমনি ফুর্তি লাগল যে মনে হল ঐটুকু এক ফালি জমি চষতে পাঁচটা ঘোড়া জুতে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। ব্যস্, আর যাবে কোথা, মাথার উপর চাবুকটি ঘুরিয়ে ছোটো ক্লাউস চেঁচিয়ে উঠল, "কেয়াবাৎ! কেয়াবাৎ। পাঁচ-পাঁচটা সেরা ঘোড়া, সবকটি আমার!"

এবার রাগে অন্ধ হয়ে বড়ো ক্লাউস বলে উঠল, "দাঁড়াও তোমার রোগের ওষুধ দিচ্ছি।" এই-না বলে প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলে ছোটো ক্লাউসের ঘোড়ার মাথায় ছুঁড়ে মারল। ঐ ভারী পাথর মাথায় লাগামাত্র ঘোড়া বেচারা মরে পড়ে গেল।

তাই দেখে ছোটো ক্লাউস কেঁদে উঠল, "হায়, হায়, এখন আমার একটাও ঘোড়া নেই!" খুব খানিকটা কেঁদে, তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে, ছোটো ক্লাউস মরা ঘোড়ার ছালটা ছাড়িয়ে,

বেশ করে হাওয়ায় শুকিয়ে, একটা থলিতে ভরে, থলিটা কাঁধে ফেলে শহরের দিকে চলল। চামড়াটা বেচতে হবে।

অনেক দূরের পথ, মাঝখানে আবার একটা প্রকাণ্ড ঘন বন। সেখানে পৌঁছতে-না-পৌঁছতে ভয়ংকর ঝড় উঠল। সে কী মেঘের ঘনঘটা আর ঝম্‌ঝমে বৃষ্টি, তার উপর কালো কালো ঝাউগাছগুলোর বাতাসে সে কী দোল খাওয়া! তাই দেখে ছোটো ক্লাউস বেচারা এমনি ভড়কে গেল যে পথটথ ভুলে একাকার। পথ খুঁজে পাবার আগেই সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল।

অল্প কিছু দূরেই একটা খামারবাড়ি দেখা গেল। জানলার সব খড়খড়ি বন্ধ, কিন্তু ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। ছোটো ক্লাউস এগিয়ে গিয়ে, দরজায় টোকা দিল। চাষী-বৌ এসে দরজা খুলল বটে, কিন্তু ক্লাউস একটু আশ্রয় চায় শুনবামাত্র দয়া করে বলে দিল, "অন্য জায়গায় চেষ্টা করো, বাপু। এখানে হবে না। কর্তা বাড়ি নেই। তিনি না এলে বাইরের লোককে ঘরে ঢুকতে দেওয়া যায় না।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "বেশ, তা হলে এই ঝড়-বাদলায় রাতটা আমাকে বাইরে কাটাতে হবে।" তাই শুনে চাষী-বৌ ওর নাকের উপর দড়াম্ করে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাছেই একটা খড়ের গাদা। সেটার আর বাড়ির মধ্যিখানে খড়ের চাল দেওয়া একটা মাচা। তাই দেখে ছোটো ক্লাউস মনে মনে বলল, 'ঐখানে উঠে পড়া যাক। দিব্যি খাসা খাটের মতো হবে। এখন বাড়ির ছাদের ঐ সারসটা না আবার বুদ্ধি করে নেমে এসে আমার পায়ে ঠোকরায়!' বাড়ির ছাদে সারসের বাসা। সেখানে সারস পাহারায় দাঁড়িয়ে ছিল, তার চোখে এক ফোঁটা ঘুম নেই, অথচ বেশ রাত হয়ে গেছিল।

তার পর ছোটো ক্লাউস আঁকড়ে-মাঁকড়ে মাচায় উঠে, এপাশ-ওপাশ করে খড়টড় সরিয়ে, নিজের জন্য দিব্যি আরামের একটা ঘুমোবার জায়গা করে নিল। মাচার পাশেই বাড়ির জানলার খড়খড়ি। সেগুলো আবার ভালো করে বন্ধ হয় না। মাচার উপর থেকে ছোটো ক্লাউস বাড়ির ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখতে পাচ্ছিল।

দেখল মস্ত একটা টেবিলে রুটি, মদ, ঝলসানো মাংস আর মাছভাজা সাজানো রয়েছে। চাষী-বৌ আর গির্জার পাশে গোরস্থানে যে লোকটা কবর খোঁড়ে, তারা দুজনে টেবিলে বসে

আছে। ঘরে আর কেউ নেই। চাষী-বৌ তার অতিথিকে এক গেলাস মদ ঢেলে দিচ্ছিল আর সে ব্যাটা ছুরি দিয়ে বড়ো গোছের এক টুকরো মাছ কেটে নিচ্ছিল ; মনে হল মাছভাজা তার ভারি পছন্দ।

ব্যাপার দেখে ছোটো ক্লাউস মনে মনে বলল, 'দেখেছ সব খাবার নিজেদের জন্য রেখেছে! কাজটা তো ভালো নয়। আহা, আমাকে যদি একটুখানি দিত!' এই ভেবে যতটা পারে জানলার কাছে এগিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখতে লাগল। এবার চোখে পড়ল চমৎকার একটা কেক। আরে, এ যে রীতিমতো ভোজ!

একটু বাদেই রাস্তা থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল। চাষী বাড়ি ফিরছে।

চাষী লোকটা ছিল ভারি অমায়িক, তবে তার একটা বিশেষ দুর্বলতা ছিল যে যারা কবর খোঁড়ে তাদের উপর সে হাড়ে চটা ছিল, তাদের দেখলেই ক্ষেপে উঠত। এদিকে পাশের শহরে যে লোকটা কবর খুঁড়ত, সে আবার চাষীর বৌয়ের আপন মাসতুতো ভাই। দুজনে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভারি ভাব ছিল। আজ চাষী বাড়ি থাকবে না জেনেই বেচারা বোনকে দেখতে এসেছিল। বোনও আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভাঁড়ারে যা কিছু ভালো জিনিস ছিল, সব বের করে এনে তাকে পেট ভরে খাওয়াতে বসেছিল।

এখন ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনে দুজনে আঁতকে উঠল। ঘরের কোণে মস্ত একটা খালি সিন্দুক ছিল ; চাষী-বৌ ভাইকে বলল, "শিগ্‌গির ওর মধ্যে ঢোক।" ভাইও তাড়াতাড়ি সিন্দুকে ঢুকে পড়ল, সে তো ভালো করেই জানত বাড়িতে হঠাৎ একজন কবর-খোঁড়ার লোক দেখলে চাষী ক্ষেপে প্রায় পাগল হবে।

চাষী-বৌ তখন তাড়াহুড়ো করে মদের বোতল, খাবার জিনিস ইত্যাদি তার পাঁউরুটি করার তন্দুরে ভরে রাখল। স্বামী যদি ঘরে ঢুকে টেবিলে এত খাবার-দাবার দেখে তা হলেই সে জানতে চাইবে কার জন্য এত আয়োজন!

মাচা থেকে ছোটো ক্লাউস ভোজ-সামগ্রী লুকিয়ে ফেলার ব্যাপার দেখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "ইস্! কি কাণ্ড!" তাই শুনে চাষী চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কে ওখানে?" এই বলে উপরে তাকিয়েই ছোটো ক্লাউসকে দেখতে পেল। চাষী বলল, "ও কি, ওখানে শুয়ে আছ কেন? এসো, আমার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে এসো।"

ছোটো ক্লাউস তখন বুঝিয়ে বলল যে সে পথ হারিয়েছে, চাষী কি তাকে এক রাত্তিরের মতো আশ্রয় দেবে না? লোকটা ভারি অমায়িক, শুনেই বলল, "সে কী কথা, নিশ্চয়ই দেব। শিগ্‌গির এসো আমার সঙ্গে, কিছু খাওয়া-দাওয়া করা যাক।"

চাষী-বৌ দুজনকে খুব আদর দেখিয়ে ডেকে নিল। তার পর লম্বা টেবিলটার এক দিকে একটা চাদর পেতে মস্ত এক গামলা জাউ এনে দিল। চাষী তো মহা তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শুরু করে দিল, কিন্তু ছোটো ক্লাউস ও-খাবার মুখে তুলতে পারল না। তার কেবলই মনে হচ্ছিল তন্দুরের মধ্যে সেই চমৎকার কেক, মাছ, মাংস পোরা রয়েছে!

থলির মধ্যে ঘোড়ার চামড়াটা ছিল; থলিটাকে সে নামিয়ে টেবিলের তলায় রাখল। মুখে জাউ রোচে না, কি আর করে, পা দিয়ে থলিটাকে দিব্যি করে মাড়াতে লাগল। মাড়ানির চোটে শুকনো চামড়া থেকে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ বেরুতে লাগল।

ছোটো ক্লাউস বলল, "এই, চুপ, চুপ!" যেন থলিটাকেই বলছে। বলেই আবার থলি মাড়াল, তাতে আরো জোরে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ হল।

চাষী অবাক হয়ে বলল, "তোমার থলিতে কি?" ছোটো ক্লাউস বলল, "ও কিছু না, ও আমার একটা ক্ষুদে ভেল্কি-ওয়ালা। ও বলছে আমাদের নাকি এই জইয়ের জাউটা খেতে হবে না। ও নাকি ভেল্কি করে আমাদের জন্য ঝলসানো মাংস, মাছভাজা আর কেক তন্দুরের মধ্যে এনে রেখেছে!"

চাষী বলল, "কি বললে, ভেল্কিওয়ালা? কই, দেখি তো।" এই বলে হুড়মুড় করে উঠে তন্দুর খুলে দেখতে গেল ভেল্কি-ওয়ালা সত্যি কথা বলেছে কি না। তন্দুর খুলে দেখে ওমা, সত্যিই তো, তন্দুরের মধ্যে মাছ, মাংস, কেক! ভেল্কিওয়ালা তো তার কথা রেখেছে দেখা যাচ্ছে! এদিকে চাষী-বৌ ভয়ের চোটে একটি কথাও বলতে পারল না, তা ছাড়া সেও চাষীর চাইতে কম অবাক হয় নি। কি আর করে, খাবার-দাবারগুলো বের করে স্বামীর আর তার অতিথির সামনে সাজিয়ে দিল আর তারা দুজনে মহানন্দে ভোজ শুরু করল।

একটু বাদে ছোটো ক্লাউস আবার থলি মাড়াতে লাগল, আবার ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ বেরুল।

চাষী বলল, "ভেল্কিওয়ালা আবার কি বলে?" ছোটো ক্লাউস বলল, "বলছে ও নাকি ভেল্কি করে আমাদের জন্য তিন বোতল মদ আনিয়েছে। তন্দুরের আড়ালে রয়েছে।" কাজেই চাষী-বৌ বাধ্য হয়ে সেগুলোকেও বের করে আনল। চাষী এক গেলাস মদ ঢালতে ঢালতে ভাবতে লাগল ঐরকম একটা ভেল্কি-ওয়ালা পাওয়া গেলে তো খাসা হয়।

শেষটা সে ছোটো ক্লাউসকে বলল, "তোমার ঐ ভেল্কি-

ওয়ালাটি তো বেড়ে। একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। দেখা দেবে নাকি? তুমি কি বল?”

ছোটো ক্লাউস বলল, “তা, আমি যা বলব ও তাই করবে! কি হে করবে না?” এই বলে থলিটাকে একটু মাড়িয়ে বলল, “শুনলে না? বলছে দেখা দেবে। তবে আগে থাকতেই তোমাকে সাবধান করে রাখছি, কেলে বিটকেল দেখতে। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে দেখে কি হবে?”

“আরে না, না, আমি ঘাবড়াব না। কেমন দেখতে?”

“কেমন আবার হবে? একটা কবর-খোঁড়া লোকের মতোই হবে! তা ছাড়া আর কি!”

চাষী বলল, “এঁ্যা! বল কি? কবর-খোঁড়া লোকের মতো? এই মাটি করেছে! আমি যে তাদের দেখতে পারি না, তা জান? সে যাই হোক গে, এতো আর সত্যিকার কবর-খোঁড়া নয়, এ আসলে তোমার ভেল্কিওয়ালা, আচ্ছা তাই সই। আমার যথেষ্ট বুকের পাটা আছে, কিন্তু ব্যাটাকে বেশি কাছে আসতে দিও না, তাই বলে।” ক্লাউস বলল, “দেখি, ভেল্কিওয়ালাকে বলে দেখি, কি বলে।” এই বলে থলি মাড়িয়ে মহা ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ তুলে, কান পেতে শোনার ভান করতে লাগল।

“কি, বলছে কি?”

“বলছে যে ঘরের কোণে ঐ সিন্দুকের ভিতরে গিয়ে ও ঢুকবে। তার পর সিন্দুকের ডালা তুললেই ওকে দেখতে পাবে। দেখা হয়ে গেলে, কিন্তু ডালাটা আবার ভালো করে বন্ধ করে দিও, ভাই।”

“ডালাটা তুলে ধরতে তুমি সাহায্য করবে তো? বেজায় ভারী যে।” এই বলে চাষী সিন্দুকের কাছে গেল। এখন ঐ সিন্দুকটার মধ্যেই চাষী-বৌ তার ভাইকে লুকিয়ে রেখেছিল।

সে বেচারার যা অবস্থা! হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, সমস্ত গা কাঁপছে, পাছে ধরা পড়ে যায় এই ভয়ে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছে না!

চাষী তো ডালাটা একটু তুলে, তলা দিয়ে উঁকি মারল। উঁকি মেরেই, "উঃফ্!" বলে ভয়ে পেছিয়ে এল। "উরি বাবা! দেখলাম ওকে! সত্যি হুবহু আমাদের এই শহরের কবর-খোঁড়া লোকটার মতো দেখতে—ইস্! কী ভীষণ!"

সে যাই হোক, চাষী আবার টেবিলে এসে বসে, ভয় তাড়াবার জন্য, গেলাসের পর গেলাস মদ খেতে লাগল। তার সাহস ফিরে এল। চাষী কিম্বা তার অতিথি, দুজনার মধ্যে কারও শুতে যাবার কথা মনে হল না। গভীর রাত পর্যন্ত ওরা ঐখানে বসে খাওয়া-দাওয়া গাল-গল্প করল।

চাষী জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, ঐ ভেল্কিওয়ালাকে আগে কখনো দেখেছিলে?"

ছোটো ক্লাউস বলল, "দূর, দূর, আরে তুমি কথাটা না তুললে, ওকে দর্শন দিতে বলার বিষয় আমার মনেই আসত না! ও তো জানেই ও দেখতে ভালো নয়; গায়ে পড়ে লোকের সামনে বেরুতে ওর ভারি সঙ্কোচ। ও আমার সঙ্গে কথা বলে, আমি ওর সঙ্গে কথা বলি, সেই কি যথেষ্ট নয়?"

চাষী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যথেষ্ট বৈকি!" তার পর একটু দো-মনা করে আবার বলল, "দেখ, তোমার ঐ ভেল্কিওয়ালাটিকে আমি নিতে চাই। বেচতে আপত্তি আছে? যা দাম বল। পত্রপাঠ এক ঘড়া রুপোর টাকা দিতেও আমার আপত্তি নেই।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "ও আবার কেমন কথা, ভাই? ও-রকম একটা বিশ্বাসী ভালো চাকর, ওকে হাতছাড়া করার কথা

আমি কি ভাবতে পারি? দেখ, ওর ওজনের দশগুণ সোনার সমান ওর দাম।”

চাষী বলল, “না, ভাই, সোনা দেবার তো আমার ক্ষমতা নেই। তবে ওকে নিতে আমার বড়োই ইচ্ছা করছে, অবিশ্যি ওর ঐ বিশ্রী চেহারাটা আর দেখতে চাই না।”

ছোটো ক্লাউস বলল, “সে ভয় নেই। আর তাই যদি বল ভাই, আমাকে আজ রাতে আশ্রয় দিয়ে যে উপকারটা করলে তোমাকে না দিতে পারি, এমন কিছু ভাবতে পারি না। আচ্ছা, এক ঘড়া রুপোর টাকার বদলে ওকে তোমায় দিয়ে দেব, কিন্তু দেখো ভাই, ঘড়াটা যেন ঠেসে ভরা হয়।”

চাষী বলল, “সে আর বলতে! তার উপর ফাউ দেব ঐ সিন্দুক। ওটাকে আর বাড়িতে রাখা নয়, ওটা দেখলেই আমার কবর-খোঁড়ার বিকট মুখটা মনে পড়বে!”

সেইরকম কথাই হল। ছোটো ক্লাউস চাষীকে শুকনো চামড়াসুদ্ধ থলিটা দিয়ে দিল আর তার বদলে পেল একটি ঘড়া রুপোর টাকা। তার উপর টাকা আর সিন্দুক বাড়ি নিয়ে যাবার জন্য, চাষী ওকে একটা এক চাকাওয়ালা ঠেলাগাড়িও দিল।

তার পর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ঠেলতে ছোটো ক্লাউস রওনা দিল। ঠেলাগাড়িতে সিন্দুক, সিন্দুকে সেই হতভাগা কবর-খোঁড়া লোকটা।

বনের ওধার দিয়ে একটা চওড়া গভীর নদী বয়ে যাচ্ছিল। তার স্রোতের এমনি জোর যে কেউ সাঁতরে পার হতে পারত না, তাই কিছুদিন আগে একটা পুল তৈরি করা হয়েছিল। পুলের উপর দিয়ে অর্ধেকটা পথ গিয়ে, ছোটো ক্লাউস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে অমনি সিন্দুকের মধ্যে লোকটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল, “আচ্ছা, এই

বিরাট ভাঙা-চোরা সিন্দুকটা বয়ে বেড়াবার কোনো মানে হয় ? এমন ভারী যে মনে হয় ইঁট পাটকেল দিয়ে ভর্তি ; উঃফ, এটাকে ঠেলে ঠেলে একেবারে হাঁপ ধরে গেল। দিই ছুঁড়ে নদীতে ফেলে। নদীর যদি ইচ্ছা হয় তো ওটাকে ভাসিয়ে আমার বাড়ি পৌঁছে দিক আর যদি ইচ্ছা না হয় তো থাক গে ; আমার দরকার নেই।"

এই-না বলে ছোটো ক্লাউস সত্যি সত্যি সিন্দুকের একদিক তুলে ধরল, যেন এইবার দেবে ফেলে। সিন্দুকের ভিতর থেকে চাষীর-বৌয়ের ভাই আঁতকে উঠল, "কর কি! কর কি! আগে আমাকে বেরুতে দাও, ভাই।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "ই কি কাণ্ড! সিন্দুকটাকে ভূতে পেল নাকি ? তা হলে তো যত তাড়াতাড়ি পাচার করতে পারি, ততই ভালো।"

কবর-খোঁড়া লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, ভাই, দোহাই তোমার, আমাকে ছেড়ে দাও, তা হলে তোমাকে আরেক ঘড়া টাকা দেব।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "ও, তাই বুঝি ? তা হলে তো অন্য কথা।" এই বলে সিন্দুকটি পত্রপাঠ নামিয়ে, তার ডালা তুলে ধরল। অমনি সেই লোকটা গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। আগে সিন্দুকটাকে পা দিয়ে ঠেলে জলে ফেলে, তার পর ছোটো ক্লাউসকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যেমন কথা হয়েছিল, এক ঘড়া রুপোর টাকা দিল।

রুপোর টাকা দিয়ে ছোটো ক্লাউসের ঠেলাগাড়ি বোঝাই হয়ে গেল। বাড়ি ফিরে, ঘরে ঢুকে, ঠেলাগাড়ি উলটে মেঝের উপর রুপোর টাকাগুলো ফেলতেই ছোটো-খাটো একটা পাহাড় তৈরি হল। তখন ছোটো ক্লাউস বলল, "মানতেই হবে যে ঘোড়ার

চামড়াটার জন্য ভালো দামই পাওয়া গেছে! দুঃখের বিষয়, বড়ো ক্লাউস যেই শুনবে ঘোড়ার চামড়া বেচে আমি বড়োলোক বনে গেছি, ও তো বেজায় চটে যাবে!"

তার পর ছোটো ক্লাউস করল কি, বড়ো ক্লাউসের কাছে একটা ছেলেকে পাঠাল, তার দাঁড়িপাল্লাটা চেয়ে আনতে।

শুনে বড়ো ক্লাউস তো অবাক, "ও ব্যাটা আবার কি ওজন করতে চায়?" কৌতূহল রাখতে না পেরে সে বুদ্ধি করে দাঁড়ি-পাল্লার তলায় বেশ করে খানিকটা কাদা মাখিয়ে দিল। তার পর যখন দাঁড়িপাল্লা ফেরত এল, বড়ো ক্লাউস দেখল তার নীচে তিনটে রুপোর টাকা আটকে রয়েছে! সে তো বেজায় চমকে গেল, "বলিহারি এ কি কাণ্ড রে বাবা!"

তখুনি সে ছোটো ক্লাউসের বাড়ির দিকে রওনা দিল। সেখানে গিয়ে মহা তম্বি করতে লাগল, "অত টাকা কোথায় পেলে বল, নয় তো ভালো হবে না।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "কি মুস্কিল! ঘোড়ার চামড়াটা বেচে পেয়েছি, আবার কোথায় পাব?"

বড়ো ক্লাউস একেবারে হাঁ! "বল কি? ঘোড়ার চামড়ার অত দাম কে ভেবেছিল?" তখুনি দৌড়ে বাড়ি গিয়ে নিজের চারটে ঘোড়ার মাথায় বাড়ি দিয়ে মেরে, তাদের ছাল ছাড়িয়ে শহরে গিয়ে পথে পথে সে ফেরি করতে বেরুল।

"চামড়া চাই, চামড়া চাই, ভালো ভালো চামড়া।" শহরের সব মুচিরা আর চাঁড়ালরা দৌড়ে এসে, দাম জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

বড়ো ক্লাউস বলল, "একেকটার দাম এক ঘড়া রুপোর টাকা!" তারা বলল, "বলি, ক্ষেপলে নাকি? আমরা কি ঘড়ায় ঘড়ায় টাকা গুনি নাকি?

বড়ো ক্লাউস তবু ডেকে যেতে লাগল, "তাজা চামড়া! কে নেবে ভালো চামড়া!" আর যে আসে তাকেই বলে একেকটা চামড়ার দাম এক এক ঘড়া টাকা!

শেষপর্যন্ত একজন খদ্দের মহা রেগে বলল, "অসভ্য কোথাকার! এ শুধু আমাদের বোকা বানাবার মতলব!" তখন সবাই মিলে ওকে ঘিরে ভ্যাংচাতে লাগল, "চামড়া চাই! তাজা চামড়া! ভালো চামড়া। ব্যাটা ন্যাকামো করবার জায়গা পায় নি! দে ব্যাটাকে শহর থেকে তাড়িয়ে! নইলে ওর নিজের পিঠের চামড়াই আস্ত থাকবে না!" এই বলে অপমান করে ওরা ওকে তাড়িয়ে দিল।

বড়ো ক্লাউস বিড়্বিড় করে বকতে লাগল, "ছোটো ক্লাউসকে এর শোধ দিতে হবে! আজ রাতে ভালো করে ঘুমোস, কারণ সে ঘুম আর ভাঙবে কি না সন্দেহ!"

এদিকে হয়েছে কি, সেদিন সন্ধেবেলাই ছোটো ক্লাউসের ঠাকুমা মারা গেল। যত দিন বেঁচেছিল বুড়ি ছোটো ক্লাউসের সঙ্গে শুধু রাগমাগ, খারাপ ব্যবহার করত। কিন্তু বুড়ি মরে গেছে দেখে ছোটো ক্লাউসের সত্যি ভারি দুঃখ হল। ঠাকুমাকে তুলে নিয়ে সে নিজের গরম বিছানায় শোয়াল, গরম লেগে যদি বেঁচে ওঠে। নিজে ঘরের কোণে চেয়ারে বসে রাত কাটাবে ঠিক করল, এমন সে হামেশাই করত।

রাত বারোটার সময়, কুড়ুল হাতে বড়ো ক্লাউস ঘরে ঢুকল। খাটটা কোথায় তার জানা ছিল; সটাং সেখানে গিয়ে মরা ঠাকুমার কপালে ভীষণ এক ঘা দিয়ে বলল, "এবার হল তো! আর কখনো আমাকে বোকা বানাতে হবে না!" এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

ছোটো ক্লাউস এদিকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলল,

"দেখলে কি খারাপ! আমাকে মারবার ইচ্ছা! ভাগ্যিস ঠাকুমা বেচারি আগেই মরে গেছে, নইলে বড্ডো ব্যথা লাগত!"

পরদিন সন্ধেবেলা গাঁয়ের কাছে একটা গলিতে বড়ো ক্লাউসের সঙ্গে দেখা। তাকে দেখে বড়ো ক্লাউস থমকে থেমে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। "সে কি! তুমি মর নি? আমার ধারণা ছিল কাল রাতে তোমায় সাবাড় করেছি!"

ছোটো ক্লাউস বলল, "তাই বটে! তুমি বড়ো খারাপ লোক হে, আমাকে মারতে ঘরে ঢুকেছিলে, কিন্তু খাটে আমি শুই নি, ঠাকুমা শুয়েছিল। তাকেই তুমি কুড়ুলের ঘা মেরেছিলে। তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত!"

বড়ো ক্লাউস বলল, "ও হো, সে কথা বুঝি তুমি বলে বেড়াবে মনে করেছ? উঁহু, সেটি হচ্ছে না!" বড়ো ক্লাউসের হাতে ছিল মস্ত একটা ছালা। হঠাৎ ছোটো ক্লাউসের কোমর জাপ্‌টে ধরে বড়ো ক্লাউস তাকে দেখতে-না দেখতে ছালার মধ্যে বেঁধে ফেলল। "এক্ষুনি তোমাকে জলে ডুবিয়ে মারব। আমার নামে বলে বেড়ানো বেরুবে!"

কিন্তু নদীও অনেক দূরে আর ছোটো ক্লাউসও খুব হাল্‌কা ছিল না। গির্জার পাশ দিয়ে পথ। ভিতরে বাজনা বাজছিল, উপাসনা আরম্ভ হচ্ছিল। লোকজনের ভিড়ের মধ্যে বড়ো ক্লাউস হঠাৎ একটা লোককে দেখতে পেল, তার সঙ্গে ওর বিশেষ দরকার ছিল।

বড়ো ক্লাউস ভাবল, 'ছোটো ক্লাউস তো আর পালাতে পারবে না। কেউ ওকে ছেড়েও দেবে না, কারণ সবাই তো দেখছি গির্জার ভিতরে। একবার ঢুকে লোকটাকে বারান্দায় ডেকে এনে কাজটা সেরে ফেলি।' এই ভেবে ছালাটাকে নামিয়ে রেখে বড়ো ক্লাউস তাড়াতাড়ি গির্জার ভিতরে গেল।

ছালার ভিতরে বসে বসে ছোটো ক্লাউস বলতে লাগল, "কি মুস্কিল! কি মুস্কিল!" এপাশ ওপাশ নানা কসরৎ করেও

বেচারা কোনো সুবিধা করতে পারল না ; ছালা-বাঁধা দড়িটা এতটুকু ঢিল দিল না। ঠিক সেই সময় একজন থুথ্থুড়ে বুড়ো রাখাল ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তার মাথাটি শনের নুড়ি, হাতে একটা মোটা ডাণ্ডা। লোকটা মস্ত একপাল গোরু বলদ তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তা ঐরকম থুথ্থুড়ে বুড়ো তাদের সামলাতে পারবে কেন ? একটা বলদ ছুটে গিয়ে ছালাটার সঙ্গে ধাক্কা খেল। ধাক্কা খেয়ে ছালাটা বার দুই গড়াল। অমনি ভিতর থেকে ছোটো ক্লাউস বলে উঠল, "দোহাই তোমার ! এই কি আমার মরার বয়স ? আমাকে ছেড়ে দাও ভাই !"

বুড়ো রাখাল তাই শুনে বলল, "সে কী ! ছালার ভিতর মানুষ নাকি ?" অনেক কষ্টে নিচু হয়ে বুড়ো ছালার মুখের দড়ি খুলে দিয়ে বলল, "বলদটা তোমাকে জখম-টখম করে নি তো, ভাই ?" ছোটো ক্লাউস যেভাবে ছালা থেকে লাফ দিয়ে বেরুল তাতেই বোঝা গেল ওর একটুও লাগে নি। পথের ধারে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ি ছিল, বেরিয়েই সেটাকে সে খুঁড়ে তুলতে লেগে গেল। তার পর সেটাকে ছালাতে ভরে, ছালার মুখ বেঁধে, বড়ো ক্লাউস সেটাকে যেখানে যেমন ভাবে রেখে গেছিল, ঠিক তেমনি করে রেখে দিল। ততক্ষণে গোরু-বলদ অনেক দূর এগিয়ে গেছিল।

বুড়ো তখন ছোটো ক্লাউসকে বলল, "এই গোরু-বলদগুলোকে যদি আমার হয়ে গাঁয়ে ওদের আস্তানায় পৌঁছে দাও, তা হলে বড়ো ভালো হয়। একেবারে ক্লান্ত হয়ে গেছি, তা ছাড়া গির্জায় যেতে বড্ডো ইচ্ছা করছে।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "তুমি আমার এত উপকার করলে, তোমার জন্য এটুকু করব না ?" এই বলে বুড়োর হাত থেকে ডাণ্ডা নিয়ে গোরুর পিছন পিছন চলল।

একটু পরেই বড়ো ক্লাউস দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এসে, ছালাটাকে আবার কাঁধে তুলেই ভাবল, আরে, এটাকে এখন কত হাল্‌কা মনে হচ্ছে! একটু বিশ্রাম নিতে পারলে এইরকমই হয়।" এই বলে ট্যাঙস্‌-ট্যাঙস্‌ করে সে ছালা কাঁধে নদীর-দিকে চলল। সেখানে পৌঁছে ছালাটাকে ছুঁড়ে জলে ফেলে দিয়ে, চীৎকার করে বলল, "ঠিক হয়েছে, ছোটো ক্লাউস! আর আমাকে ঠকাতে পারবে না!"

তার পর বড়ো ক্লাউস বাড়ির দিকে ফিরল। মাঝপথে একটা মোড়, সেখানে অনেকগুলো রাস্তা এসে মিলেছে। হবি তো হ, সেই মোড়ে ছোটো ক্লাউসের সঙ্গে দেখা, তার সঙ্গে আবার একপাল গোরু-বলদ!

বড়ো ক্লাউস তো অবাক! "ই কি! সত্যি সত্যি তুমি নাকি? তবে কি শেষপর্যন্ত তোমাকে ডোবাই নি?"

ছোটো ক্লাউস বলল, "তা চেষ্টার ত্রুটি রাখ নি। তবে তোমাকে সব কথাই খুলে বলি। আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিলে বলে আমি তোমার কাছে বড়োই কৃতজ্ঞ; দেখতেই পাচ্ছ যে তার ফলে আমি কেমন বড়োলোক হয়ে গেছি। অবিশ্যি যখন তুমি আমাকে ছালায় পুরেছিলে তখন বেজায় ভয় পেয়েছিলাম। তার পর পুলের ওপর থেকে যখন আমাকে ঠাণ্ডা জলে ছুঁড়ে ফেললে, কান ঘেঁষে বাতাসের সে কী সাঁই সাঁই শব্দ! তখুনি একেবারে তলিয়ে গেলাম, তবে একটুও লাগে নি, কারণ পড়ে-ছিলাম কচি নরম ঘাসের ওপর। অমনি ছালার মুখ খুলে গেল আর অপরূপ রূপসী এক কন্যে আমার হাত ধরে বলল, "তুমিই কি ছোটো ক্লাউস? এই নাও, এই গোরুকটা তোমার জন্য। এই পথে মাইল খানেক এগিয়ে গেলে দেখবে এর চাইতেও বড়ো একপাল গোরু চরছে; সেগুলোও তোমাকে দিলাম।"

ওর কথায় বুঝলাম যে এই নদীটা হল গিয়ে সাগরবাসীদের একটা রাজপথ গোছের কিছু ; ঐ পথে ওরা চলাফেরা করে, গাড়ি হাঁকায়। ঐ পথ ধরে ওরা ডাঙার মধ্যে যেখানে নদীটা মাটি থেকে উঠেছে, সেই অবধি যায় আর ঐ পথেই ফেরে। আহা, জলের নীচের ঐ দেশের মতো সুন্দর দেশ আর হয় না। লোকজনদের সাজ-পোশাকের কী বাহার! আর নালা দিয়ে, বেড়া দিয়ে ঘেরা সব ঘাস জমিতে কত হাজার হাজার গোরু-বলদ চরে বেড়াচ্ছে!"

বড়ো ক্লাউস জিজ্ঞাসা করল, "তবে তুমি সাত তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে এলে কেন?"

ছোটো ক্লাউস বলল, "ওমা, এই যে বললাম সুন্দর মেয়েটি আমাকে বলেছিল ঐ পথ দিয়ে এক মাইল গেলে আরো বড়ো একপাল গোরু পাব। ঐ পথ মানে নদীর তলার ঐ জলপথ, ও তো আর আমাদের ডাঙার পথে চলতে পারে না। এখন নদীটা চলেছে এঁকে বেঁকে, পথটাও তাই লম্বা; তাই ভাবলাম উঠে এসে ডাঙার পথে গেলে তার অর্ধেক হাঁটতে হবে। কাজেই দেখতে পাচ্ছ এই পথেই চলেছি আমার সমুদ্রের গোরুগুলোকে আনতে।"

বড়ো ক্লাউস বলল, "সত্যি, তোমার কপালটা ভালো। আচ্ছা, আমি যদি নদীর তলায় যাই, আমাকেও কি ও গোরু দেবে মনে কর?"

ছোটো ক্লাউস বলল, "সে আমি কি করে বলব।" বড়ো ক্লাউস চটে গেল। "তুমি তো আচ্ছা হিংসুটে দেখছি। নিজের জন্যেই ভালো ভালো সমুদ্রের গোরু রাখতে চাও নাকি? শোনো বলি, হয় তুমি আমাকে নদীর ধারে বয়ে নিয়ে গিয়ে জলে ফেলবে, নয়তো আমার বড়ো ছোরাটা দিয়ে তোমাকে শেষ করব। মন ঠিক কর।"

ছোটো ক্লাউস তখন কাকুতি মিনতি করতে লাগল, "দোহাই, অত রেগো না! তোমাকে ছালায় ভরে কি করে বয়ে নিয়ে যাই তাই বল, যা ভারী তুমি! তবে তুমি যদি নিজে নদীর ধারে হেঁটে গিয়ে, ছালার মধ্যে ঢোক, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তোমাকে ঠেলে জলে ফেলে দেব।"

"কিন্তু মনে রেখ সমুদ্রের গোরু যদি না পাই, ফিরে এসে তোমার দফা শেষ করব, এই আমি বলে রাখলাম।" এ ব্যবস্থায় ছোটো ক্লাউস কোনো আপত্তি করল না। দুজনে তখন হেঁটে নদীর ধারে গেল। গোরুগুলোর তেষ্টা পেয়েছিল, জল দেখেই তারাও প্রাণপণে ছুটতে লাগল, এ ওকে ঠেলে সরিয়ে, সবাই আগেভাগে জল খেতে চায়!

ছোটো ক্লাউস বলল, "দেখ একবার আমার সমুদ্রের গোরু-গুলোর কাণ্ড! জলের নীচে নামবার জন্য দেখছ ওদের কী আগ্রহ!"

বড়ো ক্লাউস বলল, "তা হতে পারে, কিন্তু আগে আমাকে সাহায্য কর দিকি?" এই বলে একটা বলদের পিঠে ঝোলানো মস্ত ছালা নামিয়ে, তাড়াতাড়ি তার ভিতর ঢুকে বসেই বলল, "আমার সঙ্গে একটা ভারী পাথর পুরেই দাও, নইলে হয়তো তলা অবধি পৌঁছব না।"

ছোটো ক্লাউস বলল, "না, না, সে ভয় নেই।" তবু অত করে বলছে যখন, তখন ছালাতে একটা বড়ো পাথর পুরে, ছালার মুখে দড়ি বেঁধে, দিল সেটাকে ঠেলে জলে ফেলে। গুব্ করে ছালাটা সোজা নীচে তলিয়ে গেল। তখন গোরুর পাল নিয়ে বাড়ি যেতে যেতে ছোটো ক্লাউস বলতে লাগল, "বড়োই ভাবনা হচ্ছে, লোকটা হয় তো তার সমুদ্রের গোরু পাবে না!"

লাল জুতোর কথা

অনেকদিন আগে একটি ছোটো মেয়ে ছিল, দেখতে ভারি সুন্দর। পাতলা পাতলা হাত-পা, কিন্তু এমনি গরিব যে গরমের সময় বেচারিকে খালি-পায়ে থাকতে হত আর শীত কালে ভারী ভারী কাঠের জুতো পরতে হত। তার ঘষা লেগে পায়ের কব্জিদুটি লাল হয়ে উঠত, ছাল উঠে যেত।

ঐ গ্রামেই থাকত ওখানকার মুচির মা। একদিন বুড়ি বসে বসে কয়েক টুকরো পুরনো লাল কাপড় কেটে এক জোড়া ছোট্টো জুতো বানিয়ে ফেলল। জুতো-জোড়া একটু আনাড়ি মতো হলেও ছোটো মেয়েটার পায়ে বেশ লেগে গেল। বুড়ি তাকে জুতো-জোড়া দিয়ে দিল। ছোটো মেয়েটার নাম ছিল কারেন।

যেদিন কারেন জুতো-জোড়া পেল, সেদিন ছিল ওর মায়ের শ্রাদ্ধ। জুতো-জোড়া ঠিক শোকের ব্যাপারে পরে যাবার উপযুক্ত না হলেও, বেচারির আর জুতোই ছিল না। তাই খালি পায়ে লাল জুতো পরে কারেন মায়ের সস্তা খড়ের খাটিয়ার পিছন পিছন চলল।

ঠিক সেই সময় সেখান দিয়ে মস্ত একটা পুরনো ঘোড়ার গাড়ি গড়িয়ে চলল। গাড়ির মধ্যে বিশাল দেহ এক বুড়ি।

মেয়েটাকে দেখে বুড়ির বড়ো দুঃখ হওয়াতে, তিনি পাদ্রীকে বললেন, "মেয়েটাকে আমার কাছে দিন-না, আমি ওকে মানুষ করব।"

কারেন ভাবল হয়তো লাল জুতো-জোড়ার জন্যই বুড়ির তাকে ভালো লেগে গেছে, কিন্তু বুড়ি বললেন জুতো-জোড়া ভারি বিশ্রী। তাই সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হল। তার পর কারেনের পরিপাটি কাপড়-চোপড় হল ; সে লেখাপড়া কাজকর্ম শিখল ; লোকে বলতে লাগল সে বেশ দেখতে। কিন্তু তার আয়না বলত, "বেশ দেখতে নয়, তুমি ভারী রূপসী।"

একদিন ও দেশের রানী তাঁর ছোটো মেয়েকে নিয়ে গাড়ি করে ঐ অঞ্চলে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। ওখানকার লোকরা রাজবাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়াল, তাদের মধ্যে কারেনও ছিল। সবাই যাতে তাঁকে দেখতে পায়, তাই সাদা পোশাক পরে ছোটো রাজকুমারী একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন! রাজকুমারীর পরনে লম্বা ঝালর দেওয়া পোশাকও ছিল না, মাথায় মুকুটও ছিল না, কিন্তু পায়ে ছিল সুন্দর এক জোড়া লাল মরক্কো চামড়ার জুতো। মুচির মা কারেনের জন্য যেমন করে দিয়েছিল, এ জুতো তার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর। বাস্তবিক ঐ লাল জুতো-জোড়ার তুলনা হয় না।

ততদিনে কারেনের গির্জায় গিয়ে দীক্ষা নেবার বয়স হয়েছে। সেজন্য তার নতুন জামা, জুতো হবে। শহরের বড়ো মুচি ওর ছোট্টো পা-র মাপ নিল। ঘরের চারদিকে বড়ো-বড়ো, কাঁচের আলমারিতে সুন্দর সব জুতো আর ঝক্‌ঝকে সব বুট সাজানো ছিল। তার মধ্যে ছিল এক-জোড়া লাল জুতো, অবিকল রাজকুমারীর জুতোর মতো দেখতে। মুচি বলল ঐ জুতো একজন জমিদারের মেয়ের জন্য তৈরি হয়েছিল, কিন্তু তার পায়ে লাগে নি।

বুড়ি ভদ্রমহিলা বললেন, “ওগুলো পালিশ করা চামড়ার তৈরি। দেখছ কেমন চক্‌চক্‌ করছে?” কারেন বলে উঠল, “সত্যি, কী সুন্দর চক্‌চক্‌ করছে।” জুতো-জোড়া ওর পায়ে ঠিক হওয়াতে, ওগুলোই কেনা হল। এখন হয়েছে কি, বুড়ি ভদ্রমহিলা চোখে ভালো দেখতেন না, তাই জুতো-জোড়া যে লাল রঙের তা বুঝতে পারেন নি। নইলে লাল জুতো পরে তিনি কারেনকে কখনো গির্জায় গিয়ে দীক্ষা নিতে দিতেন না। কিন্তু কারেন লাল জুতো পরেই গির্জায় গেল। সবাই ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখল; যখন গির্জার মাঝখানের পথটুকু দিয়ে কারেন বেদীর দিকে এগুচ্ছিল ওর মনে হচ্ছিল যে সমাধিগুলির ওপরের কালো পোশাক আর শক্ত গলাবন্ধ পরা মূর্তিগুলো পর্যন্ত ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। এমন-কি, বড়ো পুরোহিত যখন ওর মাথায় হাত দিয়ে ওকে আশীর্বাদ করে দীক্ষার কথা বুঝিয়ে বললেন যে এ হল ভগবানের সঙ্গে অঙ্গীকার করা, তাই এখন থেকে তাকে একজন পূর্ণবয়স্ক খৃস্টভক্ত হতে হবে, তখনো কারেনের মন পড়ে ছিল তার লাল জুতোর ওপর। তার পর গম্ভীর গভীর সুরে অর্গ্যান বেজে উঠল, যারা বন্দনা গাইছিল তাদের গলার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ছেলে-মেয়েরাও গান ধরল, তখনো কারেন শুধু তার লাল জুতোর কথাই ভাবছিল।

সেদিন বিকেলে বুড়ি ভদ্রমহিলা যখন শুনলেন যে কারেন দীক্ষার সময় লাল জুতো পরেছিল, তিনি ভারি বিরক্ত হলেন। কারেনকে বললেন ও জুতো মোটেই গির্জায় যাবার উপযুক্ত নয়। এর পর থেকে গির্জায় যাবার সময় কারেন যেন কালো জুতো পরে যায়, তা সে যত পুরনোই হোক-না কেন।

তার পরের রবিবার একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন ছিল।

কারেন একবার লাল জুতোর দিকে, একবার কালো জুতোর দিকে তাকাল ; তার পর আবার লাল জুতোর দিকে তাকিয়ে, সে জোড়াই পায়ে দিল।

সুন্দর পরিষ্কার দিন, ঝক্‌ঝক্‌ করছে রোদ, কাজেই কারেন আর বুড়ি ভদ্রমহিলা হেঁটেই গির্জায় গেলেন। গির্জার দরজায় একজন বুড়ো সেপাই দাঁড়িয়েছিল। লাঠিতে ভর দিয়ে বেচারা প্রায় মাটি অবধি নুয়ে পড়েছে। সে বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল তাঁর জুতোর ধুলো ঝেড়ে দেবে কি না। তাই শুনে কারেন তার ছোট্টো পা দুটি এগিয়ে দিল। বুড়ো সেপাই বলল, "বাঃ, কী সুন্দর নাচবার যুগ্যি জুতো-জোড়া। দেখো, যেন নাচবার সময় পা থেকে খুলে না পড়ে।" এই বলে জুতোর ওপর হাত বুলিয়ে দিল।

বুড়ি ভদ্রমহিলা বুড়ো সেপাইকে একটা আধলা দিলেন, তার পর কারেনকে নিয়ে গির্জার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

সবাই কারেনের পায়ের দিকে তাকাতে লাগল ; গির্জার ভিতরকার সমস্ত কারিকুরি করা মূর্তিগুলো পর্যন্ত তাকাতে লাগল। যখন বেদীর সামনে কারেন হাঁটু গেড়ে বসল, তখনো তার চোখের সামনে লাল জুতো-জোড়া ভাসতে লাগল। জুতো ছাড়া আর কোনো কথা তার মনেই ঠাঁই পেল না ; বন্দনা গানে যোগ দেবার কথা তার মনেও হল না, পাদ্রীর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে অবধি ভুলে গেল।

অবশেষে সবাই গির্জা থেকে বেরিয়ে এল, বুড়ি ভদ্রমহিলাও গিয়ে তাঁর গাড়িতে উঠলেন। কারেন তাঁর পিছন-পিছন উঠবার জন্য সবে পা তুলেছে, এমন সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বুড়ো সেপাই বলে উঠল, "বাঃ! বাঃ! দেখ, দেখ, কী চমৎকার নাচবার জুতো!"

তখন কারেন আর চুপ করে থাকতে পারল না, তার মনে হল দুটো নাচের কদম নেচেই নিই! কিন্তু একবার নাচতে আরম্ভ করলে পর, পা দুটো আপনা থেকেই নেচে চলল, ঠিক যেন জুতো-জোড়ার অদ্ভুত একটা পা নাচাবার ক্ষমতা হয়েছে! কারেন গির্জার উঠোনে নেচে বেড়াতে লাগল, কিছুতেই আর থামতে পারে না। গাড়ির

চালক বাধ্য হয়ে ওর পিছন-পিছন ছুটে, ওকে ধরে, গাড়িতে তুলে দিল। গাড়িতে উঠেও পা দুটো নেচেই চলল, পায়ের ঠোক্কর খেয়ে বুড়ি ভদ্রমহিলা খুব ব্যথা পেলেন। শেষপর্যন্ত জুতো-জোড়া টেনে খুলে ফেলা হল, তখন পা দুটি বিশ্রাম পেল।

তার পর জুতো-জোড়াকে আলমারিতে তুলে রাখা হল; তবু কারেন মাঝে মাঝে গিয়ে সেগুলোকে একবার করে দেখে আসত।

এদিকে বুড়ি ভদ্রমহিলার বেজায় অসুখ হল; ডাক্তার বললেন তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না। তাঁকে যে খুব যত্ন করে শুশ্রূষা করতে হবে তাতে সন্দেহ নেই আর কারেন ছাড়া কেই-বা তা করবে, কেই-বা দিনরাত তাঁর কাছে কাছে থাকবে? ওদিকে শহরে জমকাল এক নাচের উৎসব হবে, সেখানে কারেনেরও নেমন্তন্ন হয়েছে।

কারেন একবার বুড়ি ভদ্রমহিলার মুখের দিকে চাইল, তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায়; তার পর কারেন লাল জুতো-জোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল; তার পর জুতো-জোড়া পায়েও দিল, অন্তত একবার পরে দেখতে ক্ষতি কি? তার পর কারেন সেই নাচসভায় গিয়ে নাচতে শুরু করল। কিন্তু এ আবার কি, কারেন ডান দিকে ফিরতে যায় তো জুতো তাকে নিয়ে যায় বাঁয়ে। তার পর যেই-না সে ঘরের সামনের দিকে এগুবার চেষ্টা করল, জুতো তাকে নিয়ে চলল ঘরের পিছন দিকে, তার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচের তলায়, তার পর রাস্তা দিয়ে, তার পর একেবারে শহরের ফটকের বাইরে! কারেন নেচেই চলল, না নেচে তার উপায় ছিল না, নাচতে নাচতে সে একেবারে সোজা একটা অন্ধকার ঘন বনের মধ্যে ঢুকল।

হঠাৎ গাছের ফাঁক দিয়ে কি যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল।

কারেন প্রথমে ভাবল হয়তো চাঁদের ঝক্‌ঝকে মুখখানি রাতের কুয়াশা ভেদ করে রক্তের মতো লাল আলো ঝরাচ্ছে। কিন্তু না, তা তো নয়। ঐ তো বুড়ো সেপাই বসে বসে মাথা দুলিয়ে কেবলই বলছে, "দেখ, দেখ, কী সুন্দর নাচবার জুতো!"

কারেনের মনে বড়ো ভয় হল; জুতো-জোড়া টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করল, কিন্তু বাঁধন খুলতে পারল না। তখন কারেন তাড়াতাড়ি পা থেকে মোজা-জোড়া টেনে ছিঁড়ে খুলে আনল। মোজা খুলে এল, কিন্তু জুতো-জোড়া পায়ের সঙ্গে তেমনি লেগে রইল, মনে হল যেন পায়ের সঙ্গে একেবারে মিশে গজিয়ে গেছে। কারেন নেচেই চলল, না নেচে আর উপায় রইল না, খেতের ওপর দিয়ে, মাঠের ওপর দিয়ে, বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, রোদ মাথায় নিয়ে, সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে। নাচতে নাচতে কারেন একটা নির্জন গোরস্থানে গিয়ে ঢুকল, আহা, যদি কোনো গরিব মানুষের তেতো আগাছায় ঢাকা কবরের ওপরেও একটুখানি বসতে পারত, কিন্তু হায় সে হবার উপায় ছিল না, কারেনের কপালে না ছিল বিশ্রাম, না ছিল রেহাই। গির্জার খোলা দরজার সামনে দিয়ে সে নেচে চলল। সেখানে দেখল একজন দেবদূত, লম্বা সাদা পোশাক পরা, ডানা দুটি কাঁধ থেকে মাটি পর্যন্ত নেমে এসেছে; মুখখানি ভারি গম্ভীর আর কঠোর আর হাতে একটা চওড়া ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

দেবদূত বলল, "নাচতে তোমাকে হবেই; কাজেই লাল জুতো পায়ে দিয়ে নাচতেই থাক, যতদিন না গায়ের রঙ পাংশু হয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়, চামড়া শুকিয়ে কুঁচকিয়ে একেবারে কঙ্কালের মতো দেখায়! এর দোর থেকে ওর দোরে নাচতে নাচতে যাও আর যে বাড়িতেই অহংকারী শৌখিন ছেলেমেয়েরা থাকে, তাদের দরজায় টোকা দিও, যাতে তারা বেরিয়ে এসে তোমাকে দেখতে

পায়, তোমার কথা শুনতে পায়। নাচতে তোমাকে হবেই—নেচে চল !”

কারেন বলল, “দয়া কর !” কিন্তু দেবদূতের উত্তরটা আর শোনা হল না, ততক্ষণে লাল জুতো তাকে গির্জার ফটকের বাইরে নিয়ে গেছিল ; তার পর মাঠের ওপর দিয়ে, বড়ো রাস্তা দিয়ে, অলিগলির মধ্যে দিয়ে, কেবলই তাকে নেচে চলতে হল।

একদিন সকালে কারেন একটা খুবই চেনা দরজার সামনে দিয়ে নেচে যাবার সময়, ভিতর থেকে ধর্মসঙ্গীত শুনতে পেল, তার পর দেখল বাড়ি থেকে একটা ফুলে ঢাকা কালো বাক্স বের করে আনা হচ্ছে। কারেন বুঝতে পারল সেই দয়ালু বুড়ি ভদ্র-মহিলা মারা গিয়েছেন। কারেনের তখন মনে হল সবাই তাকে ত্যাগ করেছে, ভগবানের দূত পর্যন্ত তাকে শাপ দিয়েছে।

নেচে চলল কারেন, না নেচে তার উপায় ছিল না, অন্ধকার রাতেও তাকে নাচতে হবে। জুতো-জোড়া তাকে কাঁটা লতা ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে নিয়ে চলল, হাত-পা ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। নাচতে নাচতে পোড়ো জমির ওপর দিয়ে কারেন ছোটো একটি নির্জন বাড়ির সামনে পৌঁছল। সে জানত এ বাড়িতে জল্লাদ থাকে। তখন কারেন সে-বাড়ির জানলার কাঁচে টোকা দিয়ে ডাকল, “বেরিয়ে এসো, বেরিয়ে এসো। আমার তো ভাই ভিতরে যাবার উপায় নেই, আমাকে যে নাচতেই হবে !”

জল্লাদ বলল, “তুমি নিশ্চয় জান না আমি কে। আমি দুষ্টু লোকদের মাথা কাটি, আমার কুড়ুলে বড়ো ধার !”

কারেন বলল, “আমার মাথাটা কেটো না, তা হলে মরে যাব, পাপের জন্য অনুতাপ করা হবে না। কিন্তু লাল জুতো সুদ্ধ পা দুটি আমার কেটে ফেল !”

তার পর কারেন জল্লাদকে তার পাপের কথা বলল। জল্লাদ তার লাল জুতো পরা পা দুটি কেটে ফেলল; তার পরেও দেখা গেল কাটা পা দুটি লাল জুতো পরে মাঠের ওপর দিয়ে বনের ভিতরে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে।

জল্লাদ কারেনের জন্য দুটি কাঠের পা বানিয়ে দিল, গাছের ডাল কেটে ভর দেবার জন্য দুটি লাঠি বানিয়ে দিল। যে হাত দিয়ে জল্লাদ তার পা কেটেছিল, কারেন সেই হাতে চুমো খেয়ে, বন-বাদাড়ের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল। মনে মনে কারেন বলল, 'লাল জুতোর জন্য আমি তো যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি, এবার একবার গির্জায় যাই, লোকে আমাকে দেখুক।' যত তাড়াতাড়ি পারে, কারেন গির্জার দিকে চলল, কিন্তু গির্জার কাছে আসতেই দেখে তার সামনে সামনে লাল জুতো-জোড়াও নাচতে নাচতে চলেছে। ভয় পেয়ে কারেন সেখান থেকে ফিরে গেল।

সারা সপ্তাহ সে যে কী কষ্ট পেল, কত বুক-ভাঙা কান্না কাঁদল! তার পর রবিবার এল, কারেন মনে মনে বলল, 'এত দিনে নিশ্চয় যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। মাথা উঁচু করে যারা গির্জায় বসে আছে, বোধ হয় তাদের অনেকের চেয়ে আমি কিছু মন্দ নই।' কাজেই সাহস করে কারেন আবার গির্জায় গেল। গির্জার বাইরের সমাধি ক্ষেত্রের ফটক পার হবার আগেই কারেন দেখল লাল জুতো-জোড়া সামনে সামনে নেচে চলেছে। ভীষণ ভয় পেয়ে কারেন ফিরে এসে, আরো কাতরভাবে অনুতাপ করতে লাগল।

তার পর কারেন পাদ্রীর বাড়িতে গিয়ে, কাতরভাবে প্রার্থনা করল যেন তাকে কোনো কাজ দেওয়া হয়, বলল তার যতখানি সাধ্য সবটুকু দিয়ে সে খাটবে। বলল তাকে মাইনে দিতে হবে না, সে শুধু মাথার ওপর একটা আশ্রয় চায় আর সাধু লোকদের

সঙ্গে থাকতে চায়। পাদ্রীর স্ত্রীর বড়ো দয়া হল, তিনি তাকে কাজে ভর্তি করে নিলেন। কারেনের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল, সে খুব খাটতে লাগল।

রোজ সন্ধ্যায় পাদ্রী ধর্মগ্রন্থ থেকে পড়ে শোনাতেন, কারেন চুপ করে বসে শুনত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই তাকে ভালোবাসত, কিন্তু তারা যখন সাজ পোশাকের গল্প আর রানীদের মতো সুন্দরী হওয়ার কথা বলত, কারেন করুণভাবে মাথা নাড়ত।

আবার রবিবার এল। পাদ্রীর বাড়ির সকলে গির্জায় গেল। যখন তারা কারেনকে জিজ্ঞাসা করল সে-ও যাবে কি না, কারেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, জলভরা চোখে তার দু গাছি লাঠির দিকে চেয়ে রইল।

সবাই গির্জায় চলে গেলে, কারেন তার নিজের দীন-দরিদ্র ঘরখানিতে গিয়ে ধর্মসঙ্গীতের বইখানি হাতে নিয়ে বসল। বসে বসে, ভক্তি-বিনম্র চিত্তে বইখানি পড়ছে, এমন সময় গির্জা থেকে অর্গ্যানের সুর তার ঘরে এসে পৌঁছল। স্বর্গের দিকে মুখ তুলে, কেঁদে কেঁদে কারেন প্রার্থনা করল, "হে ভগবান, তুমি আমার সহায় হও।"

অমনি সূর্যের আলো কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কি অপূর্ব রকম উজ্জ্বল। কারেন তাকিয়ে দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে সেই দেবদূত যাকে সেই ভয়াবহ রাতে গির্জার দোরগোড়ায় দেখেছিল। কিন্তু আজ তাঁর হাতে সেদিনকার মতো ধারালো ভয়ংকর তলোয়ার নেই, আজ তাঁর হাতে ছিল ফুলে ফুলে ভরা একটি গোলাপগাছের ডাল।

সেই ডালটি দিয়ে তিনি ঘরের ছাদটা ছুঁলেন, অমনি ছাদ অনেক ওপরে উঠে গেল আর যে জায়গাতে ফুলগাছের ডাল

ছুঁয়েছিল, সেখানে একটা সোনালি তারা ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল। তার পর গাছের ডালটি দিয়ে দেবদূত দেয়াল ছুঁলেন, অমনি ঘরখানি কত বড়ো হয়ে গেল ; কারেন দেখতে পেল গির্জার অর্গ্যান, সেই পুরনো সমাধিগুলি, কারিকুরি করা আসনে বসে সবাই কেমন ধর্মসঙ্গীতের বই দেখে গান গাইছে।

কারেন বেচারির দীনহীন কুটিরের মধ্যে আজ গির্জা এসে পৌঁছে গেছে, কিম্বা ঘরটাই হয়তো বেড়ে গিয়ে গির্জার অংশ হয়ে গেছে! কারেন সেখানে পাদ্রীর পরিবারের সকলের মাঝখানে বসে আছে। গান শেষ হলে, মুখ তুলে তাকে দেখে, তারা সবাই মাথা হেলিয়ে বলল, "তুমি এসে ভালোই করেছ, কারেন।"

কারেন বলল, "একেই বলে দয়া।"

তার পর আবার অর্গ্যান বেজে উঠল, গানের দলের কচি ছেলেমেয়েদের গলার স্বর তার সঙ্গে কী মধুর কী করুণভাবে মিশে গেল। জানলা দিয়ে কোমল গরম সূর্যকিরণ এসে কারেনের আসনে পড়ল। কারেনের মন সেই সূর্যের আলো, সেই শান্তি, সেই আনন্দ দিয়ে এমনি ভরে উঠল যে সইতে না পেরে বুকখানি তার ভেঙে গেল। কারেনের আত্মা তখন একটি সূর্যকিরণ ধরে স্বর্গে তার পরম পিতার কাছে চলে গেল। সেখানে কেউ তাকে একবারও কোনো দোষ দিল না, লাল জুতোর কথাও কেউ বলল না।

অঙ্গুলিনার কথা

অনেকদিন আগে একজন অল্পবয়সী বৌ ছিল, তার বড়ো
ইচ্ছা তার একটি ছেলে কি মেয়ে হয়। তাই সে ডাইনীবুড়িকে
গিয়ে বলল, "ও বুড়ি-মা, আমার বড়ো ইচ্ছা করে আমার একটি
ছেলে কি মেয়ে হোক। এই এত্তটুকুন একটা ছেলে কি মেয়ে
আমাকে দেবে না, বুড়ি-মা ?"

ডাইনীবুড়ি বলল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আনন্দের সঙ্গে
দেব। এই নাও একটা যবের দানা। চাষাদের ক্ষেতে যেরকম
দানা হয়, মুরগিদের উঠোনে যেরকম দানা ছড়ানো হয়, এ কিন্তু
সে দানা নয়। এটাকে একটা ফুলের টবে পুঁতে দেখো দিকিনি,
কি দেখতে পাও।"

বৌ বলল, "ধন্যবাদ, বুড়ি-মা, ধন্যবাদ!" এই বলে ডাইনী-
বুড়িকে একটা রুপোর আধুলি দিয়ে সে বাড়ি ফিরে এল।
বাড়িতে ফিরেই বুড়ি যেমন যেমন বলেছিল, তাই করল। যবের দানা
মাটিতে পুঁতবামাত্র, অমনি চমৎকার দেখতে প্রকাণ্ড একটা ফুল
মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। দেখতে অনেকটা টিউলিপ ফুলের মতো,
কিন্তু পাপড়িগুলি সব এঁটে বন্ধ করা। তখনো কুঁড়ির অবস্থা।

চাষী-বৌ বলল, "বাঃ, কী সুন্দর ফুল গো! এই বলে
ফুলটার হলুদ লাল পাপড়ির উপরে একটা চুমো খেল। সঙ্গে

সঙ্গে ফট্ শব্দ করে ফুলটা ফুটে গেল। সত্যিই টিউলিপ ফুল, তার হলুদ কেশরের মাঝখানে, ছোট্টো সবুজ মুখটির উপরে এই এতটুকুন একটি মেয়ে বসে আছে। কোমল, সুন্দর ক্ষুদে এক মেয়ে, চাষী-বৌয়ের হাতের বুড়ো আঙুলটির চেয়ে বড়ো নয়। মেয়ের নাম রাখা হল অঙ্গুলিনা।

একটা আখরোটের খোলা পালিশ করে, মেয়ের শোবার জন্য দোলনা হল। তার তোষক হল নীল ভায়োলেটের পাপড়ি, গায়ে দেবার লেপ হল গোলাপ ফুলের পাপড়ি। এই বিছানায় রাতে মেয়ে ঘুমোত; দিনের বেলায় টেবিলের উপরে খেলে বেড়াত।

ছোটো একটা চীনে-মাটির থালায় জল ঢেলে, চাষী-বৌ তাতে ফুল সাজিয়ে রাখল তাদের বোঁটাগুলি জলে ডুবে রইল, ফুলগুলি থালার কানায় গোল হয়ে সাজানো থাকল! থালার জলে চাষী-বৌ বড়ো একটা টিউলিপের পাপড়ি ভাসিয়ে দিল। তাতে বসে অঙ্গুলিনা থালার এ কিনারা থেকে ও কিনারা নৌকো বাইত। দাঁড়ের বদলে তাকে দেওয়া হল দুটি সাদা ঘোড়ার লোম। মেয়ে গানও গাইতে পারত, এমন মৃদু মিষ্টি গলা কেউ কখনো শোনে নি।

একদিন রাতে, অঙ্গুলিনা তার সেই সুন্দর খাটটিতে শুয়ে আছে এমন সময় জানলার ভাঙা শার্শীর মধ্যে দিয়ে বিকট একটা বুড়ি ব্যাঙ এসে ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই ব্যাঙটা থপাস্ করে যে-টেবিলে ছোট্টো মেয়েটি গোলাপের পাপড়ি গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

তাকে দেখে বুড়ি ব্যাঙ মহা খুশি, "আরে, এই তো আমার ছেলের জন্য খাসা এক বৌ পাওয়া গেছে!" এই বলে আখ-রোটের খোলাসুদ্ধ অঙ্গুলিনাকে তুলে নিয়ে, ভাঙা শার্শীর ফোকর

দিয়ে গলে, একেবারে বাগানে গিয়ে হাজির হল। বাগানের ধারে চওড়া এক নালা; নালার দুই ধারে শ্যাওলা আর কাদা; তারই মাঝখানে বুড়ি ব্যাঙ আর তার ছেলের বাসা।

আখরোটের খোলার মধ্যে ঐরকম সুন্দর মেয়ে দেখে বুড়ি ব্যাঙের ছেলের মুখে কথা সরে না। সে শুধু খানিক, "কোক্-কোক্-কোক্-ভেক্কে-ক্কে-ক্কেক্স!" ছাড়া আর কিছু বলতেই পারল না।

বুড়ি মা-ব্যাঙ বলল, "আহা! অত শব্দ করো না, জেগে যাবে! ঐ তো রাজহাঁসের পালকের মতো হাল্‌কা শরীর, কখন না হুস্‌ করে পালিয়ে যায়! শোনো, একটা কাজ করা যাক। ওকে নিয়ে গিয়ে, নালার জলের মাঝখানে যে বড়ো-বড়ো পদ্মের পাতা গজিয়েছে, তারই একটার ওপর রেখে আসা যাক। ঐটুকু ছোট্টো হাল্‌কা একটা মেয়ে, পদ্মপাতাই ওর কাছে একটা দ্বীপের মতো মনে হবে। তা হলে আর কোথাও পালাতেও পারবে না। আমরাও নিশ্চিন্ত মনে মাটির নীচে আমাদের বাসায় গিয়ে বড়ো-বড়ো ঘর বৈঠকখানা গুছিয়ে রাখতে পারব। সেখানে তোমরা দুজনে মনের সুখে বাস করবে।

বাইরে নালায় মে[illegible] পদ্ম ফুল। তাদের বড়ো-বড়ো পাতা দেখে মনে হয় সেগুলি বুঝি জলে ভেসে রয়েছে! নালার পার থেকে যে পাতাটি সবচাইতে দূরে, সেটিই আবার সবচাইতে বড়ো। বুড়ি ব্যাঙ-মা, সাঁতরে সেখানে গিয়ে, সেই পাতার উপরেই আখরোটের খোলাসুদ্ধ অঙ্গুলিনাকে নামিয়ে রাখল।

পরদিন ভোরে জেগে উঠে সে বেচারি যখন দেখল এ কোথায় এসেছে, সবুজ পাতার চারদিকে শুধু জল আর জল, এখান থেকে ডাঙায় যাবার কোনো উপায় নেই, তখন সে ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল।

বুড়ি ব্যাঙ সে সময়ে মাটির নীচে নলখাগড়া আর হলদে

বুনো ফুল দিয়ে ঘর সাজাচ্ছিল। বাড়িতে নতুন বৌ আসবে, ঘর দোর সাজিয়ে-গুছিয়ে না রাখলে চলবে কেন? সাজানো-গোছানো হয়ে গেলে বুড়ি ব্যাঙ তার কদাকার ছেলেকে নিয়ে অঙ্গুলিনার কাছে চলল। ওর সেই সুন্দর খাটটিকে এনে বাসর ঘরে না রাখলে, সেখানে বৌ নিয়ে যাওয়া যায় কি করে?

বুড়ি ব্যাঙ-মা মাথা নুইয়ে নমস্কার করে অঙ্গলিনাকে বলল, "এই আমার ছেলে। ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। বিয়ের পরে দুজনে মিলে, মাটির তলায় আমাদের বাসায় কী আরামেই-না থাকবে!"

ব্যাঙের ছেলের মুখ দিয়ে, "কোক-কোক-ভেকে-কেক্স!" ছাড়া কোনো শব্দ বেরুল না।

তার পর মায়ে পোয়ে আখরোটের খোলার অমন সুন্দর বিছানাটি নিয়ে চলে গেল। সবুজ পাতার উপর অঙ্গুলিনা একা বসে কাঁদতে লাগল। চিমড়ে ব্যাঙ-মার কদাকার ছেলেকে বিয়ে করে, ব্যাঙের বাড়িতে থাকবার তার এতটুকু ইচ্ছা ছিল না।

সবুজ পাতার চারদিকে ছোটো-ছোটো মাছরা সাঁতরিয়ে বেড়াচ্ছিল। বুড়ি ব্যাঙের কথা তাদের কানে যেতেই, সবাই জল থেকে মাথা তুলে দেখতে এল মেয়েটি কেমন। তার পর অমন কোমল সুন্দর মেয়ে দেখে তারা মুগ্ধ হল। বিদ্‌ঘুটে বুড়ি ব্যাঙ তাকে ধরে এনেছে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবে ভেবে তাদের রাগ দেখে কে! নাঃ, এ হতেই পারে না!

এই ভেবে মাছরা চারদিকে ঝাঁক বেঁধে এসে, জলের তলায় সবুজ পাতার বোঁটাটি দাঁত দিয়ে কেটে দিল। পাতাও অমনি স্রোতের সঙ্গে ভেসে গেল। পাতার সঙ্গে অঙ্গুলিনাও ভেসে গেল। ভাসতে ভাসতে এত দূরে তারা চলে গেল যে বুড়ি ব্যাঙ আর তাদের খুঁজে পেল না।

সুন্দর একটা ক্ষুদে সাদা প্রজাপতি অঙ্গুলিনার চারদিকে ঘুরে ঘুরে উড়তে লাগল, তার পর নেমে এসে পাতার উপরে বসল।
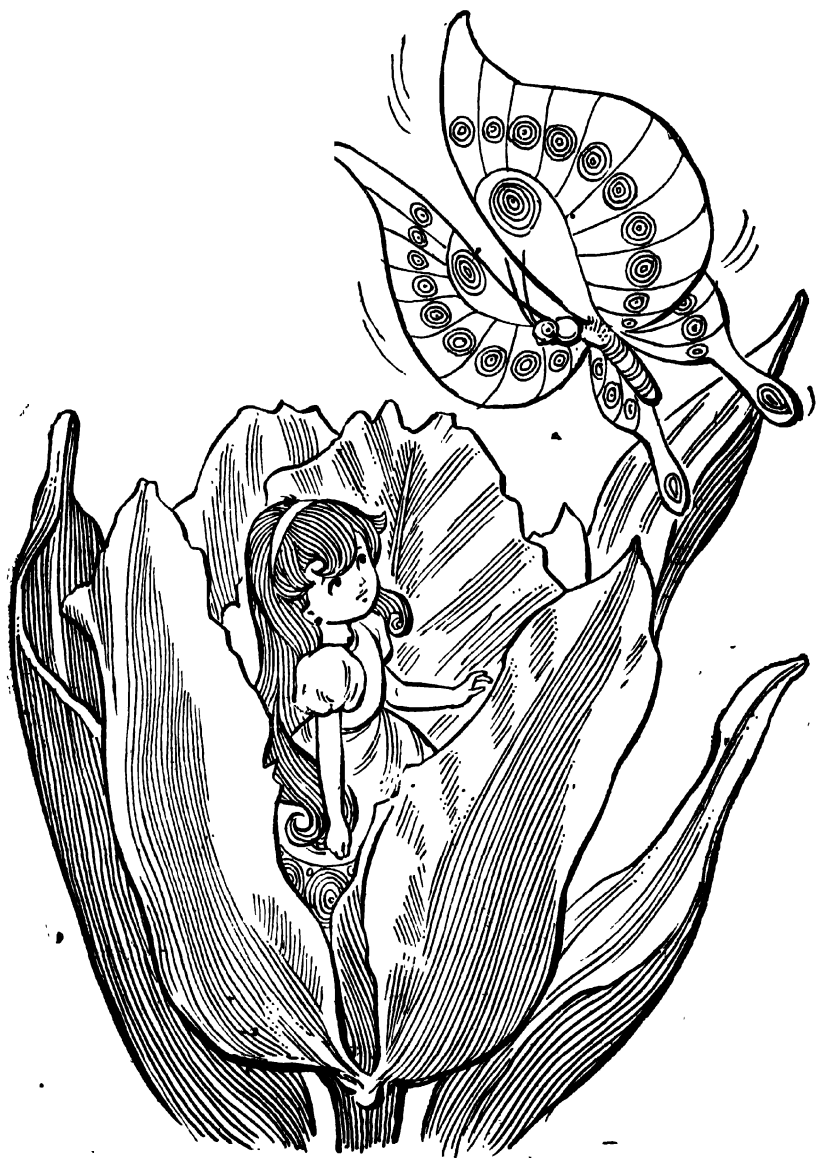
অঙ্গুলিনাকে তার বড়ো ভালো লেগেছিল, অঙ্গুলিনাও খুব খুশি। এখন আর মনে কোনো ভয় নেই, বুড়ি ব্যাঙ পিছন পিছন এত দূরে কখনোই আসতে পারবে না।

স্রোতের সঙ্গে অঙ্গুলিনা ভেসে চলেছে, চেয়ে দেখছে চারদিকটা কী সুন্দর! জলের উপর সূর্যের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে, মনে হচ্ছে জলটা যেন গলানো সোনা। এবার অঙ্গুলিনা তার রেশমী কোমরবন্ধটি খুলে নিয়ে, তার এক মাথা পাতার সঙ্গে আর অন্য মাথা প্রজাপতির গায়ের চারদিকে ঘুরিয়ে বেঁধে দিল। পাতা ভেসেই চলল, ক্রমে তার বেগ বাড়তে লাগল। পাতার সঙ্গে অঙ্গুলিনাও ভেসে চলল।

হঠাৎ একটা মস্ত গুব্‌রে-পোকা গুন্‌গুন্ শব্দ করতে করতে এসে উপস্থিত হল। ছোটো মেয়েটাকে দেখতে পেয়েই গুব্‌রে-পোকা নখ দিয়ে তার সরু কোমরটি জাপটিয়ে ধরে, তুলে নিয়ে গিয়ে একটা গাছে বসল। সবুজ পাতা প্রজাপতিকে নিয়ে স্রোতে ভেসে চলল। প্রজাপতি বেচারা পাতার সঙ্গে বাঁধা, সে ছাড়া পায় কি করে?

গুব্‌রে-পোকা মেয়েটাকে নিয়ে গাছে বসলে, বেচারি অঙ্গুলিনা ভয়েই আধমরা। অমন সুন্দর সাদা প্রজাপতিটাকে পাতার সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিল বলে তার কী দুঃখ! আহা, বেচারা ছাড়া না পেলে তো না খেয়ে মরে যাবে! কিন্তু গুব্‌রে-পোকার তাতে কিই-বা এসে যায়! সে অঙ্গুলিনাকে নিয়ে গাছের সবচেয়ে বড়ো পাতাটিতে বসল। তার জন্য ফুলের মধু এনে দিল; গুন্‌গুন্ করে তার কত গুণগান করল; বলল গুব্‌রীদের মতো দেখতে না হলেও সে বড়ো সুন্দরী।

দেখতে দেখতে গাছে যত গুব্‌রে-পোকা ছিল, সবাই তাকে দেখতে এল। সবাই তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

একজন গুব্‌রী কুমারী দাড়া গুটিয়ে বলে বসল, "এ মা! মোটে দুটো পা! কি খেমো চেহারা রে বাবা!"

আরেকজন বলল, "ই কি! দাড়া নেই কেন?" তৃতীয়জন বলল, "ইস্, কোমরটা কি সরু পাতলা দেখেছিস, ভাই? ঠিক একটা মানুষের মতো!" তার পর সব গুব্‌রী মহিলারা এক-বাক্যে বলল, "ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, ছ্যা, কি চেহারার ছিরি!"

এদিকে যে গুব্‌রে-পোকা অঙ্গুলিনাকে নিয়ে এসেছিল, তার মন কিন্তু মানছিল না যে মেয়েটা রূপসী নয়। তবু বাকি সবাই যখন একবাক্যে বার বার বলতে লাগল এমন হতকুচ্ছিৎ মেয়ে তারা কখনো দেখে নি, তখন শেষপর্যন্ত গুব্‌রেরও মনে হতে লাগল তবে বোধ হয় ওরাই ঠিক বলছে। কাজেই এর সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখা যায় না। গুব্‌রে মুখেও তাই বলল, মেয়েটা যেখানে খুশি যেতে পারে, গুব্‌রের তাতে কিছু এসে যায় না।

তার পর গুব্‌রে-পোকার ঝাঁক গাছ থেকে নেমে অঙ্গুলিনাকে একটা ডেজি ফুলের উপর বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। অঙ্গুলিনার চোখ ফেটে জল এল। হায়, সে কি এতই কুৎসিত যে গুব্‌রীরা কেউ তার সঙ্গে মেলামেশা করতে রাজি হল না! আসলে কিন্তু তার মতো ছোট্টো মিষ্টি মেয়ে আর হয় না, নরম, মিহি, গোলাপের পাপড়ির মতো যেন ওর গায়ের মধ্যে দিয়ে আলো ভেদ করে যায়!

সারা বর্ষাকাল, সারা শরৎ, সারা হেমন্ত, অঙ্গুলিনা বেচারি ঐ বিশাল বনে একলা কাটাল। একটা মস্ত বুনো গাছের পাতার তলায়, ক্ষুদে একটা শুকনো ঘাসের দোলনা বুনে, তাতে সে ঘুমোত, গায়ে বৃষ্টির ছাট লাগত না। ফুলের মধু খেত সে, সকালবেলায় চারদিকের শাক-পাতায় শিশির পড়ে ঝিক্‌মিক্ করত অঙ্গুলিনা সেই শিশির পান করত।

কিন্তু তার পরেই এল শীতকাল ; কনকনে ঠাণ্ডা সেই শীতকাল যেন আর কাটে না ! এত দিন যে-সব পাখিরা তাকে মিষ্টি গান শোনাত, তারা সবাই উড়ে চলে গেল। ফুলগুলো ঝরে গেল। যে মস্ত বুনো পাতার তলায় এত দিন অঙ্গুলিনা বাস করেছিল, সেটাও শুকিয়ে, গুটিয়ে একটা খট্‌খটে হলদে কাঠির মতো হয়ে গেল। শীতে অঙ্গুলিনার সে কী কষ্ট ! তার উপর তার কাপড়-চোপড় সব ছিঁড়ে এসেছিল আর শরীরটাও কি ছোট্টো, হাল্‌কা, পাতলা ! শেষটা জমে মরে আর কি !

তার পর বরফ পড়তে আরম্ভ করল। ওর গায়ে এক কণা বরফ পড়া মানে আমাদের গায়ে এক ঝোড়া বরফ পড়লে যেমন লাগে। মাপে তো বেচারি ইঞ্চি-খানেক ; ওর কাছে আমরা একেকটা দৈত্য বিশেষ ! গায়ে একটা শুকনো পাতা জড়িয়ে কোনোরকমে সে দিন কাটাতে লাগল। কিন্তু গা এতটুকু গরম হল না, শীতের চোটে বেচারি কেঁপেই অস্থির !

বন যেখানে শেষ হয়েছে, তারই কাছে এত দিন অঙ্গুলিনা বাস করেছিল। বনের বাইরে মস্ত একটা শস্য খেত। কবে শস্য কাটা হয়ে গেছিল, শীতে জমা মাটিতে এখন শুধু শুকনো খোঁচা খোঁচা শস্যগাছের গোড়াগুলো বাকি ছিল। কিন্তু তাকেই অঙ্গুলিনার একটা বন বলে মনে হচ্ছিল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেচারি সেই বনের ভিতর দিয়ে চলেছিল।

অবশেষে সে এক মেঠো-ইঁদুরের দোর গোড়ায় পৌঁছুল। শস্যগাছের গোড়ার তলায় মেঠো-ইঁদুর বাসা বানিয়ে ছিল। সেখানে সে আরামে বাস করত ; এক ঘর বোঝাই শস্য, একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর, একটা ভাঁড়ারঘর, আর কি চাই !

বেচারি অঙ্গুলিনা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একটা যবের দানার এক টুকরো ভিক্ষা করল ; দুদিন তার খাওয়া হয় নি।

বুড়ি মেঠো-ইঁদুরের মনটা ছিল ভারি নরম। সে বলল, "আহা, বাছা রে! এসো, আমার গরম ঘরে এসে আমার সঙ্গে কিছু খাও।"

দেখতে দেখতে অঙ্গুলিনাকে তার বড়ো ভালো লেগে গেল। বুড়ি বলল, "বাছা, ইচ্ছা হলে সারা শীতকাল তুমি এখানে আমার সঙ্গে থাকতে পার। ঘরটাকে সাফ-সুপ করে রেখো আর আমাকে গল্প বোলো; গল্প শুনতে আমি বড়ো ভালোবাসি।"

বুড়ি যেমন যেমন চেয়েছিল, অঙ্গুলিনা সে-সবই করত। বুড়িও তাকে খুব আদর-যত্ন করেই রেখেছিল।

একদিন ইঁদুর-বুড়ি বলল, "একটু বাদেই আমাদের বাড়িতে একজন অতিথি আসবেন। আমার পাশের বাড়ির পড়শী, সপ্তাহে একদিন দেখা করতে আসেন। আমার চেয়ে তাঁর অবস্থা ভালো; তাঁর বাড়িতে বড়ো-বড়ো ঘর আর তাঁর গায়ে কী সুন্দর কালো মখমলের জামা! তাঁর সঙ্গে যদি বিয়ে ঠিক করে ফেলতে পার তো বড়ো ভালো হয়। মুশকিল হল লোকটা একেবারে অন্ধ, তোমাকে চোখে দেখতে পাবেন না। ওঁকে ভালো ভালো গল্প বলে ভোলাতে হবে।"

এদিকে পাশের বাড়ির পড়শী ছুঁচোর মন ভোলাবার অঙ্গুলিনার এতটুকু ইচ্ছাও ছিল না; তাকে বিয়ে করতেও সে রাজি ছিল না। কালো মখমলের পোশাক পরে ছুঁচো এলেন। ভারি ধনী, ভারি জ্ঞানী; তার উপর বুড়ি মেঠো-ইঁদুর বলেছিল তাঁর বাড়িটা নাকি এ-বাড়ির চেয়ে কুড়ি গুণ বড়ো! কিন্তু সূর্যের আলো, কিম্বা সুন্দর ফুল তিনি সইতে পারতেন না। সূর্যের আলোও কখনো দেখেন নি, ফুলও দেখেন নি, তবু সব সময় তাদের নিন্দা তাঁর মুখে ধরত না!

অঙ্গুলিনাকে গান গাইতে বলা হল। দুটি গান গাইল সে,

একটি হল, 'ছোটো পোকা, ছোটো পোকা উড়ে যাও বাড়ি !' অন্যটি হল, 'ছাইমাখা সাধু বাবা !' গান দুটি গাইতে না গাইতে অমনি তার মিষ্টি গলা শুনে, ছুঁচো তাকে বড্ডো ভালোবেসে ফেললেন ! তবে মুখে কিছু বললেন না, তাঁর স্বভাবটি ছিল সাবধানী, না ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করতেন না।

মেঠো-ইঁদুরের বাড়িতে আসবার ঠিক আগেই, ছুঁচো তাঁর বাড়ি থেকে এদের বাড়ি পর্যন্ত মাটির তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলেন। মেঠো-ইঁদুর আর অঙ্গুলিনাকে সেই সুড়ঙ্গে ইচ্ছা-মতো চলাফেরা করতে বললেন। বললেন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা মরা পাখি আছে, তাই বলে ওরা যেন ভয় না পায়।

তার পর ছুঁচো মুখে এক টুকরো চকমকি নিয়ে আলো দেখাবার জন্য আগে আগে চললেন। সুড়ঙ্গের যে জায়গায় মরা পাখিটা পড়ে ছিল, সেখানে পেঁ ছে ছুঁচো তাঁর ভোঁতা নাক দিয়ে মাথার উপরকার মাটি ঠেলে তুললেন, যাতে একটু ফাঁক হয়ে, তাই দিয়ে বাইরের আলো আসে।

মাটিতে একটা সোয়ালো পাখি পড়ে ছিল। তার ডানা দুটি গায়ের সঙ্গে শক্ত করে আঁটা, মাথা আর পা দুটি ডানার তলায় গোঁজা। মনে হল শীতের চোটে বেচারি প্রাণ হারিয়েছে। অঙ্গুলিনার বড়ো কষ্ট হল; সারা গ্রীষ্মকাল পাখিরা তাকে কত গান শুনিয়েছে, কত কিচির মিচির করেছে; পাখিদের সে বড়ো ভালোবাসত।

ছুঁচো কিন্তু তাঁর বেঁটে বেঁটে ঠ্যাং দিয়ে পাখিটাকে লাথি মেরে বললেন, "এত শিস্ দেওয়ার এইতো ফল! পাখি হয়ে জন্মানো বড়ো জ্বালা! আমার ছেলেমেয়েরা কেউ পাখি হয়ে জন্মাবে না, এই বড়ো ভাগ্যি! এ-সব জানোয়ারের গলাবাজি ছাড়া কোনো সম্বল থাকে না, শীতে তাই না খেয়ে মরে!"

মেঠো-ইঁদুর বলল, "যা বলেছেন! আপনার মতো বিচক্ষণ জানোয়ারের উপযুক্ত কথাই বটে! এই যে এত কিচির মিচির, এত গান গাওয়া, তার বদলে পাখি পেলটা কি? শীত এলেই তো না খেয়ে, শীতে জমে মল! এদিকে তো গায়ে-গতরে এই প্রকাণ্ড!"

অঙ্গুলিনা কিছু বলল না। কিন্তু অন্যরা পাখির দিকে পিঠ ফেরালে, সে নিচু হয়ে পাখির মাথার পালকে হাত বুলিয়ে দিল, বোজা চোখে চুমো খেল। ভাবল, 'গ্রীষ্মকালে হয়তো এই পাখিটাই আমাকে অমন সুন্দর গান শোনাত। আহা, কি ভালো পাখিটা, আমাকে কত আনন্দই-না দিয়েছে!'

ছুঁচো এবার বাইরের আলো আসার পথটুকু বুজিয়ে দিয়ে মেয়েদের সঙ্গে বাড়ি এলেন। সে রাত্রে কিন্তু অঙ্গুলিনার ঘুম হল না। বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে, খড় দিয়ে সে একটা চাদর বুনে, সুড়ঙ্গে ঢুকে মরা পাখির গায়ে সেটি পেতে দিল। তার উপর মেঠো-ইঁদুরের ঘর থেকে একটু নরম তুলো এনে পাখির গায়ে জড়িয়ে দিল। আহা, ঐ ঠাণ্ডা মাটিতে পড়ে আছে, ওর গাটা একটু গরম হোক। অঙ্গুলিনা বলল, "ও আমার আদরের পাখি, বিদায়; গ্রীষ্মকালে আমাকে কী সুন্দর গান শুনিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ। তখন গাছের রঙ ছিল সবুজ আর কী সুন্দর রোদের তাপ লাগত আমাদের গায়ে!"

এই বলে, সে পাখির বুকে মাথা রাখল। রেখেই ভয়ে সে

চমকে উঠল—পাখির বুকে ও কিসের ধুক্‌ধুক্ শব্দ? পাখির হৃৎপিণ্ড ধুক্‌ধুক্ করছে; পাখি তবে মরে নি। শীতের চোটে সে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল, এখন শরীরে একটু তাপ লাগতেই, আবার প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল!

ভয়ের চোটে অঙ্গুলিনা কেঁপেই অস্থির, ওর ছোট্টো দেহের কাছে পাখিটা যে বেজায় বড়ো! তবু সাহসে ভর করে সে তুলো-গুলোকে পাখির গায়ে আরো ভালো করে জড়িয়ে দিল। তার পর একটা পাতা এনে পাখির মাথা চাপা দিল। ঐ পাতাটা ও নিজে গায়ে দিত।

পরদিন রাতে অঙ্গুলিনা আবার পা টিপে টিপে পাখির কাছে গিয়ে দেখল পাখির শরীরে প্রাণ ফিরে এসেছে। কিন্তু পাখি এতই দুর্বল যে শুধু এক মুহূর্তের জন্য চোখ খুলে একবার তার দিকে চাইল। সে তার পাশে চকমকি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, অন্য আলো কোথায় পাবে?

রুগ্ন সোয়ালো কথা বলল, "ওগো, মিষ্টি ছোট্টো মেয়ে, তোমার জন্যই আবার আমার গা গরম হল। কী আরাম! শিগ্‌গিরই দেহে বল ফিরে আসবে, তখন আমি গরম রোদে আবার উড়ে বেড়াতে পারব।"

অঙ্গুলিনা বলল, "না, না, বাইরে এখনো বড়ো শীত, বরফ পড়ছে, জল জমে যাচ্ছে। তুমি তোমার এই গরম বিছানাটিতে শুয়ে থাক, ভাই, আমি তোমার দেখাশুনো করব।"

তার পর একটা ফুলের পাপড়ি ভরে পাখির জন্য অঙ্গুলিনা জল আনল, পাখি জল খেল। পাখি বলল কাঁটাগাছের কাঁটা লেগে তার একটা ডানা জখম হয়েছিল। অন্য সোয়ালোরা যখন শীতের আগে দল বেঁধে গরম দেশে চলে গেল, সে তাদের সঙ্গে উড়তে না পেরে, মাটিতে পড়ে গেছিল। তার পর আর কিছু

তার মনে নেই। মাটির তলার সুড়ঙ্গের মধ্যে সে যে কী করে এল, তা সে নিজেই জানত না।

সে যাই হোক, সারা শীতকাল পাখি ঐ মাটির তলার সুড়ঙ্গে কাটাল। অঙ্গুলিনা তার সে যে কী যত্ন করত, তাকে কত ভালোবাসত, সে আর কি বলব। ছুঁচোর কাছে, কিম্বা মেঠো-ইঁদুরের কাছে পাখির কথা কিছুই সে বলল না। ও জানত যে ওরা পাখি-টাখি সইতে পারে না।

যেই বসন্ত এল, সূর্যের তাপ মাটি ভেদ করে সুড়ঙ্গে এসে পৌঁছল। সোয়ালো পাখি তখন অঙ্গুলিনার কাছে বিদায় নিল। অঙ্গুলিনা ছুঁচোর তৈরি সুড়ঙ্গের ছাদের সেই ফুটো থেকে আবার মাটি সরিয়ে দিল। অমনি দুজনার গায়ে কি মিষ্টি রোদ এসে পড়ল। পাখি জিজ্ঞাসা করল, "যাবে আমার সঙ্গে? আমার পিঠে উঠে বস, দুজনে ঐ সবুজ বনের মাঝখানে উড়ে চলে যাই।"

কিন্তু অঙ্গুলিনা জানত সে চলে গেলে বুড়ি মেঠো-ইঁদুর বড়ো বিরক্ত হবে। কাজেই সে বলল, "না, ভাই, আমি যেতে পারব না, আমার যাবার উপায় নেই।"

সোয়ালো পাখি বলল, "তা হলে বিদায়, ওগো লক্ষ্মী রূপসী মেয়ে!" এই বলে সে সেই মিষ্টি রোদে উড়ে চলে গেল। অঙ্গুলিনা সেই দিকে চেয়ে রইল, তার চোখ ভরে জল এল, পাখিটাকে সে যে বড়োই ভালোবাসত।

এদিকে পাশের বাড়ির সেই কালো মখমলের পোশাক পরা অন্ধ গোমড়ামুখো ছুঁচো তার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ করেছেন। মেঠো-ইঁদুর বলল, "এবার গ্রীষ্মে তা হলে তোমার বিয়ের কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা করতে হয়। তোমার জন্য যথেষ্ট গরম কাপড়, সুতীর কাপড় দিতে হবে। ছুঁচোর বাড়ির গিন্নী

হবে তুমি, সঙ্গে যথেষ্ট পোশাক-আশাক আসবাব নিয়ে যাওয়া চাই।" কাজেই অঙ্গুলিনাকে পশম বুনবার তক্‌লি নিয়ে বসতে হত। তা ছাড়া মেঠো-ইঁদুর কয়েকটা মাকড়সাও ভাড়া করে আনল, তারা রাতদিন সুতো কাটত আর কাপড় বুনত।

রোজ সন্ধেবেলায় ছুঁচো আসতেন, এসেই বলতেন গ্রীষ্মটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে বাঁচা যায়! তার পর সূর্যের তেজ কমে গেলে, মাটিটাও এরকম খট্‌খটে শুকনো থাকবে না, তখন অঙ্গুলিনার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে।

এরকম কথা শুনতে অঙ্গুলিনার একটুও ভালো লাগত না; ছুঁচোর গোমড়ামুখ দেখে দেখে আর বকবকানি শুনে শুনে তার বিরক্তি ধরে গেছিল। রোজ সকালে যখন সূর্য উঠত আর সন্ধ্যাবেলায় যখন সূর্য ডুবত, সে আস্তে আস্তে সদর দরজা দিয়ে বাইরে আসত। বাতাস লেগে শস্য-গাছের আগা সরে সরে যেত, সেই ফাঁক দিয়ে অঙ্গুলিনা নীল আকাশ দেখতে পেত। তার মনে হত আহা, ঐ আকাশটি কী উজ্জ্বল, কী সুন্দর! সোয়ালো পাখিকে আবার দেখতে বড়ো ইচ্ছা করত। কিন্তু পাখি আর আসে নি। কে জানে ঐ সুন্দর সবুজ বনের উপর দিয়ে কত দূরে সে উড়ে চলে গেছে!

তার পর হেমন্তকাল এল; অঙ্গুলিনার বিয়ের কাপড়-চোপড় সব তৈরি। মেঠো-ইঁদুর বলল, "আর চারটে সপ্তাহ যাক, তার পর তোমার বিয়ে!" তখন অঙ্গুলিনা কেঁদে বলল, গোমড়া-মুখো ছুঁচোকে সে বিয়ে করবে না!

মেঠো-ইঁদুর চটে গেল। "যত-সব বায়নাক্কা! দেখ বাছা, অত গোঁ ভালো না, তা হলে আমি তোমাকে আমার সাদা সাদা দাঁত দিয়ে কামড়ে দেব! উনি দেখতে সুপুরুষ নন বলতে চাও? আরে, স্বয়ং রানীমার ওঁর মতো কালো মখমলের পোশাক

নেই! তবে কি উনি বড়োলোক নন বলতে চাও? ওঁর রান্না-ঘর, ভাঁড়ারঘর কি উপচে পড়ছে না? তোমার অনেক ভাগ্যি যে এমন বর পাচ্ছ!" এমনি করে বিয়ের দিন এসে গেল; ছুঁচো এলেন বৌ নিয়ে যেতে। এখন থেকে অঙ্গুলিনাকে তাঁর সঙ্গে মাটির তলায় থাকতে হবে। আর কখনো সে তার এত ভালোবাসার মিঠে গরম রোদ দেখতে পাবে না, ছুঁচো রোদ সইতে পারেন না। বেচারি অঙ্গুলিনার সমস্ত মন হতাশায় ভরে গেল, এই সুন্দর সূর্যের আলোর কাছ থেকে এবার তাকে বিদায় নিতে হবে। মেঠো-ইঁদুরের বাড়িতে যতদিন ছিল, ততদিন তবু মাঝে মাঝে ফাঁক-তালে রোদের দেখা পেত; এখন থেকে আর নয়।

মেঠো-ইঁদুরের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে অঙ্গুলিনা একটু দূরে এগিয়ে, আকাশে দুহাত তুলে বলল, "রোদ, তোমার তুলনা নেই, এবার বিদায়!" এরই মধ্যে শস্য কাটা হয় গেছিল, চার দিকে শুধু তার গোড়াগুলি খোঁচা খোঁচা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তারই মাঝখানে ছোট্টো একটি লাল ফুল ফুটেছিল। অঙ্গুলিনা তার ছোটো-ছোটো হাত দুটি দিয়ে লাল ফুলকে জড়িয়ে ধরে বলল, "বিদায়! বিদায়! সোয়ালো পাখির সঙ্গে দেখা হলে আমার প্রীতি জানিও।"

ঠিক সেই সময়, মাথার উপরে পাখার ঝাপটানি শোনা গেল। কে বলল, "কিভি! কিভি!" অঙ্গুলিনা উপর দিকে তাকিয়ে দেখল, ও মা! ঐ তো সোয়ালো পাখি উড়ে যাচ্ছে। তাকে দেখে পাখি কী খুশি! তখন অঙ্গুলিনা পাখিকে সব কথা বলল। বলল তাকে বিদ্‌ঘুটে ছুঁচোকে বিয়ে করতে হবে, এখন থেকে মাটির তলায় থাকতে হবে; সেখানে সূর্যের কিরণ পৌঁছয় না। এই-সব কথা বলতে বলতে অঙ্গুলিনা আর কান্না রাখতে পারল না।

সোয়ালো পাখি বলল, "শীত এল বলে ; এবার আমি গরম দেশে উড়ে চলে যাব। যাবে আমার সঙ্গে ? তুমি আমার পিঠে চড়ে, তোমার কোমরের ফিতেটা দিয়ে আমার সঙ্গে নিজেকে এঁটে বেঁধে ফেল দিকিনি। তার পর এসো আমরা হাঁদা ছুঁচো আর তার অন্ধকার ঘর থেকে অনেক দূরে, ঐ পাহাড়ের উপর দিয়ে, যে-দেশে সদাই কী সুন্দর রোদ ওঠে, যেখানে সর্বদা গ্রীষ্মকাল, যেখানে সারা বছর ফুল ফোটে, সেই দেশে চলে যাই ! আমার সঙ্গে উড়ে চল, ও আমার ছোটো মিষ্টি অঙ্গুলিনা, মাটির নীচে অন্ধকার সুড়ঙ্গে যখন আমি শীতে জমে মরার মতো পড়েছিলাম, তখন তুমিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলে।"

এবার অঙ্গুলিনা বলল, "চল, চল, তোমার সঙ্গে চলে যাই।" এই বলে পাখির ডানায় পা রেখে, পাখির পিঠে চড়ে বসল। তার পর পাখির ডানার একটা শক্ত পালকের সঙ্গে কোমরের দড়ি দিয়ে নিজেকে এঁটে বেঁধে দিল। সোয়ালো পাখি আবার আকাশে উড়ল। অনেক উঁচুতে বনের উপর দিয়ে, হ্রদের উপর দিয়ে, সারা বছর যে-সব পাহাড়ের চুড়ো বরফে ঢাকা থাকে তাদের উপর দিয়ে, পাখি উড়ে চলল।

সেখানকার ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে বুকে যেতেই, অঙ্গুলিনা শীতে কাঁপতে লাগল। অবিশ্যি তার পরেই সে পাখির নরম গরম পালকের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে, শুধু মাথাটুকু বের করে নীচেকার অপার মহিমা আর অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে লাগল।

অবশেষে তারা গরম দেশে পৌঁছল। অঙ্গুলিনাদের দেশের চেয়ে এখানকার সূর্য কত বেশি উজ্জ্বল। মনে হল আকাশটাও বুঝি দুগুণ উঁচু, দুগুণ নীল। পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সবুজ আর বেগনি আঙুরের লতার কী বাহার! কুঞ্জবনে

লেবু হয়েছে, তরমুজ হয়েছে। দোপাটি আর অন্য ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভুর-ভুর করছে। পথের ধারে ধারে দলে দলে সুন্দর দেখতে ছোটো ছেলেমেয়েরা খেলা করছে, কী তাদের ফুর্তি, তারা মস্ত-মস্ত রঙিন প্রজাপতির পিছনে ছুটছে!

কিন্তু সোয়ালো পাখি সেখানে থামল না। সে উড়েই চলল, যতই যায় চারদিকের দৃশ্যই তত বেশি সুন্দর লাগে। একটা শান্ত নীল হ্রদের চারদিকে উঁচু-উঁচু গাছ; তারই কাছে একটা ভাঙন-ধরা শ্বেতপাথরের প্রাসাদ, কোন কালে তৈরি হয়েছিল কে জানে! উঁচু সরু থাম বেয়ে লতা-গাছ উঠছে। থামের মাথায় সবুজ পাতা আর শুঁয়ো দুলছে। সেইখানে অনেক সোয়ালো পাখির বাসা। তারই মধ্যে একটা বাসা হল অঙ্গুলিনা যে সোয়ালোর পিঠে চড়েছিল, তার।

পাখি বলল, "এইখানে আমার বাসা। অবিশ্যি নীচে ঐ যে-সব চমৎকার ফুল ফুটে রয়েছে, তার একটাতে যদি থাকতে চাও, আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। সবচাইতে সুন্দর ফুলটিতে নাহয় তোমার বাসা কর।"

ছোটো-ছোটো হাতে হাততালি দিয়ে অঙ্গুলিনা বলল, "বাঃ, বাঃ, তা হলে তো চমৎকার হয়!"

নীচে সবুজ ঘাসের উপর একটা শ্বেতপাথরের থাম ভেঙে পড়েছিল। তার ভাঙা টুকরোগুলির চার দিকে জড়িয়ে উঠেছিল একটা লতা-গাছ, তার বড়ো-বড়ো, সাদা রঙের ফুলগুলি ভারি সুন্দর। সোয়ালো পাখি নেমে এসে তারই একটা চওড়া পাপড়িতে অঙ্গুলিনাকে বসিয়ে দিল।

অঙ্গুলিনা অবাক হয়ে দেখল, ফুলের বুকের ভিতর ক্ষুদে একটি মানুষ; এত সাদা, স্বচ্ছ যে দেখে মনে হয় বুঝি কাঁচের তৈরি। মাথায় তাঁর সুন্দর সোনার মুকুট; দুই কাঁধে দুটি

মিহি রঙিন পাখা ; মাথায় অঙ্গুলিনার চেয়ে হয়তো একটু বড়ো কি না-বড়ো। তিনি হলেন ফুলপরী। প্রত্যেক ফুলের মধ্যে এমন একটি পরী-ছেলে, কিম্বা পরী-মেয়ে থাকে। ইনি হলেন সব ফুলপরীদের রাজা। অঙ্গুলিনা তাঁকে দেখে পাখির কানে কানে বলল, "আহা, পরীদের রাজা কি সুন্দর দেখতে!"
অত বড়ো রাক্ষুসে পাখিটা হঠাৎ অমন ঝুপ্‌ করে নামাতে, পরীদের রাজা প্রথমে একটু চমকে গেছিলেন। কিন্তু অঙ্গুলিনাকে দেখে তিনি বড়ো খুশি হলেন, এমন সুন্দর কন্যে তিনি আর কখনো দেখেন নি। তখুনি নিজের মাথা থেকে সোনার মুকুট খুলে তিনি অঙ্গুলিনার মাথায় পরিয়ে দিলেন। তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করে বললেন, "তুমি কি আমাকে বিয়ে করে, সব ফুলপরীদের রানী হবে?"

এ বর একেবারে অন্যরকম। বিদ্‌ঘুটে ব্যাঙ-মার ছেলের মতোও ইনি নন, কালো মখমলের জামা পরা ছুঁচোর মতোও নয়! কাজেই অঙ্গুলিনা রাজি হয়ে গেল। তখন একেকটি ফুল থেকে একেকজন পরী-ছেলে, পরী-মেয়ে বেরিয়ে এসে অঙ্গুলিনাকে অভিনন্দন জানাল। প্রত্যেকে তার জন্য উপহার আনল।

তার মধ্যে সবচাইতে ভালো উপহার হল, এক জোড়া জলের মতো পাতলা ডানা। সেই ডানা অঙ্গুলিনার কাঁধে লাগিয়ে দিতেই, সে ফুল থেকে ফুলে উড়ে বেড়াতে পারল। এরচাইতে বেশি আনন্দ আর কিসে হতে পারে? বাসায় বসে ছোটো সোয়ালো পাখি তাকে তার সবচাইতে মিষ্টি গানটি শোনাল। তবে পাখির মনে বড়ো দুঃখ ; সে-ও কিনা অঙ্গুলিনাকে ভালোবাসত, তার সঙ্গে কোনোদিন ছাড়াছাড়ি না হয়, এই ছিল যে তার প্রাণের ইচ্ছা

ফুলরাজ বললেন, "তোমাকে আর কেউ অঙ্গুলিনা বলে ডাকবে না। তুমি এত সুন্দর, ও নাম তোমাকে মানায় না। আমরা তোমার নাম দিলাম মায়া।"

সোয়ালো পাখি তার পর বিদায় নিয়ে আবার গরম দেশ থেকে ডেনমার্কে ফিরে গেল। সেখানে যে লোকটা ছোটোদের জন্য গল্প লেখে, তার জানলার উপরে সোয়ালোর ক্ষুদে একটি বাসা ছিল। সেই বাসায় গিয়ে সোয়ালো গাইতে লাগল, "ক্কিভি! ক্কিভি! ক্কিভি!" তার কাছ থেকেই আমরা এই গল্পটি শুনেছি।

তুষার-রানীর কথা

আয়না ও তার ভাঙা টুকরো

অনেকদিন আগে এক জাদুকর ছিল; লোকটা ছিল খারাপ, ভারি খারাপ। একটা জাদু-আয়না বানিয়ে তার ফুর্তি দেখে কে! আয়নার এই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে ওতে যদি সুন্দর বা ভালো কিছুর ছায়া পড়ত, তা হলে সেটা শুকিয়ে কুঁকড়িয়ে প্রায় নেই হয়ে যেত। কিন্তু অকেজো কদাকার জিনিসের ছায়া পড়লে, সেগুলো বেড়ে প্রকাণ্ড হয়ে, আগের চাইতে দশ গুণ মন্দ দেখতে হত।

অতি অপূর্ব দৃশ্যপটের ছায়া যদি ওতে পড়ত, মনে হত যেন খানিকটা সিদ্ধ করা পালং শাক! অতিশয় রূপবান লোকদের মনে হত কুৎসিত, কিম্বা যেন দু ঠ্যাং উঁচু দিকে করে মাথায় ভর করে দাঁড়িয়েছে; তাদের নাক মুখ বেঁকে-চুরে এমনি বিশ্রী দেখাত যে বন্ধুবান্ধবদের সাধ্য ছিল না তাদের চেনে!

তার উপর কারও মুখে যদি ছোট্টো একটা ফুটকির মতো দাগ থাকত, আয়নায় দেখলে মনে হত বুঝি তার সারা নাক মুখ জুড়ে ফুটকি ফুটকি দাগ। কারও মনে যদি কোনো সাধু চিন্তা জাগত, আয়নায় মনে হত মুখটা কুঁচকিয়ে আছে! জাদুকর

এ-সব দেখে ভারি মজা পেত ; বুদ্ধি করে এমন জিনিস গড়েছে বলে আহ্লাদের চোটে সে ফিক্‌ফিক্ করে হাসত।

একটা জাদু-বিদ্যালয়ে জাদুকর জাদু শেখাত। সেখানে যারা যাওয়া-আসা করত, তারা দেশ-বিদেশে ঐ জাদু-আয়নার খ্যাতি রটাত। তারা বলত নাকি আগে যা কখনো হয় নি, এবার

তাই হচ্ছে, পৃথিবীর এবং পৃথিবীর লোকদের আসল চেহারা ধরা পড়ছে। আয়না নিয়ে তারা সব জায়গায় ঘুরত। শেষটা এমন দেশ বা মানুষ বাকি রইল না, ঐ আয়নায় যার ভুল চেহারা দেখা যায় নি।

শেষে ভক্তরা আয়না নিয়ে আকাশে উড়ল, সেখানে আয়না

নিয়ে মজার খেলা চলে কি না দেখা চাই। কিন্তু যতই উপরে ওঠে, আয়না ততই বেঁকে যায়, অনেক কষ্টে তাকে আ-ভাঙা আস্ত অবস্থায় রাখতে হচ্ছিল। তবু তারা উড়েই চলল ; আরো উঁচুতে, আরো উঁচুতে উঠতে উঠতে, শেষটা আয়না কেঁপে-টেঁপে, এক ঝাঁকি দিয়ে, ওদের হাত থেকে ফস্‌কিয়ে, একেবারে লক্ষ কোটি পরার্ধ টুকরো হয়ে, মাটিতে ভেঙে পড়ল !

তার ফলে আগের চাইতেও লোকের দুঃখের পরিমাণ বেড়ে গেল, কারণ বালির কণার চেয়েও ছোটো-ছোটো আয়নার টুকরো বাতাসে উড়ে বেড়াতে লাগল। তার এক কণা যদি দৈবাৎ কোনো মানুষের চোখে পড়ত, তা হলে সে মানুষ সব কিছু ভুল দেখতে শুরু করত। কিম্বা যেখানকার যত বিকৃত খারাপ জিনিস, শুধু তাই-ই তার চোখে পড়ত। গোটা আয়নার মন্দ গুণগুলো প্রত্যেকটি কুচির মধ্যে বর্তাল। কারও কারও ভাগ্য এমনি মন্দ ছিল যে আয়নার কুচি একেবারে তাদের হৃদয়ে গিয়ে বিঁধত ; তার ফল হত সাংঘাতিক। হৃদয়টা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন হয়ে যেত।

একেকটা ভাঙা টুকরো ছিল এত বড়ো যে জানলায় শার্শীর মতো বসানো যেত। কিন্তু ঐরকম শার্শীর মধ্যে দিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের দিকে তাকালেই তো হয়ে গেল ! কোনো কোনো টুকরো দিয়ে কেউ চশমা বানাত, তার পর সে চশমা কারও চোখে লাগসই হওয়াই হয়ে উঠত এক ব্যাপার !

ব্যাপার দেখে দুষ্টু জাদুকরের বেজায় মজা লাগত, হেসে হেসে তার ফিক্‌ ব্যথা ধরে যেত !

আজ পর্যন্ত ঐ সর্বনেশে আয়নার কয়েকটা ছোটো কুচি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। সে বিষয়ে খানিক বাদেই আরো শোনা যাবে।

একজন ছোটো ছেলে ও একজন ছোটো মেয়ে

একটা মস্ত শহর; সেখানে এত বাড়ি আর এত বাসিন্দা যে সবার পক্ষে ছোটো এক ফালি বাগান করাও সম্ভব ছিল না। অনেককেই কয়েকটা মাটির বাসনপত্রে গাছ পুঁতে খুশি থাকতে হত। ঐ শহরে দুজন গরিব ছেলেমেয়ে থাকত, তাদের বাগানটি ফুলের টবের চাইতে সামান্য বড়ো ছিল। ওরা ভাইবোন নয়, কিন্তু পরস্পরকে ভাইবোনের মতোই ভালোবাসত। ওদের মা-বাবারা দুই বাড়ির ছাদের উপর মুখোমুখি দুটি চিলেকোঠায় থাকতেন। এক বাড়ির ছাদটি পাশের বাড়ির ছাদে প্রায় লাগে লাগে, মাঝখানে শুধু বৃষ্টির জল যাবার জন্য একটি টিন দিয়ে বাঁধানো নালা। এ বাড়িতে একটি জানলা আর তারই সামনে ও বাড়িতেও একটি জানলা, মাঝখানে নালা। এ জানলা থেকে লম্বা একটা পা ফেলে নালা পেরিয়ে, ও জানলায় ওঠা যায়।

দুই বাড়ির মা-বাবার একটি করে বড়ো কাঠের বাক্স ছিল, তার মধ্যে তাঁরা শাকসব্জি তুলতেন। বাক্স দুটি নালার উপরে পাশাপাশি বসানো থাকত, এত কাছাকাছি যে প্রায় ছোঁয়-ছোঁয়। শাকসব্জি ছাড়াও দুই বাক্সে একটি করে সুন্দর গোলাপগাছ হয়েছিল। দুটি লাল লতা-গাছ দুই জানলার উপর দিয়ে লতিয়ে উঠেছিল, তাদের লম্বা লম্বা শুঁয়ো গোলাপ-গাছের ডালপালায় জড়িয়ে গিয়ে, পথের এপার ওপার যেন একটি ফুলে ভরা তোরণ বানিয়ে রাখত।

বাক্স দুটি ছিল খুব উঁচু, ছেলেমেয়েরা জানত যে তার উপর চড়তে নেই, কিন্তু প্রায়ই তারা মা-বাবাকে বলে দুটি ছোটো টুল নিয়ে গোলাপগাছের তলায় বসে বড়ো সুখে সময় কাটাত। শীতের সময় এ-সব আনন্দের উপায় ছিল না। জানলা দুটিতে

বরফ পড়ে জমে থাকত, কিচ্ছু দেখা যেত না। তখন তারা করত কি, দুটি তামার আধলা নিয়ে, উনুনে গরম করে, বরফ জমা জানলার কাঁচের উপর চেপে ধরত। অমনি সেই জায়গা-টুকুর বরফ গলে, দুটি ছোটো-ছোটো গোল গোল পরিষ্কার জায়গা হয়ে যেত। তার মধ্যে দিয়ে ওরা এ-ওকে দেখত।

ছেলেটির নাম কে, মেয়েটির নাম গের্দা। গরমের সময় জানলা দিয়ে বেরিয়ে এসে, এক লাফে এ-ওর বাড়ি যাওয়া যেত। কিন্তু শীতকালে এ বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে, পথ পার হয়ে, ও বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হত। কত সময় বাইরে বাতাস হু-হু করে গর্জন করত, বরফ পড়ত।

বুড়ি ঠাকুমা বললেন, "ওরা হল সাদা মৌমাছি ; ঐ দেখ, চাক বাঁধছে!" ছেলেটা জানত মৌমাছিদের একজন রানী থাকে, সে জিজ্ঞাসা করল, "ওদের মৌ-রানী আছে ?"

ঠাকুমা বললেন, আছে, "আছে, ঐ যেখানে সবাই ভিড় করে রয়েছে, ঐখানে মৌ-রানী। সে-ই হল সবার বড়ো। এ পৃথিবীতে থাকে না মৌ-রানী, উড়ে ঐ কালো মেঘের মধ্যে চলে যায়। মাঝে-মাঝে শীতের রাতে শহরের পথের উপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে, জানলার কাঁচের উপর হিম নিশ্বাস ফেলে। অমনি জানলার কাঁচে কী অদ্ভুত সুন্দর সব বরফের নক্‌শা পড়ে যায়, গাছের মতো ফুলের মতো।"

ছেলেমেয়েরা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা দেখেছি।" ওরা জানত ঠাকুমা সত্যি কথাই বলেছেন।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, "তুষার-রানী এই ঘরের মধ্যে আসতে পারেন ?"

ছেলেটি বলল, "এলেই আমি তাঁকে ধরে উনুনে চাপাব, ব্যস্ গলেটলে একাকার!"

ঠাকুমা ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে, কতরকম গল্প বলতে লাগলেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে কে কাপড়-চোপড় ছাড়তে ছাড়তে, জানলার ধারে চেয়ারটাতে চড়ে, সেই ছোটো গোল ফাঁকটা দিয়ে বাইরে তাকাল। ঠিক সেই সময় জানলার বাইরে কয়েকটা বরফের নরম নরম টুকরো পড়ল। তাদের মধ্যে সব চাইতে বড়োটি আবার ফুলের টবের কানায় পড়ল। অমনি মনে হল সেটা ক্রমে যেন বড়ো হয়ে যাচ্ছে, বাড়তে বাড়তে বরফের টুকরোটা একজন মহিলার মতো দেখতে হয়ে গেল। চমৎকার সাদা কাপড়ের পোশাক পরা, যেন ছোট্টো-ছোট্টো তারার কণা দিয়ে তৈরি। কী ফরসা, সুন্দর; কী মিহি পাতলা চেহারা। কিন্তু আগাগোড়া চোখ-ঝলসানো ঝক্‌ঝকে বরফ দিয়ে তৈরি। তাঁর চোখ দুটি তারার মতো জ্বলজ্বল করতে লাগল, কিন্তু তাতে না ছিল শান্তি, না ছিল সুখ। তিনি জানলার দিকে মাথা দুলিয়ে, হাত দিয়ে ইশারা করলেন। ছোট্টো ছেলেটা ভয় পেয়ে, এক লাফে চেয়ার থেকে নেমে পড়ল। ঠিক তখনি মনে হল যেন মস্ত একটা পাখি জানলার পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল।

পরদিন পরিষ্কার হিম পড়ল আর দেখতে দেখতে বসন্তকাল এসে গেল। গাছে গাছে ফুলের পাতার কুঁড়ি ধরল। সোয়ালো পাখিরা বাসা বাঁধতে লাগল, ঘরে ঘরে জানলা খোলা হল। ছোটো ছেলেমেয়ে দুটি আবার নালার পাশে তাদের ক্ষুদে বাগানটিতে এসে বসল।

সে বছর গরমের সময় গোলাপ ফুলের সে কী বাহার! ছোটো মেয়েটি একটা নতুন উপাসনার গান শিখল, তাতে গোলাপের কথা ছিল; অমনি তার নিজেদের বাড়ির গোলাপের

কথা মনে পড়ে গেল। কাজেই ছেলেটিকে গানটা শোনাতে হল, সে-ও সঙ্গে সঙ্গে গান ধরল। গানটা এইরকম—

গোলাপ ফোটে, গোলাপ ঝরে,
দেব-শিশু রয় চির তরে।
সে মুখ দেখে ধন্য হই,
সদাই শিশুর মতো রই।

তার পর ছোটো ছেলেমেয়ে দুটিতে হাত ধরাধরি করে গোলাপ ফুলকে চুমো খেল, নীল আকাশ পানে তাকিয়ে দেখল আর কত কথাই-না বলল। গ্রীষ্মের সেই দিনগুলি কী চমৎকার! গোলাপগাছের তলায় বসে থাকতে কী ভালোই না লাগত, মনে হত ফুল-ফোটার পালা শেষ করতে গাছের এতটুকু ইচ্ছে নেই।

একদিন কে আর গের্দা বসে বসে পশু-পাখির ছবির বই দেখছিল, হঠাৎ কে বলে উঠল, "উঃ, বুকের ভিতরে কি একটা ব্যথা খোঁচা দিল রে! আর চোখেও যেন কি পড়ল!"

গের্দা মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেল। কে চোখ মিটমিট করতে লাগল। নাঃ, কিছুই দেখা গেল না। শেষে কে বলল, "যাক্ গে, চলে গেল বোধ হয়।" কিন্তু যায় নি সে। চোখে পড়েছিল সেই জাদু-আয়নার একটা কুচি; সেই আয়না, যার মধ্যে যা কিছু ভালো, যা কিছু সুন্দর, তাকে দেখায় নীচ আর কদাকার। আর যা কিছু কদাকার আর নীচ, তাকে তোলে আরো বাড়িয়ে। আরেকটা কুচি কে বেচারার হৃদয়ে গিয়ে ফুটে ছিল; হৃদয়টা এবার বরফের ডেলার মতো ঠাণ্ডা কঠিন হয়ে যাবে। ব্যথা আর টের পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু আয়নার কুচি দুটো বিঁধেই রইল!

কে হঠাৎ বলল, "কাঁদছ কেন? কাঁদলে তোমাকে বিশ্রী কদাকার দেখায়। আমার কিচ্ছু হয় নি।" তার পর আবার বলে উঠল, "এ রাম! এই গোলাপটাতে পোকা আছে আর এটার দিকে একবার তাকাও। যাই বল গোলাপগুলো দেখতে ভারি খারাপ আর এই কাঠের বাক্সটাও কী বিশ্রী!" এই বলে কে বাক্সটাতে লাথি মেরে, ফুলগুলোকে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল।

গের্দা ভারি দুঃখিত হয়ে বলল, "ও কি কে, ও কি করছ?" কে সেই দেখল তার ব্যবহারে গের্দার দুঃখ হচ্ছে, অমনি সে আরেকটা গোলাপ ফুল ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, এক লাফে নিজের ঘরের জানলা দিয়ে এত দিনের প্রিয় বন্ধু গের্দার কাছ থেকে পালিয়ে গেল।

তার পর থেকে গের্দা সেই ছবির বই বের করলেই কে বলত, "ছ্যাঃ, ওটা খোকা-খুকুদের বই!" গের্দার ঠাকুমা গল্প বললেই কে থেকে থেকেই বাধা দিত, বলত, "কিন্তু তাই বলে—হেনা তেনা।" মাঝে মাঝে আবার ঠাকুমার পিছনে দাঁড়িয়ে, তাঁর চশমা-জোড়া নাকে চড়িয়ে, ঠিক তাঁর মতো করে কথা বলত। এমনি মজা করে ঠাকুমার নকল করত যে সবাই তাই দেখে হেসে খুন! অল্পদিনের মধ্যে কে পাড়ার সবাইকে নকল করতে পারত। যার মধ্যে যা-কিছু অদ্ভুত কিম্বা আনাড়ি ছিল, কে তার হুবহু নকল করত। সবাই বলত, "ছেলেটার মাথা আছে বটে!" আসলে তা নয়। সেই যে আয়নার কুচিটা ওর চোখে পড়েছিল আর যেটা একেবারে ওর হৃদয়ে গিয়ে বিঁধেছিল, সেগুলোর জন্যেই বন্ধুরা মনে কষ্ট পেল কি না পেল, কে তার তোয়াক্কাই করত না। ঐ কাঁচের টুকরোর জন্যেই কে গের্দার পিছনেও লাগত।

একদিন কে এ-বাড়িতে এল, দুহাতে মোটা দস্তানা, পিঠে

স্লেজগাড়ি ঝোলানো। এসেই গের্দাকে ডেকে বলল, "আমি বড়ো পার্কে যাচ্ছি, অন্য ছেলেদের সঙ্গে স্লেজ চালাবার অনুমতি পেয়েছি।" বলেই দে দৌড়।

এখন, যে ছেলেদের বড়ো বেশি সাহস, তারা করত কি, যে-সব গাড়ি বোঝাই করে পাড়াগাঁর লোকরা শহরে জিনিসপত্র নিয়ে আসত, সেই গাড়িগুলোর সঙ্গে নিজেদের স্লেজ শক্ত করে বেঁধে দিত, তার পর গাড়ি ছাড়লে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও অনেক দূর অবধি চলে যেত। এতে তাদের ভারি মজা লাগত।

সেদিন তারা মনের আনন্দে খেলা করছে, এমন সময় মস্ত একটা সাদা রঙের স্লেজ পাশ দিয়ে চলে গেল। স্লেজে একজন মানুষ বসে ছিল, তার গায়ে কর্কশ সাদা লোমের পোশাক, মাথায় কর্কশ সাদা টুপি। স্লেজটা পার্কের চারদিকে দুটো পাক দেবার পর, কে তার সঙ্গে নিজের ছোটো স্লেজটি বেঁধে দিল। স্লেজটা তাকে টেনে নিয়ে চলল। ক্রমে স্লেজের বেগ বেড়ে গেল, শাঁ শাঁ করে ওরা পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। যে স্লেজ চালাচ্ছিল, সে তখন পিছন ফিরে কে-র দিকে মাথা নাড়ল, যেন কত কালের চেনা বন্ধু। যতবার কে তার ছোটো স্লেজটার দড়ি খুলতে যায়, অমনি লোকটা পিছন ফিরে মাথা নাড়ে, যেন ওকে থাকতে বলছে।

কাজেই কে চুপ করে বসে রইল। সাদা স্লেজটা ওকে টেনে নিয়ে শহরের বড়ো ফটক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। তার পর এমনি বরফ পড়তে লাগল যে নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। কিন্তু বড়ো স্লেজ চলেছে তো চলেছেই। তখন কে তাড়াতাড়ি দড়ি খুলে নিজের স্লেজ ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই পারল না। স্লেজের দড়ি কোনোমতেই খোলা গেল না; বাতাসের বেগে কে-র স্লেজ ছুটে চলল। শেষটা কে চীৎকার

করে উঠল ; কেউ শুনল না—বরফ পড়তে লাগল, শ্লেজও ছুটে চলল। মাঝে মাঝে শ্লেজটাতে খানিকটা ঝাঁকি লাগছিল, যেন ঝোপঝাড়েব উপব দিয়ে চলেছে।

কে-র ততক্ষণে বেজায় ভয় হয়েছে ; যদি ভগবানের নাম মনে থাকত তা হলে সে ভগবানেব নাম কবত, কিন্তু নামতা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ল না।

বরফের নরম কুচিগুলোও যেন ক্রমে বড়ো হতে হতে, শেষটা একেকটা মুরগির মতো মনে হতে লাগল। হঠাৎ বরফ সরে গেল, বড়ো শ্লেজটা থামল, যে চালাচ্ছিল সে উঠে পড়ল। তখন কে দেখল চালক একজন মহিলা ; লম্বা, ছিপ্‌ছিপে পাতলা, এত সাদা যে চোখ ঝলসে যায়। তাঁব পরনে পোশাক আর টুপি শুধু বরফ নিয়ে তৈরি। এই তো তুষার-রানী।

তিনি বললেন, "তাড়াতাড়ি চালাতে হল, শীতে জমে যেতে কারই-বা ভালো লাগে! এসো, আমাব ভালুকেব কম্বলের তলায় এসো।" এই বলে তাকে বড়ো শ্লেজে তুলে তাঁর পাশে বসিয়ে, কম্বল দিয়ে মুড়ে দিলেন। কে-ব মনে হল যেন এক গাদা নরম বরফের মধ্যে ডবে যাচ্ছে।

তুষার-রানী বললেন, "এখনো শীত করছে নাকি?" বলে ওর কপালে চুমো খেলেন। উঃ, তাব চুমো বরফের চেয়েও ঠাণ্ডা। সেই ঠাণ্ডা একেবারে কে-ব হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছল, এমনিতেই হৃদয়টা অধেক জমে ছিল। কে-র মনে হল এবার বোধ হয় সে মরেই যাবে। কিন্তু শীত করল শুধু এক মুহূর্তের জন্য, তার পরেই শরীরটা বেজায় ভালো মনে হল, চারদিকের ঐরকম ঠাণ্ডা আর বোঝাই গেল না।

সবার আগে নিজের ছোটো শ্লেজটির কথা মনে পড়ল! কে বলে উঠল, "আমার শ্লেজ! আমার শ্লেজের কথা ভুলো
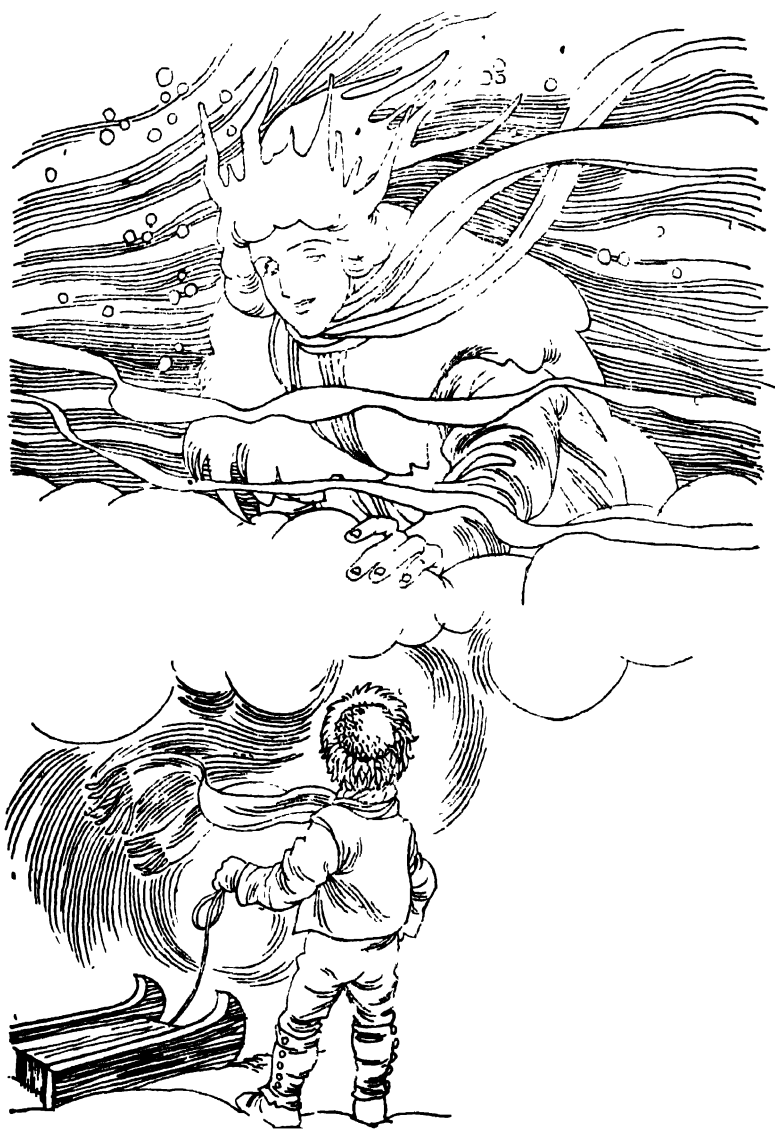
না।" দেখল শ্লেজটাকে একটা বরফের মুরগি পিঠে করে নিয়ে ওদের পিছন পিছন উড়ে চলেছে। তুষার-রানী কে-র কপালে আরেকটা চুমো খেলেন। অমনি কে গের্দার কথা, ঠাকুমার কথা, বাড়ির সকলের কথা ভুলে গেল।

তুষার-রানী বললেন, "নাঃ, আর চুমো নয়, তা হলে তুমি একেবারে মরেই যাবে।"

কে তাঁর দিকে তাকাল। কী ভালো দেখতে! কারও মুখে যে এত বুদ্ধি, এত রূপ থাকতে পারে কে ভাবতেই পারত না। সেই যেদিন তিনি জানলার বাইরে থেকে তাকে ডেকেছিলেন, সেদিন তাঁকে মনে হয়েছিল বরফের মতো ঠাণ্ডা, কঠিন, আজ আর সেরকম মনে হল না। কে-র চোখে তুষার-রানী নিখুঁত, কে-র মনে আর ভয়ের লেশ নেই। কে তাঁকে বলতে লাগল সে মুখে-মুখে কি ভালো অঙ্ক কষতে পারে, এমন-কি, ভগ্নাংশ অবধি। সে নাকি কোন দেশের মাপ কত বর্গমাইল, কোন শহরের কত বাসিন্দা, এই-সব জানে। তুষার-রানী যেই একটু হাসলেন, অমনি কে-র মনে হল এই বয়সে সে কতটুকুই-বা শিখেছে। চারদিকের খোলা আকাশের দিকে কে তাকিয়ে দেখল। অমনি তুষার-রানী তাকে নিয়ে অনেক উপরে কালো মেঘের মধ্যে উঠে পড়লেন। নীচে ঝড় বইতে লাগল, এখানে কে যেন শুনতে পেল কতকালের সব পুরনো গান।

এমনি করে বনের উপর দিয়ে, হ্রদের উপর দিয়ে, সমুদ্রের উপর দিয়ে, ডাঙার উপর দিয়ে, কেবলই তারা উড়ে চলল। নীচে শোঁ-শোঁ শব্দ করে হিম বাতাস বইতে লাগল, নেকড়ের দল চীৎকার করতে লাগল, বরফ ঝিক্‌মিক্ করে উঠল, কালো কাক মাঠের উপর দিয়ে উড়ে চলল আর ওদের মাথার ওপরে চাঁদটি কী উজ্জ্বল, কী শান্ত।

এই ভাবে কে সমস্ত শীতের রাতটি কাটাল তুষার-রানীর পায়ের কাছে ঘুমিয়ে দিন কাটাল।

জাদু-বাগান

এদিকে কে যখন বাড়ি ফিরল না, তখন গের্দার কি হল? কে গেল কোথায়? কেউ বলতে পারে না। ছেলেরা বলল, কে-কে দেখেছিল আরেকটা শ্লেজের সঙ্গে নিজের শ্লেজ বাঁধতে। সে শ্লেজটা মস্ত বড়ো আর দেখতেও চমৎকার। তার পর তারা পার্ক থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে শহরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। কোথায় গেল কেউ জানে না; তাই শুনে বাড়িতে মহা কান্নাকাটি পড়ে গেল। ছোটো মেয়ে গের্দাও অনেকক্ষণ ধরে খুব কাঁদল, কারণ ছেলেরা বলেছিল শহরের কাছ দিয়ে যে বড়ো নদীটা বয়ে যায়, কে নিশ্চয় তাতে ডুবে মরে গেছে। কে নেই, শীতের বিষণ্ণ দিনগুলো যেন কাটতেই চায় না। অবশেষে আবার নরম-গরম রোদ নিয়ে বসন্তকাল এল।

গের্দা তখন বলল, "হায়, হায়, কে নেই, সে মরে গেছে!" রোদ বলল, "এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না।" সোয়ালো পাখিদের গের্দা বলল, "কে নেই, সে মরে গেছে।" সোয়োলোরা বলল, "এ কথা আমরা বিশ্বাস করি না।" ক্রমে ক্রমে গের্দার নিজেরও বিশ্বাস হত না। একদিন সকালে গের্দা বলল, "আমার নতুন লাল জুতো-জোড়া পরব। কে ও-জুতো দেখে নি। তার পর নদীর ধারে গিয়ে কে-র খোঁজ করব।"

তখন সবে ভোর হয়েছে। ঠাকুমা তখনো ঘুমিয়ে ছিলেন; গের্দা তাঁকে চুমো খেয়ে, লাল জুতো পায়ে দিয়ে, শহরের ফটক দিয়ে বেরিয়ে নদীর দিকে চলল।

সেখানে গিয়ে নদীকে বলল, "এ কথা কি সত্যি যে তুমি আমার ছোটো খেলার সাথীটিকে নিয়েছ? তাকে যদি ফিরিয়ে দাও, তা হলে তোমাকে আমার লাল-জুতো জোড়া দেব।"

বলেই তার মনে হল নদীর ছোটো-ছোটো ঢেউগুলো যেন কেমন অস্বাভাবিক ভাবে ওরই দিকে এগিয়ে আসছে। গের্দা ভাবল তা হলে ওরা ওর কথায় রাজি আছে; কাজেই সে তখন নিজের পা থেকে তার লাল জুতো-জোড়া খুলে জলে ফেলে দিল! তার যা কিছু ছিল, তার মধ্যে সবচাইতে প্রিয় জিনিস ঐ

লাল জুতো-জোড়া। জুতো-জোড়া কিন্তু ঢেউয়ের মাথায় আবার ফিরে এল। বোধ হয় ওদের কাছে কে ছিল না তাই গের্দার সবচাইতে আদরের জিনিসটি ওরা নিতে চাইল না। কিন্তু গের্দা ভাবল জুতো-জোড়া আরেকটু দূরে ফেলা দরকার। নদীর ধারে নল-খাগড়ার বনে একটা ছোটো নৌকো ছিল। গের্দা তাতে চড়ল; তার পর একেবারে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে জুতো-জোড়াকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এদিকে নৌকোর দড়ি বাঁধা ছিল না। গের্দা তার উপর নড়াচড়া করাতে, নৌকোটা নলখাগড়ার বন থেকে পিছলিয়ে; তীর থেকে খানিকটা দূরে সরে গেল। তাই দেখে গের্দা তাড়াতাড়ি নৌকো থেকে নেমে পড়ার চেষ্টা করল। কিন্তু যতক্ষণে সে নৌকোর এ মাথায় পৌঁছল, ততক্ষণে নৌকোটা তীর থেকে দু হাতেরও বেশি দূরে সরে গেছিল। নৌকো থেকে গের্দা নামতে পারল না; নৌকো ভেসে চলল।

ছোটো মেয়ে গের্দা বেজায় ভয় পেয়ে কাঁদতে বসল। চড়াই পাখিরা ছাড়া কেউ সে কান্না শুনতে পেল না, কিন্তু তাদের তো আর ওকে পিঠে করে ডাঙায় পৌঁছে দেবার সাধ্য ছিল না। কাজেই তারা ওর নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে নদীর তীর ধরে উড়ে চলল আর ঠিক যেন ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলতে লাগল, "আমরা আছি, আমরা আছি।" নৌকোটা স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলল।

গের্দা মনে মনে বলল, 'কে জানে, নদীটা হয়তো আমাকে আমার বন্ধু কে-র কাছেই নিয়ে চলেছে।' এ কথা ভাবতেই তার মনটা ভালো হয়ে গেল, তখন চারদিকের সুন্দর দৃশ্যপট দেখে সে আনন্দে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিল! শেষে নৌকোটা একটা মস্ত চেরি বাগানের পাশ দিয়ে ভেসে চলল। বাগানের

মধ্যে কী সুন্দর এক কুটির, তার খড়ের চাল, আর অদ্ভুত লাল-নীল রঙের জানলা। দরজার কাছে দুটি কাঠ-সেপাই। তারা ছোটো নৌকোটিকে আসতে দেখে, বন্দুকে নামিয়ে নমস্কার জানাল।

গের্দা মনে করল ওরা বুঝি জ্যান্ত মানুষ, তাই ওদের ডাক দিল, কিন্তু কাঠ-পুতুল ডাকের জবাব দেবে কেন? স্রোতে ভেসে নৌকোটা ডাঙার ধারে এল, গের্দাও সেপাইদের কাছ থেকে দেখল।

ও তাদের আরো জোরে ডাক দিল। ডাক শুনে কুটিরের মধ্যে থেকে লাঠি ভর দিয়ে এক বুড়ি বেরিয়ে এল। তার মাথায় মস্ত এক টুপি, তাতে রঙ-বেরঙের চমৎকার সব ফুল আঁকা। বুড়ি বলল, "আহা বেচারি, বিরাট বিশাল নদী তোমাকে কত দূরে ভাসিয়ে এনেছে!" এই বলে একেবারে জলের মধ্যে নেমে, লাঠির হাতল দিয়ে বুড়ি নৌকোটাকে তীরের কাছে টেনে এনে, গের্দাকে নামিয়ে নিল।

আবার শুকনো ডাঙায় পা দিয়ে গের্দা কী খুশি, তবু অদ্ভুত চেহারার বুড়িকে দেখে একটু ভয়ও করছিল। বুড়ি বলল, "কাছে এসো বাছা, বল দিকিনি তুমি কে?"

গের্দা তাকে সব কথা বলল। শুনে বুড়ি মাথা নেড়ে বলল, "হ্ম্ম্! হ্ম্ম্!" তার পর যখন গের্দা জানতে চাইল বুড়ি কে-কে দেখেছে কি না, তখন বুড়ি বলল তখনো কে ওখানে পৌঁছয় নি বটে, তবে নিশ্চয় শিগ্‌গিরই একদিন আসবে। তাই বলে গের্দা যেন আবার মন খারাপ না করে। গের্দা বরং বুড়ির বাড়িতেই থাকুক, বাগান থেকে চেরি ফল খাক, বাগানের ফুলগুলি দেখুক। ফুলগুলি যে কোনো ছবির বইয়ের চেয়ে দেখতে সুন্দর আর প্রত্যেকটি ফুল গের্দাকে একটি করে গল্প বলতে পারে!

তার পর বুড়ি গের্দার হাতখানি ধরল। দুজনে কুটিরের ভিতর ঢুকে পড়ল, বুড়ি দরজাটি বন্ধ করে দিল। ঘরের জানলাগুলো বেজায় উঁচুতে, জানলার শার্শীগুলো নানান্ রঙের, লাল, নীল, হলদে। শার্শীর ভিতর দিয়ে ঘরের মধ্যে বাইরের ঝক্‌ঝকে আলো ঢুকলে ঘরময় সে যে কী বিচিত্র সুন্দর রঙ ধরে! ঘরের মাঝখানে একটা টেবিল, টেবিলের মাঝখানে একথালা চমৎকার চেরি ফল। বুড়ি গের্দাকে বলল, "যত খুশি চেরি খাও।" গের্দা বসে চেরি খেতে লাগল আর বুড়ি একটা সোনার চিরুনী দিয়ে তার চুল আঁচড়াতে লাগল। গের্দার কোমল মিষ্টি মুখখানির দু পাশে তার ঝক্‌ঝকে সোনালি কোঁকড়া চুলগুলো নেমে এল। মুখখানি দেখতে একটি গোলাপের মতো তাজা গোলগাল।

বুড়ি বলল, "বহুকাল থেকেই আমার এইরকম একটি মিষ্টি মেয়ের শখ। দেখাই যাক-না আমরা দুজন এক সঙ্গে মনের সুখে দিন কাটাতে পারি কি না।" বুড়ি যেমন গের্দার চুল আঁচড়াতে লাগল, গের্দাও কেমন যেন একটু একটু করে কে-র কথা ভুলে যেতে লাগল। ঐ বুড়ি ছিল মায়াবিনী জাদুকরী। তবে লোকের অনিষ্ট করবার জন্য সে কখনো জাদু করত না, নিজের আনন্দের জন্যেই করত। এখন তার বড়ো ইচ্ছা হল গের্দা ওর সঙ্গে থাকুক। তার বড়ো ভয় যে বাগানের গোলাপ-গাছগুলি দেখলে হয়তো গের্দার নিজেদের বাগানের গোলাপ-গাছ আর কে-র কথা মনে পড়ে যাবে। তা হলে গের্দা হয়তো পালিয়ে যাবে। যেই-না এই কথা মনে হওয়া, অমনি সে চুপি-চুপি বাগানে বেরিয়ে, হাতের লাঠিখানি গোলাপগাছের উপর তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি ফুলে পাতায় ভরা গাছগুলি সব কালো মাটির তলায় নেমে গেল।

তার পর বুড়ি গের্দাকে বাগানে নিয়ে গেল। কত দেশের, কত ঋতুর ফুল সেখানে ফুটে রয়েছে, কী তাদের সৌন্দর্য, কোনো ছবির বই তাদের ধারে কাছেও আসতে পারে না। আনন্দে লাফিয়ে উঠে, গের্দা ফুলগাছের চারধারে খেলে বেড়াতে লাগল, যতক্ষণ না লম্বা লম্বা চেরিগাছগুলোর পিছনে সূর্য ডুবে গেল! তার পর তার জন্য চমৎকার লাল রেশমী গদী দেওয়া বিছানা পাতা হল, গদীর মধ্যে তুলোর বদলে নীল ভায়োলেট ফুলের পাপড়ি পোরা। সেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে গের্দা মধুর গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল আর কি সব ভালো ভালো স্বপ্ন দেখল, বিয়ের রাতে রাজার রানীরা যেমন দেখে।

পরদিন আবার গের্দা মিষ্টি রোদে, ফুলগাছের মধ্যে খেলে বেড়ালো। তার পর আরো অনেকদিন ঐভাবে কাটল। বাগানের প্রত্যেকটি ফুলের সঙ্গে তার চেনা হয়ে গেল। কিন্তু তার কেবলই মনে হত, এত ফুল এখানে, তবু যেন একটা কিসের অভাব থেকে যাচ্ছে, অথচ সে জিনিসটা যে কী, সেটা আর মনে পড়ত না। একদিন গের্দা বসে বসে বুড়ির টুপি দেখছে, তাতে কতরকম ফুল আঁকা আর সবচাইতে সুন্দর যে ফুল সেটি হল একটি গোলাপ। বুড়ি তার বাগানের সত্যিকার গোলাপগুলোকে মাটির নীচে ফেলেছিল বটে, কিন্তু টুপির এই আঁকা গোলাপের কথা ভুলেই গেছিল।

গের্দা চমকে উঠল, 'সে কি! এমন বাগান, কিন্তু তাতে গোলাপ নেই!' গোলাপের খোঁজে সে বাগানের এ ধার থেকে ও ধার ছুটে বেড়াতে লাগল, কিন্তু একটিও গোলাপ দেখতে পেল না। তখন সে বসে কাঁদতে লাগল আর হবি তো হ, গের্দার চোখের জল এমন জায়গায় পড়ল, যেখানে আগে একটা গোলাপগাছ ছিল। যেই-না গের্দার তপ্ত চোখের জলে মাটি

ভিজল, অমনি সেই গোলাপগাছটিও আগের মতোই ডালে ভরা ফুল নিয়ে, মাটির ওপরে উঠে এল। গের্দা তাকে জড়িয়ে ধরে ফুলগুলিতে চুমো খেতে লাগল। অমনি তার নিজেদের বাড়ির সুন্দর গোলাপগুলির কথা আর কে-র কথা মনে পড়ে গেল।

গের্দা বলে উঠল, "কি বলে আমি এখানে এত দিন বসে রইলাম! আমি তো কে-কে খুঁজতে বাড়ি ছেড়েছিলাম। তোমরা জান সে কোথায়? সে কি মরে গেছে?"

গোলাপরা বলল, "না, না, সে মরে নি। আমরা তো মাটির নীচে পাতাল রাজ্যে ছিলাম, মরা লোকরা সেখানে যায়, কিন্তু কে তো সেখানে নেই।"

গের্দা বলল, "তোমাদের ধন্যবাদ দিই।" তার পর অন্য ফুলদের জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা জান আমার ছোটো বন্ধু কে কোথায়?" কিন্তু ফুলরা সবাই রোদে দাঁড়িয়ে যে যার নিজের গল্পে বিভোর। সে-সব গল্প তারা গের্দাকে বলল, কিন্তু কে-র কথা কেউ বলতে পারল না। শেষে গের্দা বাগানের সীমানার কাছে ছুটে গেল। বাগানের ফটক বন্ধ ছিল, কিন্তু মরচে ধরা তালায় একটু চাপ দিতেই সেটা ভেঙে গেল। ফটক হাট হয়ে খুলে গেল, অমনি ছোটো গের্দা খালি পায়ে, বিশাল পৃথিবীর মাঝখানে বেরিয়ে পড়ল। তিন তিনবার গের্দা ফিরে তাকাল, পিছনে কাউকে দেখতে পেল না। তার পর ছুটতে ছুটতে যখন আর পারে না, তখন বিশ্রাম করবার জন্য একটা মস্ত পাথরের উপর সে বসে পড়ল। চারদিকে তাকিয়ে দেখে কবে গ্রীষ্মকাল কেটে গেছে, হেমন্ত শেষ হল বলে। জাদু-বাগানে সারা বছর রোদ হয়, ফুল ফোটে, কাজেই এ বিষয়ে তার খেয়ালই ছিল না।

ছোটো গের্দা মনে মনে বলল, 'কতকাল ঐ বাগানে ছিলাম!

এর মধ্যে হেমন্তকাল এসে গেল। তা হলে আর তো সময় নষ্ট করা যায় না!' এই বলে উঠে পড়ে আবার সে পথ ধরল।

পা দুটোতে কত ক্লান্তি, কত ব্যথা! চারদিকে কী শীত, গাছ সব ন্যাড়া। উইলোগাছের লম্বা পাতা হলুদ হয়ে গেছে, তাদের গা বেয়ে জলের মতো শিশির গড়াচ্ছে। একটি একটি করে গাছ থেকে পাতা ঝরে যাচ্ছে। খালি স্লোগাছে ফল ধরেছে, কিন্তু সে ফল কি ঝাঁঝালো, কি তেতো! সে দিন গের্দার চোখে সমস্ত পৃথিবীটাকেই মনে হল ঠাণ্ডা, বিবর্ণ দুঃখে ভরা।

রাজপুত্র আর রাজকন্যা

গের্দাকে বাধ্য হয়ে আবার বসে বিশ্রাম করতে হল। হঠাৎ তার সামনে বরফের উপর একটা মস্ত দাঁড়কাক লাফিয়ে নেমে বলল, "ক্ক! ক্ক! নমস্কার! নমস্কার!" তার পর সামনের একটা গাছের শুকনো ডালে বসে, ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে লাগল। তার পর আরো কাছে এসে আলাপ জমাল, গের্দা একা কোথায় চলেছে জানতে চাইল। তখন গের্দা ওকে নিজের জীবনের সব কথা বলে, শেষে জিজ্ঞাসা করল ও কে-কে দেখেছে কি না।

দাঁড়কাক যেন খানিকটা দোমনা করে মাথা নেড়ে বলল, "তা দেখে থাকতে পারি।"

গের্দা বলল, "সত্যি নাকি?" বলে তাকে এমনি জোরে চুমো খেয়ে ফেলল যে কাকের মহা ভাগ্যি যে চিপে মরে যায় নি!

দাঁড়কাক বলল, "আরেকটু সামাল দিয়ে, ভাই।

হচ্ছে যেন তার কথা জানি। হতে পারে সে-ই তোমার কে, কিন্তু সে যে তোমাকে ছেড়ে রাজকুমারীর কাছে চলে গেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।”

গের্দা বলল, “সে কি কোনো রাজকুমারীর বাড়িতে থাকে নাকি?” দাঁড়কাক বলল, “শোন তবে, কিন্তু তোমাদের ভাষায় কথা বলাই মুস্কিল! তুমি কি কেগো ভাষা জান? আহা, তা যদি জানতে তো আরো কত ভালো করে বলতে পারতাম।” গের্দা বলল, “না, ভাই, কেগো ভাষা তো কখনো শিখি নি। তবে আমার ঠাকুমা জানতেন। আমিও যদি শিখতাম কি ভালোই-না হত!”

দাঁড়কাক বলল, “আহা, যেতে দাও; যতটা ভালো করে পারি, তাই বলছি।” তার পর সে যেটুকু জানে তার সবই গের্দাকে বলল। দাঁড়কাক বলল—

“আমরা দুজনে এখন যে-দেশে বসে আছি, সেখানে অসাধারণ বুদ্ধিমতী এক রাজকুমারী থাকেন। সিংহাসনে চড়েই, তিনি এক নতুন গান গাইতে শুরু করলেন। সেই গানের ধুয়োটা হল, ‘কেন বিয়ে করব না?’ রাজকুমারী বললেন, ‘সে তো ভারি বুদ্ধির কথা।’ তার পর তিনি ঠিক করলেন যে বিয়ে তিনি করবেন, কিন্তু যাকে বিয়ে করবেন তার শুধু দেখতে শুনতে চমৎকার হলেই চলবে না; তার সঙ্গে কেউ কথা বললে, বুদ্ধি করে উত্তর দিতে পারা চাই, আর শুধু ঐ ভালো দেখতে হওয়া ছাড়া আরো কাজ করতে পারা চাই।”

তার পর দাঁড়কাক আরো বলল, “বিশ্বাস কর, যা যা বলছি তার প্রতিটি কথা সত্যি; আমার এক পোষা বন্ধু আছে, সে রাজবাড়িতে ইচ্ছামতো নেচে বেড়ায়, এ-সব কথা সে-ই আমাকে বলেছে।

রাজকুমারী মন ঠিক করতেই চারদিকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হল, ধারে ধারে হরতনের নক্‌শা-কাটা কাগজে নোটিস জারি হল যেখানে যত দেখতে ভালো যুবক আছে, ইচ্ছে হলে তারা সবাই রাজবাড়িতে যেতে পারে। সেখানে গিয়ে রাজকুমারীর সঙ্গে আলাপ করে, যে প্রমাণ করতে পারবে সে রাজবাড়িতে তাকে মানায় ভালো, রাজকুমারী তারই গলায় মালা দেবেন।

"তাই শুনে সবাই ভিড় করে রাজবাড়িতে চলল, কিন্তু গিয়ে কোনো লাভ হল না। রাজবাড়ির দোরের বাইরে যে-সব যুবক চৌকস করে কথাবার্তা বলতে পারত, একবার ভিতরে ঢুকে, রুপোলি পোশাক পরা রাজরক্ষীদের আর সিঁড়ির ওপর সোনালি পোশাক পরা নফরদের আর আলোর মালায় সাজানো ঐ বিশাল সভাঘর দেখেই, একেবারে হকচকিয়ে যেত। রাজকুমারী সিংহাসনে বসে থাকতেন, তারা গিয়ে তাঁর সুমুখে দাঁড়াত। তার পর তিনি তাদের সঙ্গে কথা বললে, উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, তারা শুধু প্রতিধ্বনির মতো তাঁর মুখের শেষ কথাগুলো আরেকবার করে বলত! অদ্ভুত ব্যাপার! রাজবাড়িতে ঢুকলেই যেন সব বোবা বনে যেত; অথচ রাজবাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেই, আবার তাদের মুখে খই ফুটত! সে এক দেখবার জিনিস; সারাদিন শহরের ফটক থেকে রাজবাড়ির ফটক অবধি দস্তুরমতো এক মিছিল চলত!"

গের্দা ব্যস্ত হয়ে উঠল, "কিন্তু কে, আমার বন্ধু কে কখন এল? সে-ও কি ঐ মিছিলের মধ্যে ছিল নাকি?" "আহা, একটু সবুর কর, এই তো কে-র কাছে এলাম বলে। তৃতীয় দিনে এক যুবক এসে হাজির হল, তার না ছিল ঘোড়া, না ছিল গাড়ি! ফুর্তির সঙ্গে সে জোর কদমে রাজবাড়ির দিকে

চলল। তার চোখ দুটো তোমার চোখের মতোই উজ্জ্বল; তার সুন্দর লম্বা চুল, কিন্তু কাপড়-চোপড় গরিবের মতো।”

গের্দা বলে উঠল, “ও-ই নিশ্চয় কে! তা হলে কে-কে সত্যি খুঁজে পেলাম!” এই বলে সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল!

দাঁড়কাক বলল, “তার পিঠে একটা বোঁচকা ছিল।”

গের্দা বলল, “না, না বোঁচকা নয়, স্লেজগাড়ি, বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় ওর সঙ্গে স্লেজ ছিল।”

দাঁড়কাক বলল, “তা হতে পারে, আমি খুব ভালো করে দেখি নি। তবে আমার প্রিয় বন্ধুর কাছে শুনেছি যে রাজবাড়ির সিং-দরজা দিয়ে ঢুকে, রুপোলি পোশাক পরা রাজরক্ষীদের আর সিঁড়ির উপর সোনালি পোশাক পরা নফরদের দেখে সে এতটুকু ঘাবড়াল না। হেসে, মাথা নেড়ে তাদের সে বলল, ‘সারা দিনমান ওখানে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় তোমাদের বিরক্তি ধরে যায়, আমি বরং ভিতরে যাই।’ ভিতরে সভাঘরে চোখ ঝলসানো আলো, উচ্চপদস্থ হোমরা-চোমরা মন্ত্রী সভাসদরা খালি পায়ে, হাতে বড়ো-বড়ো সোনার চাবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন জায়গায় যে যায়, তারই কথা বন্ধ, মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, তার উপর সেই ছোকরার পায়ের বুট-জোড়া থেকে বেজায় জোরে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ বেরুচ্ছিল, তবু সে এতটুকু ভয় পেল না।”

গের্দা বলল, “ও-ই নিশ্চয় কে। ওর পায়ে নতুন বুট ছিল। আমার ঠাকুমার ঘরে বুট-জোড়া থেকে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ বেরুতে শুনেছি।”

দাঁড়কাক বলল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, জুতো থেকে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ বেরুচ্ছে আর সে ছোকরা হাসতে হাসতে রাজকুমারীর সামনে গিয়ে হাজির! রাজকুমারী একটা চরখার মতো বড়ো মুক্তোর উপরে বসেছিলেন আর সভার সব সম্ভ্রান্ত মহিলারা, সখীরা,

খাসদাসীরা একের পর এক, এক ধারে দাঁড়িয়ে, আর সভাসদরা আর তাঁদের সাকরেদরা আর তাদের খাস-খানসামারা আর খাস-খানসামাদের দাসরা সব অন্য ধারে দাঁড়িয়ে। যারা দরজার যত কাছে, তাদের তত বেশি দেমাক!

"আমি কেগো ভাষায় যেমন খাসা কথা বলি, ঐ ছোকরাও তেমনি খাসা কথা বলতে লাগল। দেখতেও যেমনি ভালো, ফুর্তিবাজও তেমনি। সে খোলাখুলি বলল যে সে বিয়ের চেষ্টায় আসে নি, এসেছে রাজকুমারীর কাছে জ্ঞানের কথা শুনতে। ওর-ও রাজকুমারীকে যেমনি পছন্দ, রাজকুমারীরও ওকে তেমনি পছন্দ।" গের্দা আবার বলল, "হ্যাঁ, ও-ই তবে কে। ওর বেজায় বুদ্ধি, মুখে মুখে অঙ্ক কষে, ভগ্নাংশ পর্যন্ত! আমাকে ঐ রাজবাড়িতে নিয়ে যাবে?"

দাঁড়কাক বলল, "ও কথা বলা তো সহজ, কিন্তু করব কি করে? দেখি আমার পোষা পেয়ারের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে। কি করতে হবে না হবে, সে-ই বলে দেবে। তোমাকে বলেই রাখি যে তোমার মতো একটা ছোট্টো মেয়ের পক্ষে সোজাসুজি রাজবাড়িতে ঢুকবার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব।"

গের্দা বলল, "না, না, নিশ্চয় অনুমতি পাব। কে যেই শুনবে আমি এখানে এসেছি, সে নিজে এসে আমাকে নিয়ে যাবে।"

দাঁড়কাক বলল, "তা হলে বেড়ার কাছে অপেক্ষা কর।" এই বলে সে উড়ে চলে গেল।

যখন সে ফিরল তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। এসেই বলল, "ক্ক! ক্ক! আমার পেয়ারের বন্ধু তোমাকে নমস্কার জানিয়েছে আর রাজবাড়ির পাকঘর থেকে এই রুটিটা তোমার জন্য পাঠিয়েছে। পাকঘরে মেলা রুটি, কেউ টেরও পাবে না।

তোমার নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। তোমার পায়ে ভাই, জুতো নেই, রুপোলি পোশাক পরা রাজরক্ষীরা আর সোনালি পোশাক পরা নফররা কখনোই তোমাকে ভিতরে ঢুকতে দিত না। তাই বলে কেঁদ না, ভাই, তুমি ভিতরে যেতে পারবে। আমার পেয়ারের বন্ধু রাজবাড়ির পিছন দিকের একটা সরু সিঁড়ির কথা জানে, তার চাবি কোথায় থাকে তাও জানে।"

তার পর দুজনে বাগানে ঢুকে, চমৎকার বীথিকার মধ্যে দিয়ে চলল। তার পর যখন একে একে রাজবাড়ির সব আলো নিবে গেল, তখন দাঁড়কাক তাকে একটা আধখোলা খিড়কি দোরের কাছে নিয়ে গেল। ভয়ে, দুরাশায় গের্দার বুক টিপ্‌টিপ্‌ করছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি কোনো অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছে, অথচ যাচ্ছে শুধু কে সেখানে আছে কি না জানতে। শুধু একবার দেখবে গের্দা ওদের গোলাপগাছের নীচে কে-র মুখে যে হাসিটি লেগে থাকত, এখনো সেই হাসিটি আছে কি না। ওকে দেখে কে নিশ্চয় খুশি হবে; কে-কে দেখতে সে কত দূর থেকে এসেছে, বাড়ির সকলে কে-র জন্য কত দুঃখ করে, এ-সব কথা শুনতে ওর নিশ্চয় ভালো লাগবে। ভয়ে আর আনন্দে গের্দার বুক দুরু-দুরু করতে লাগল।

সিঁড়ি বেয়ে তো ওরা উপরে উঠল। একটা তাকে একটি ছোটো বাতি, তাতে মিট্‌মিটে একটু আলো হচ্ছে। দাঁড়কাকের বন্ধু সেই পোষা দাঁড়কাকটা মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রথমে একবার চারদিকে দেখে নিয়ে সে গের্দার দিকে তাকাল। গের্দা মাথা নিচু করে নমস্কার করল, ঠিক ঠাকুমা যেমন শিখিয়েছিলেন।

পোষা দাঁড়কাক বলল, "আমার ভাবী বরের কাছে তোমার কথা সবই শুনেছি; তুমি বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার ঐ-সব

অভিজ্ঞতার কথাগুলোও বড়ো ভালো। তুমি যদি আলোটা তুলে ধর, তা হলে আমি পথ দেখাই। আমাদের সোজা এগিয়ে যেতে হবে ; এ সময়ে আর কারও সঙ্গে দেখা হবে না।"

তার পর তারা প্রথম বৈঠকখানায় ঢুকল ; সোনালি ফুলের কাজ করা গোলাপি মখমলের পরদা দিয়ে সে ঘরের দেয়ালগুলো ঢাকা। ওদের পাশ দিয়ে খস্-খস্ করে স্বপ্নরা সব চলে গেল, কিন্তু এমন তাড়াতাড়ি যে গের্দা কিছু দেখতেই পেল না।

একটার পর একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে চলল ওরা, তার কি জাঁকজমক, যেন পরস্পারের সঙ্গে রেষারেষি করছে, কার বেশি বাহার! শেষপর্যন্ত তারা শয়ন-মন্দিরে পৌঁছল। সে ঘরের মাঝখানে মস্ত একটা সোনার থাম, দেখতে যেন প্রকাণ্ড তাল-গাছের গুঁড়ি। তালগাছের পাতাগুলি খুব দামী কাঁচের। এমনভাবে সেগুলি ছড়িয়ে আছে যে তাই দিয়েই ঘরের ছাদটি তৈরি হয়েছে। দরজার কাছেই, সেই গাছের উপর থেকে মোটা মোটা সোনার বোঁটায় ঝুলে আছে দুটি খাট, যেন দুটি পদ্ম ফুল।

একটি খাট সাদা, তাতে রাজকুমারী শুয়ে। অন্য খাটটি লাল, সেই খাটেই গের্দা তার খেলার সাথী কে-কে খুঁজল। একটা লাল পাতা সরিয়ে দিয়ে, একজনের পাটকিলে রঙের ঘাড়-গলা দেখতে পেল। এই নিশ্চয় কে! গের্দা তখন জোরে জোরে কে-র নাম ধরে ডাক দিল আর বাতিটাকে কাছে এনে তুলে ধরল। স্বপ্নরা ঝড়ের মতো উড়ে গেল, মানুষটি জেগে, মুখ ফেরাল, হায়! সে তো কে নয়!

সাদা পদ্মের পাপড়ির মাঝখান থেকে রাজকুমারী তাকালেন, কি হয়েছে জানতে চাইলেন। তখন গের্দা কেঁদে ফেলে, তাঁকে সব কথা বলল। দাঁড়কাকরা তার জন্য কি না করেছে, তাও

বলল। রাজকুমার, রাজকুমারী দুজনেই বলে উঠলেন, "আহা, বেচারি!" দাঁড়কাকদের তাঁরা যথেষ্ট প্রশংসা করলেন। বললেন তাদের উপর তাঁরা একটু রাগ করেন নি। তবে ভবিষ্যতে রাজবাড়িতে যেন কখনো এইরকম বাড়াবাড়ি না করা হয়। এবার অবিশ্যি তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজকুমারী দাঁড়কাকদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি ছাড়া পেয়ে বনে উড়ে চলে যেতে চাও? নাকি সভাকাকের পদে বহাল হতে চাও; তা হলে পাকঘরের সুখ-সুবিধাগুলি পাবে, যেমন এঁটো-কাঁটা, রুটির ছিল্‌কে।"

দুই দাঁড়কাক মাথা নিচু করে প্রণাম জানিয়ে বলল তাদের সভাকাকের পদটাই বেশি পছন্দ, কারণ বুড়ো বয়সের কথা ভাবতে হয়। শেষ বয়সের একটা সংস্থান থাকলে মনেও অনেক আরাম পাওয়া যায়। তার পর রাজকুমার উঠে পড়ে গের্দাকে তাঁর নিজের বিছানাটি ছেড়ে দিলেন।

পরদিন গের্দাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত রেশম মখমলে মুড়ে দেওয়া হল। তাকে বলা হল রাজবাড়িতে থেকে সেখানকার সুখ-আহ্লাদ উপভোগ করতে। কিন্তু গের্দা জানাল ও-সব সে চায় না, সে চায় শুধু ছোটো একটা গাড়ি, একটা ঘোড়া, এক জোড়া জুতো। সমস্ত পৃথিবী ঢুঁড়ে কে-কে খুঁজে বের করা ছাড়া তার আর কিছু চাইবার নেই।

ওঁরা ওকে জুতো দিলেন, তার উপর হাত গরম রাখবার জন্য লোমের ঢাকনি দিলেন। তার পর যেই সে যাবার জন্য তৈরি হল, অমনি দরজার কাছে এসে দাঁড়াল খাঁটি সোনার তৈরি নতুন একটি গাড়ি, তার দরজার উপর তারার মতো জ্বল্‌জ্বল্ করছে রাজবাড়ির চিহ্ন। সঙ্গে রইল মাথায় সোনার মুকুট পরে কোচোয়ান, সহিস আর পাহারাদার।

রাজকুমার রাজকুমারী নিজেরা এসে হাত ধরে ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বললেন, "তোমার যাত্রা সফল হোক।" ততক্ষণে দাঁড়কাকের বিয়ে হয়ে গেছে, সে ওদের মাইল তিনেক এগিয়ে দিল। গাড়িতে অনেক মোরব্বা, ফল, বাদাম, মিষ্টি ছিল।

রাজকুমার রাজকুমারী বললেন, "বিদায়! বিদায়!" ছোটো গের্দা কেঁদে আকুল হল, তার দুঃখ দেখে দাঁড়কাকটাও খুব খানিকটা কেঁদে নিল। তার পর উড়ে গিয়ে সে একটা গাছের ডালে বসল। যতক্ষণ গাড়িটাকে দেখা গেল, তার ডানা ঝাপটানি থামল না।

ডাকাত-বাড়ির ছোটো মেয়ে

ঘন অন্ধকার বনের মধ্যে দিয়ে ওরা চলল, সোনার গাড়ি মশালের মতো জ্বলতে লাগল। দুঃখের বিষয়, তাতে একদল ডাকাতের নজর পড়ল। তারা ঐ ঘন বনের ছায়ার আড়ালে বাস করত।

তারা রে-রে-রে-রে করে বেরিয়ে এল, "আরে এ যে সোনা! সোনা যে রে!" দেখতে দেখতে ঘোড়া ধরে, কোচোয়ান সহিস পাহারাদারদের ছোরা মেরে গাড়ির ভিতর থেকে তারা গের্দাকে টেনে বের করল।

বুড়ি ডাকাত-গিন্নীর থুতনিতে লম্বা লম্বা খোঁচা দাড়ি, ভুরু দুটো ঝোপের মতো চোখের উপর ঝুলে পড়েছে! বুড়ি বলল, "বাঃ, বাঃ, ক্যায়সা পুরুষ্টু, ক্যায়সা সোঁদর, দেখা যায় যেন বাদাম খেয়ে খেয়ে বড়ো হয়েছে! ক্যায়সা নধর কচি পাঁঠাটির মতো, কেমনে সেজেছে!" এই বলে বুড়ি তার লিকৃলিকে চকৃচকে ছোরাখানি বের করল; ছোরা থেকে বিকটভাবে আলো ঠিকরোতে লাগল।

কিন্তু যেই-না গের্দার বুকে বসাবার জন্য বুড়ি ছোরা তুলেছে, অমনি তার নিজের গোঁয়ার-গোবিন্দ দুর্দান্ত মেয়ে এক লাফে তার পিঠে চড়ে, দিয়েছে কষে কান কামড়ে! বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, "উ-হু-হু! কি দস্যি মেয়ে রে বাবা!"

ডাকাত-বাড়ির ছোটো মেয়ে বলল, "ও আমার সঙ্গে খেলা করবে। ও আমাকে ওর লোমের হাতঢাকা আর সুন্দর জামা দেবে। ও আমার খাটে আমার সঙ্গে শোবে!" এই বলে মার কানে আরেকবার এমনি কামড় দিল যে বুড়ি ব্যাথার চোটে চেঁচিয়ে মেঁচিয়ে লাফাতে লাগল। ডাকাতের দল তাই দেখে হো-হো করে হাসতে লাগল। তারা বলল, "দেখ, দেখ, গিন্নী কেমন বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে!"

ডাকাত-বাড়ির ছোটো মেয়েটা এমনি আহ্লাদে আব্দারে ছিল যে সে যখন যা বলত, সবাইকে তাই করতে হত। এবার সে গের্দাকে নিয়ে গাড়িতে চেপে বসল আর গাড়িটা আরো ঘন বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ডাকাত-বাড়ির মেয়ে মাথায় হয়তো গের্দারই সমান ছিল, কিন্তু তার চাইতে অনেক বেশি গায়ে জোর। এই চওড়া কাঁধ, কালো রঙ। চোখ দুটো কুচ্‌কুচে কালো আর কেমন যেন একটা বিষণ্ণ ভাব। গের্দার কোমর জড়িয়ে ধরে সেই মেয়ে বলল, "আমি যতদিন তোমাকে ভালোবাসব, মা তোমাকে মারতে পারবে না। তুমি বুঝি রাজার মেয়ে?"

গের্দা বলল, "না তো।" তার পর সে ডাকাত-বাড়ির মেয়েটাকে সব কথা খুলে বলল, সে যে কে-কে কত ভালোবাসে তাও বলল।

ডাকাত-বাড়ির মেয়ে মনোযোগ দিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল, তার পর মাথা নেড়ে বলল, "তোমার সঙ্গে যদি আমার ঝগড়াও হয়, তবু মা তোমাকে মারতে পারবে না! বরং আমি

নিজেই তোমাকে মেরে ফেলব!" তার পর মেয়েটা গের্দার চোখের জল মুছিয়ে, নরম গরম হাতঢাকাটির মধ্যে ওর ছুটি হাত পুরে দিল।

শেষটা ডাকাত-বাড়ির উঠোনের মধ্যিখানে পৌঁছে গাড়ি থামল। বাড়িটা হল একটা ভাঙাচোরা প্রাসাদ। দেয়ালের ফাঁকা ফোঁকর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে কাক, দাঁড়কাক বেরিয়ে এল। কতগুলো প্রকাণ্ড বড়ো ডালকুত্তা গাড়িটার চারদিকে লাফালাফি করতে লাগল। দেখে মনে হল নিমেষের মধ্যে ওরা একটা মানুষকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে পারে! কিন্তু কুকুরগুলো একবারও ডাকল না; ওদের ডাকতে মানা।

ওরা দুজনে মস্ত একটা ধোঁয়ায় ভরা ঘরে ঢুকল, সেখানে পাথরের মেঝের উপর বিশাল এক উনুন জ্বলছিল। উনুনে প্রকাণ্ড এক হাঁড়িতে সুরুয়া টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছিল আর শিকের উপর নানারকম খরগোস সেঁকা হচ্ছিল।

ডাকাত-বাড়ির মেয়ে বলল, "ভাই, আজ রাতে তুমি আমার আর আমার পোষা জানোয়ারদের সঙ্গে ঘুমোবে।" তার পর খাওয়া-দাওয়া সেরে, ওরা ঘরের কোণায়, খড়ের গাদার ওপর গালচে পাতা বিছানায় শুতে গেল। ওদের চারদিকের কড়ি বরগার উপর শতখানেক পায়রা বসেছিল। দেখে মনে হল বুঝি ঘুমোচ্ছে, কিন্তু ডাকাত-মেয়ে কাছে যেতেই তারা চমকে নড়েচড়ে উঠল।

গের্দার সঙ্গিনী হাতের কাছের একটা পায়রার ঠ্যাং ধরে, সেটাকে দোলাতে লাগল। তার পর পাখিটাকে গের্দার মুখের কাছে ঠেলে ধরে বলল, "ওকে চুমো খাও দিকিনি।" এই বলে মেয়েটা একটা ঘুলঘুলি দেখাল, ঘুলঘুলির মুখে আড়াআড়ি চেরাকাঠ বেঁধে বন্ধ করা। ডাকাত-মেয়ে বলল, "ঐ দেখ বুনো

পায়রার ঝাঁক। ওদের বন্ধ করে না রাখলে, পালিয়ে যাবে! আর এই দেখ কাকে আমি সব চাইতে ভালোবাসি।" শিং ধরে মেয়েটা একটা বল্‌গা-হরিণকে কাছে টেনে আনল। তার গলায় একটা চক্‌চকে তামার হাঁসুলী, তাই দিয়ে, হরিণটা মস্ত একটা পাথরের সঙ্গে বাঁধা। "কি করি, ওকে বেঁধে রাখতেই হয়, নইলে ও-ও পালিয়ে যাবে। রোজ সন্ধ্যায় আমার ধারালো ছোরাটা দিয়ে ওর গলায় সুড়সুড়ি দিই, তাই আমাকে বেজায় ভয় পায়!" তার পর দেয়ালের ফোঁকর থেকে লম্বা একটা ছোরা বের করে, তাই দিয়ে হরিণটার গলায় সুড়সুড়ি দিল। বেচারা হরিণ লাথি মেরে, পা ছুঁড়ে আপত্তি জানাতে লাগল, মেয়েটা হেসে গের্দাকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

ভয়ে ভয়ে সাংঘাতিক ছোরাটার দিকে তাকিয়ে গের্দা বলল, "ওটাকে হাতে নিয়েই ঘুমোবে নাকি, ভাই?" ডাকাত-বাড়ির মেয়ে বলল, "আমি সর্বদাই ছোরা পাশে নিয়ে ঘুমোই। বলা যায় না কখন কি হয়। সে যাই হোক গে, এখন আমাকে তোমার বন্ধু কে-র কথা আর কেন তুমি এইরকম একা একা বিশাল পৃথিবীতে বেরিয়ে পড়েছ সে-সব কথা আরেকবার বল দিকিনি।"

গের্দা তখন আরেকবার তাকে সব কথা শোনাল। মাথার উপর থেকে বুনো পায়রারাও সে কথা শুনল। অন্যরা সবাই ঘুমিয়ে রইল। ডাকাত-বাড়ির ছোটো মেয়েটা এক হাতে গের্দার গলা জড়িয়ে ধরে, অন্য হাতে ছোরা ধরে, ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু গের্দার চোখে সারা রাত ঘুম নেই। সে ভেবেই পেল না এর পর তার কি হবে, এমন-কি, প্রাণে বাঁচবে কি না তাই-বা কে জানে! ওদিকে ডাকাতরা আগুনের চারদিকে বসে মদ খেতে আর গান গাইতে লাগল। বেচারি ছোটো গের্দার পক্ষে সে যে কী ভয়ংকর

রাত গেল সে আর কী বলব! হঠাৎ বুনো পায়রারা কথা বলল, "বকুম্ বকুম্ বকুম্, আমরা কিন্তু ছোটো কে-কে দেখেছি। একটা সাদা মুরগী ওর শ্লেজ বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আর ও নিজে তুষার-রানীর রথে চড়ে তাঁর সঙ্গে বনের মধ্যে দিয়ে চলে গেল। আমরা বাসায় বসে সব দেখেছিলাম। যাবার সময় তুষার-রানী আমাদের গায়ে বরফের ফুঁ দিয়ে গেলেন। আমরা তুজন ছাড়া সে ফুঁ লেগে আর সব বাচ্চারা মরে গেল! বকুম্ বকুম্ বকুম্।"

গের্দা বলল, "ও কী বলছ তোমরা? তুষার-রানী কোথায় যাচ্ছিলেন? সে বিষয়ে কিছু জান নাকি?"

"যাচ্ছিলেন সম্ভবত ল্যাপ-দেশে, সেখানে বারো মাস বরফ আর তুষার থাকে। ঐ দড়ি বাঁধা বল্গা-হরিণকেই জিজ্ঞাসা কর-না।"

বল্গা-হরিণ বলল, "সে যে কী চমৎকার দেশ! সারা বছর সেখানে বরফ আর তুষার! ওখানকার বিশাল ঝক্‌ঝকে সব উপত্যকায় কেমন স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানো যায়। ওখানে তুষার-রানীর গ্রীষ্মাবাস।' উত্তর মেরুর কাছে, স্পিট্‌স্‌বের্গেন বলে একটা দ্বীপ আছে, সেখানে তাঁর মস্ত মজবুত তুর্গ আছে।"

গের্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "হায় কে, হায় রে আমার আদরের কে!"

সকাল হলে ডাকাতদের ছোটো মেয়েকে গের্দা পায়রাদের কাছে শোনা সব কথা বলল। শুনে মেয়েটার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তার পর মাথা নেড়ে, বল্গা-হরিণকে সে বলল, "ল্যাপ-দেশ কোথায় জান?"

হরিণের চোখ তুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "আমি ছাড়া আর কেই-বা জানবে বল? ঐখানে আমি জন্মেছিলাম, বড়ো

হয়েছিলাম। কত সময় ওখানকার বুনো খোলা উপত্যকায় প্রাণপণে দৌড়েছি!”

ডাকাত-বাড়ির মেয়ে তখন গের্দাকে বলল, “শোন, ভাই। দেখতেই পাচ্ছ আমাদের লোকজনরা সবাই বেরিয়ে গেছে। কিন্তু মা রয়েছে আর এখন থাকবেও। তবে দুপুরের দিকে ঐ মস্ত বোতল থেকে একটু পানীয় খেয়ে মা ঘুমিয়ে পড়বে। তখন আমি তোমার জন্যে একটা কিছু করব।”

মা ঘুমোলে ডাকাত-মেয়ে বল্‌গা-হরিণকে বলল, “তোমার গলায় ছোরা দিয়ে আরো বার কতক সুড়সুড়ি দিতে পারলে আমার অবিশ্যি খুবই মজা লাগত, কারণ তখন কী অদ্ভুতই-না দেখায় তোমাকে! তবু তোমার শেকল খুলে দিয়ে, তোমাকে পালাতে সাহায্য করব, একটা সর্তে! সে সর্তটি হল, এই ছোটো মেয়েটাকে পিঠে নিয়ে, যত জোরে পার ছুটে ল্যাপ-দেশে তুষার-রানীর প্রাসাদে ওকে পৌঁছে দিতে হবে। সেখানে ওর খেলার সাথী আছে। ওর কথা তো সবই শুনলে, ও যথেষ্ট জোরে জোরে সব কথা বলেছে আর তুমিও লোকের কথা শুনতে ওস্তাদ!”

আনন্দে বল্‌গা-হরিণ লাফিয়ে উঠল, ডাকাত-মেয়ে তার পিঠে গের্দাকে তুলে দিল, বসবার জন্য ছোটো একটা বালিশ দিল, পাছে পড়ে যায় তাই শক্ত করে বেঁধে দিল! তার পর সে বলল, “এই নাও তোমার লোমের জুতো। সে বড়ো শীতের দেশ, এ-সব দরকার হবে। হাতঢাকাটি আমি রাখলাম, ওটা বড়ো সুন্দর, ও আমি ছাড়তে পারব না। অবিশ্যি তাই বলে তোমার হাত জমে যাবার ভয় নেই। এই নাও আমার মার প্রকাণ্ড দস্তানা, ওগুলো তোমার কনুই অবধি উঠবে। পরে নাও, পরে নাও। এবার তোমার হাত দুটোকে আমার মার হাতের মতো আনাড়ি মনে হচ্ছে!”

আনন্দে গের্দার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। ডাকাত-বাড়ির ছোটো মেয়ে বলল, "তোমার চোখে জল আমি সইতে পারি না। তোমার তো খুশিমুখ করা উচিত। এই দেখ তোমার জন্য দু টুকরো রুটি আর এক টুকরো শুকনো মাংস এনেছি, পথে যদি খিদে পায়।" খাবারগুলো সে হরিণের পিঠে বেঁধে দিল। তার পর দরজা খুলে, প্রকাণ্ড কুকুরগুলোকে ডেকে সরিয়ে নিল। তার পর ছোরা দিয়ে বল্‌গা-হরিণের দড়ি কেটে দিয়ে বলল, "এবার দৌড় দাও। কিন্তু সাবধান, ঐ ছোটো মেয়েটাকে যত্ন করে নিয়ে যাবে।"

গের্দা হাত বাড়িয়ে ডাকাত-বাড়ির মেয়ের কাছ থেকে বিদায় নিল, তার পর হরিণ ছুটে চলল বনের মধ্যে দিয়ে, পাহাড়-পর্বতের উপর দিয়ে, মরুভূমির আর পোড়ো জমির ভিতর দিয়ে, মাঠের মাঝখান দিয়ে, জলাভূমির উপর দিয়ে। নেকড়ে ডাকতে লাগল, দাঁড়কাক চেঁচাতে লাগল। 'ইস্‌চ্‌! ইস্‌চ্‌!' ও কিসের শব্দ? মনে হল ঠিক যেন আকাশটা হাঁচল!

বল্‌গা-হরিণ বলল, "ঐ দেখ উত্তর দিকে মেরুজ্যোতি। দেখ, দেখ, কী সুন্দর!" এই বলে সে আরো জোরে ছুটে চলল। দিনরাত বল্‌গা-হরিণ ছুটল, রুটি খাওয়া হয়ে গেল, শুকনো মাংস ফুরোল, শেষে ওরাও ল্যাপ-দেশে পৌঁছুল।

ল্যাপ মহিলা আর ফিন মহিলা

একটা কুঁড়েঘরের সামনে ওরা থামল। কুঁড়েঘরের বড়ো দুরবস্থা, ছাদ ঝুলে মাটি ছোঁয় আর কি, দরজাটা এমনি নিচু যে ঢুকতে বেরুতে গেলে চার হাত-পায়ে হামা দিতে হয়।

বাড়িতে কেউ ছিল না, খালি এক ল্যাপ মহিলা একটা বাতির উপরে মাছ সিদ্ধ করতে ব্যস্ত।

বল্‌গা-হরিণ তাকে গের্দার কাহিনী শোনাল, অবিশ্যি তার আগে নিজের জীবনকথাও বলে নিল; হরিণের কাছে তার নিজের কথাটিরই দাম বেশি। এদিকে গের্দা বেচারির এমনি শীত লেগেছিল যে কথা বলতে পারছিল না। ল্যাপ মহিলা বলল, "আহা, বেচারি, এখনো যে অনেক পথ বাকি। আরো একশো মাইল দৌড়লে তবে ফিন-দেশে পৌঁছবে। সেখানে তুষার-রানী থাকেন; রোজ সন্ধ্যায় তিনি নীল আলো জ্বালেন। আমার কাগজপত্র নেই, তা একটা শুকনো মাছের গায়ে কটা কথা লিখে দিচ্ছি, ওটা নিয়ে ফিন দেশের, জ্ঞানী বুড়ির কাছে যাও। সে আমার চেয়ে ভালো পরামর্শ দেবে।"

তার পর গের্দা খানিকটা আগুন পোয়াল, কিছু খাবার খেল। ল্যাপ মহিলা মাছের গায়ে কটা কথা লিখে, গের্দাকে বলল, "ওটি সযত্নে রেখ।" তার পর আবার তাকে বল্‌গা-হরিণের পিঠে শক্ত করে বেঁধে, রওনা করিয়ে দিল।

ওরা চলেছে তো চলেছে। সারারাত ধরে উত্তর দেশের অপূর্ব সুন্দর মেরুজ্যোতি আকাশ আলো করে রাখল, সেই অপরূপ আলোর আভাতে ওরা ফিন-দেশে পৌঁছে, জ্ঞানী বুড়ির উনুনের চোঙায় টোকা দিল। বুড়ির বাড়িতে দরজার বালাই ছিল না।

ঘরের ভিতরে বেজায় গরম; এত গরম যে জ্ঞানী বুড়ির গায়ে কাপড়-চোপড় বিশেষ কিছু ছিল না। মানুষটা ভারি বেঁটে, বড়ো নোংরা। সে তাড়াতাড়ি এসে গের্দার জামা, লোমের জুতো, পুরু দস্তানা খুলে দিল; বল্‌গা-হরিণের মাথায় এক টুকরো বরফ চাপাল; তার পর মাছটা নিয়ে, তার গায়ে লেখা

চিঠি পড়ল। চিঠিটা সে তিনবার পড়ল। তৃতীয়বার পড়া হলে কথাগুলো তার মুখস্থ হয়ে গেল। তখন সে মাছটাকে তার রান্নার হাঁড়িতে ফেলে দিল, তাতে রান্নার আস্বাদ বাড়ে। বুড়ি কোনো জিনিস নষ্ট করত না।

তখন বল্‌গা-হরিণ প্রথমে নিজের জীবন কাহিনী বলল. সেটা বলা হলে গের্দার ব্যাপার বলল। বুড়ির চোখ চক্‌চক্ করে উঠল, মুখে কিছু বলল না।

তখন বল্‌গা-হরিণ আবার বলল, "গের্দার জন্য সেই আশ্চর্য ওষুধ বানিয়ে দেবেন না, যা খেলে গায়ে বারোজন মানুষের বল হবে, তার সাহায্যে ও তুষার-রানীকে পরাস্ত করবে?" জ্ঞানী বুড়ি বললেন, "বারোজন মানুষের বল! তাতে তো ভারি এসে যাবে!" এই বলে সরে গিয়ে, তাকের উপর থেকে মস্ত একটা চামড়ার তৈরি পাকানো পুঁথি নামিয়ে, সেটি পড়তে বসে গেলেন। এত মন দিয়ে পড়তে লাগলেন যে কপাল দিয়ে ঘাম ঝরতে লাগল।

শেষে তাঁর চোখ দুটি আবার মিট্‌মিট্ করে উঠল, তিনি বল্‌গা-হরিণকে এক কোণে ডেকে নিয়ে, তার মাথায় আরেক টুকরো বরফ চাপিয়ে, ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "ছোটো কে এখনো তুষার-রানীর বাড়ীতেই আছে, সেখানে সে যা চায় তাই হয়। ওর ধারণা পৃথিবীতে এমন জায়গা আর নেই। তার কারণ হল কে-র হৃদয়ে এক চিলতে কাঁচ আর চোখেও এক চিলতে কাঁচ ফুটে রয়েছে। ওগুলোকে সরাতে না পারলে, ওর আর মানুষের মতো মনের ভাব হবে না আর চিরকাল ও তুষার-রানীর কেনা হয়ে থাকবে।"

"কিন্তু আপনি কি গের্দাকে এমন কিছু দিতে পারেন না, যার গুণে এই-সব মন্দ প্রভাব কেটে যাবে?" "ওর যে শক্তি

আছে, তার মতো বড়ো শক্তি দেবার আমার সাধ্য নেই। ওর শক্তির জোর আমাদের চাইতে অনেক বেশি, কারণ তার উৎস ওর হৃদয় থেকে, ও যে একজন ভালোবাসায় ভরা নিষ্পাপ ছোটো মেয়ে। ঐ শক্তির জোরে যদি ও তুষার-রানীর প্রাসাদে ঢুকে, কে-র হৃদয় থেকে আর চোখ থেকে কাঁচের টুকরো তুলে দিতে না পারে, তা হলে আমাদের আর করার কিছু নাই। এখান থেকে দু মাইল দূরে তুষার-রানীর বাগান, সেই পর্যন্ত তুমি ওকে পিঠে করে নিয়ে যাও। সেখানে একটা ঝোপ দেখবে। ঝোপের অর্ধেক বরফে ঢাকা, কিন্তু তাতে লাল লাল ফল ধরেছে, সেইখানে ওকে নামিয়ে দিও। সময় নষ্ট কোরো না; নামিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে এসো।”

তার পর জ্ঞানী বুড়ি গের্দাকে বল্‌গা-হরিণের পিঠে তুলে দিলেন, অমনি ওরা রওনা দিল।

যখন অনেক দূর চলে এসেছে, গের্দা চেঁচিয়ে উঠল, “আরে আমার জুতো-জোড়া ফেলে এলাম, দস্তানা ফেলে এলাম!” তখন আর কিছু করার নেই, হাড় কাঁপানো শীত, কিন্তু বল্‌গা-হরিণের থামবার সাহস হল না; সে ছুটেছে তো ছুটেছেই, যতক্ষণ না সেই লাল ফলে ভরা ঝোপের কাছে পৌঁছুল। সেখানে সে গের্দাকে নামিয়ে দিল, হরিণের দু চোখ জলে ভেসে গেল, তবু সে আর না থেমে ঘুরে দৌড় দিল; তা ছাড়া আর করবেই-বা কি?

এদিকে গের্দা বেচারি সেখানে দাঁড়িয়ে রইল, পায়ে নেই জুতো, হাতে নেই দস্তানা, চারদিকে গাছপালা জন-মানুষের চিহ্ন নেই, সেই ভয়ংকর ঠাণ্ডা ফিন-দেশে।

গের্দা তখন প্রাণপণে ছুটতে লাগল। এক দঙ্গল নরম নরম বরফের কুচি ওকে দেখে এগিয়ে এল। ওরা আকাশ

থেকে পড়ে নি, আকাশটা ছিল ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার, একটুও মেঘ ছিল না, মেরুজ্যোতি ঝল্‌মল্‌ করছিল। বরফের তাল-গুলো মাটির উপর দিয়ে সোজা দৌড়ে চলল। গের্দা যতই এগোয় বরফের টুকরোগুলোও ততই বড়ো হয়।

গের্দার হঠাৎ মনে পড়ল একবার আতস-কাঁচের ভিতর দিয়ে সে নরম বরফের টুকরো দেখেছিল, কী প্রকাণ্ড, কী অদ্ভুত দেখিয়েছিল। এগুলো কিন্তু তার চাইতেও ঢের বড়ো; এরা যেন জ্যান্ত জিনিস। আসলে ওরা তুষার-রানীর দ্বাররক্ষী। এমন অদ্ভুত সব চেহারা ভাবা যায় না। কেউ-বা কদাকার সজারুর মতো, কেউ-বা গিট-পাকানো সাপের মতো, তাদের মুণ্ডুগুলো আবার বেরিয়ে আছে, আবার কেউ-বা খোঁচা খোঁচা লোমওয়ালা ভোঁদা ভালুক-ছানার মতো।

গের্দা বেচারি করে কি, মনে মনে ভগবানের নাম করতে লাগল। এদিকে এমনি বেজায় ঠাণ্ডা যে নিশ্বাসটুকু ফেললে দেখা যায় কেমন মুখ থেকে বেরিয়ে, বাষ্পের মতো হয়ে আকাশে উড়ে যাচ্ছে। শীতটা যেন আরো জমে এল, বাষ্প আরো ঘন হল, তার পর বাষ্পটা ছোটো-ছোটো ঝক্‌ঝকে দেবদূতের মতো হয়ে গেল। পৃথিবীর মাটিতে তাদের পা পড়তেই, তাদের চেহারাগুলো আরো বড়ো, আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাথায় তাদের শিরস্ত্রাণ, হাতে ঢাল তলোয়ার। দেখতে দেখতে সংখ্যায় তারা এমনি বেড়ে গেল যে প্রার্থনা শেষ করে, গের্দা তাকিয়ে দেখে তার চারদিকে দেবদূতের বাহিনী! তারা তলোয়ার দিয়ে বরফের টুকরোগুলোকে খোঁচা দিতেই সেগুলো হাজার টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে লাগল। তাদের মাঝখান দিয়ে নিরাপদে নির্ভয়ে ছোটো গের্দা হেঁটে চলল। দেবদূতরা ওর হাত-পা ছুঁয়ে দিতেই আর তার শীত বোধ হল না; বুক-

ভরা সাহস নিয়ে গের্দা তুষার-রানীর প্রাসাদের কাছে চলল।

তবে ভিতরে গিয়ে কি হল সে কথা বলার আগে, কে কি করছিল একটু দেখা যাক। সে গের্দার কথা মোটেই ভাবে নি, গের্দা যে প্রাসাদের ফটকে এসে দাঁড়িয়েছে এ কথা সে কল্পনাও করে নি।

তুষার-রানীর প্রাসাদ

প্রাসাদের দেয়ালগুলি উড়ন্ত বরফের তৈরি, দরজা-জানলা ধারালো বাতাস দিয়ে গড়া। একশোর বেশি বড়ো-বড়ো কামরা, সবচাইতে বড়োটা অনেক মাইল লম্বা, মেরুজ্যোতি দিয়ে সব ঘর আলো করা, বিশাল সব ঘর ধূ-ধূ করছে, খাঁ-খাঁ খালি, হিম-শীতল, চোখ ঝলসানো সাদা! শূন্য সীমাহীন বরফের ঘরের মাঝখানে একটি বরফের হ্রদ। সে বরফ হাজার টুকরো করে ভাঙা, কিন্তু প্রত্যেকটি টুকরো হুবহু একরকম, দেখে মনে হয় কোনো মানুষ কারিগরের এমন করার সাধ্য নেই। তুষার-রানী যখন বাড়িতে থাকতেন, সর্বদা এই হ্রদের মাঝখানে বসতেন।

শীতের চোটে ছোটো কে-র গায়ের রঙ হয়ে গেছিল নীল, নীল কেন কালোই বলা চলে, কিন্তু সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। প্রথম প্রথম ভয়ে ঠাণ্ডায় সে কুঁকড়ে থাকত, তার পর তুষার-রানীর আদরে সে ভাবটা চলে গেছিল। এখন কে-র বুকের ভিতরটা একটা শক্ত বরফের দলার মতো হয়ে গেছিল। বরফের ধারালো কুচিগুলো নিয়ে সে তখন ভারি ব্যস্ত ছিল। এভাবে ওভাবে নানান ভাবে সেগুলোকে সাজায়, জোড়া দেয়, ঠিক যেমন করে লোকে চীনে ধাঁধার ছবির

টুকরো সাজায়। বরফের কুচি সাজিয়ে কে অদ্ভুত দেখতে একেকটা গোটা নক্‌শা বানাতে পারত, ও ভাবত নক্‌শাগুলো বুঝি ভারি দরকারি জিনিস। মাঝে মাঝে একেকটা আস্ত কথা বানিয়ে ফেলত, কিন্তু একটি কথা সে কিছুতেই তৈরি করতে পারত না; সে কথাটি হল, 'অনন্তকাল।' তুষার-রানী বলেছিলেন, "ঐ কথাটি যখন বরফ জুড়ে তৈরি করতে পারবে, তখন আবার তুমি স্বাধীন হবে, আমি তোমাকে দুনিয়াটা দিয়ে দেব, তা ছাড়া একজোড়া নতুন স্কেট পাবে!"

তবু সে কিছুতেই পেরে উঠল না।

একদিন তুষার-রানী বললেন, "আমি গরম দেশে চললাম। বাতাসে ভেসে চলে যাব, কালো হাঁড়ির মধ্যে তাকিয়ে দেখব। তাদের গায়ে একটু সাদা রঙ লেপে দেব, তাতে লেবুর আর জলপাইয়ের ফসল ভালো হবে।" অর্থাৎ তিনি এটনা আর ভিসুভিয়াস নামে যে আগ্নেয়গিরি আছে, তাদের মুখে একটু তুষার মাখাবেন, তার ফলে পাহাড়ের নীচের দিকে লেবুর আর জলপাইয়ের বাগানে ভালো ফল হবে। উড়ে চলে গেলেন তুষার-রানী; সেই প্রকাণ্ড বরফের কামরায় কে একা বসে রইল।

বরফের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আর ভেবে ভেবে কে-র মাথা ধরে গেল। এতটুকু নড়ছে না চড়ছে না, ঠাণ্ডায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে, দেখে মনে হচ্ছে সে-ও বুঝি বরফে জমে গেছে।

এদিকে গের্দা যেই প্রাসাদের ফটক পার হয়ে ভিতরে ঢুকল, হিমশীতল ক্ষুরধার শীতের বাতাস বইতে শুরু করল। গের্দা আবার ভগবানের নাম করতে লাগল, অমনি বাতাস পড়ে গেল। গের্দা তখন সেই প্রকাণ্ড ঠাণ্ডা সভাঘরে ঢুকল। কে-কে দেখেই সে চিনতে পারল; অমনি ছুটে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে,

তাকে বুকে ধরল। গের্দা বলতে লাগল, "ও কে, আমার প্রিয় বন্ধু কে, এত কাল পরে তোমাকে সত্যি খুঁজে পেলাম!"

কে কিন্তু তেমনি করেই বসে রইল, ঠাণ্ডা, নীরব, নিশ্চল। ওর কাছে এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার পেয়ে গের্দার বড়োই দুঃখ হল। সে ঝর্‌ঝর্‌ করে কাঁদতে লাগল, কি তেতো, গরম সে চোখের জল! কে-র বুকের উপর পড়ল, বুক ভেদ করে হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছল, সেখানকার বরফ গলে গেল, জাদু-আয়নার কুচিটাও গলে গেল। এবার কে গের্দার মুখের দিকে চাইল। গের্দা তার সেই পুরনো গানটি গাইতে লাগল,

গোলাপ ফোটে, গোলাপ ঝরে,
দেব-শিশু রয় চিরতরে।
সে-মুখ দেখে ধন্য হই,
সদাই যেন শিশু রই!

তখন কে-ও ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেলল। তার সেই চোখের জলের সঙ্গে চোখ থেকে আয়নার কুচিটাও ভেসে বেরিয়ে এল। অমনি সে গের্দাকে চিনতে পারল। আনন্দে কে বলে উঠল, "গের্দা, আমার আদরের গের্দা, কোথায় ছিলে এতকাল? আর আমিই-বা কোথায় ছিলাম?"

চারদিকে তাকিয়ে দেখল কে। বলল, "এ কী ভীষণ ঠাণ্ডা, কী বিশাল, কী শূন্য খাঁ-খাঁ করছে!" এই বলে সে গের্দাকে আদর করল। গের্দা তো হেসে কেঁদে আকুল। সবাই খুশি হল, এমন-কি, বরফের টুকরোগুলো পর্যন্ত সে খুশির ভাগীদার হল। তারা তো নেচে-কুঁদে একাকার, তার পর ক্লান্ত হয়ে যেই-না তারা যে-যার শুয়ে পড়ল, অমনি নিজের থেকেই অক্ষরের পর অক্ষর বসে সেই রহস্যময় কথাটি লেখা হয়ে গেল!

তুষার-রানী বলেছিলেন কে যখন বরফের কুচি বসিয়ে 'অনন্তকাল' কথাটি লিখতে পারবে, অমনি সে ছুটি পাবে আর তিনি তাকে সমস্ত দুনিয়াটা দিয়ে দেবেন, মায় এক জোড়া নতুন স্কেট !

যেই গের্দা কে-র গালে চুমো খেল, অমনি গাল দুটিতে আগের মতো রাঙা রঙ ধরল, প্রাণ ফিরে এল। গের্দা তার চোখ দুটিতে চুমো খেল, অমনি সে চোখ গের্দার নিজের চোখের মতো ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। গের্দা তার হাতে পায়ে চুমো খেল, অমনি তার সারা গায়ে আগের মতো আনন্দ আর স্বাস্থ্য ফিরে এল। এখন তুষার-রানী যত শিগ্‌গির-ই ফিরুন-না কেন, তাতে কিছু এসে যায় না। কে-র ছাড়পত্র হ্রদের উপর ঝক্‌ঝকে বরফের হরপে লেখা রইল !

তার পর তারা হাত ধরাধরি করে, বরফের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। যতই তারা এগিয়ে যায়, দুরন্ত বাতাস শান্ত হয়, ঘন কালো ঝোড়ো মেঘ সরে গিয়ে পরম গৌরবে সূর্য দেখা দেয়। যখন তারা সেই লাল ফলে ঢাকা ঝোপের কাছে পৌঁছুল, দেখল বল্‌গা-হরিণ তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। তার সঙ্গে আরেকটা হরিণ, তার বয়স কম, তার বাঁট ভরা দুধ, সে দুধ হরিণ ওদের খাওয়ালো, ছেলেমানুষ ওরা ওদের অনেক দূর যেতে হবে।

তখন বুড়ো বল্‌গা-হরিণ আর জোয়ান বল্‌গা-হরিণ ওদের পিঠে তুলে নিয়ে রওনা দিল। আগে গেল ফিন-দেশের জ্ঞানী বুড়ির ছোট্টো গরম ঘরটিতে। সেখানে ওরা গা গরম করে নিল ; কি ভাবে কোথা দিয়ে যেতে হবে বুড়ি সব বলে দিলেন। তার পর ওরা গেল ল্যাপ-দেশের মহিলার বাড়িতে। সে তাদের জন্য নতুন কাপড়-চোপড় সেলাই করে দিল, তা ছাড়া একটা শ্লেজগাড়িও দিল।

তার পর সবাই মিলে ছুটতে ছুটতে ল্যাপ-দেশের সীমানায়

পৌঁছুল। যেখানে বরফের দেশ শেষ হয়ে, সবুজ গাছ পাতা গজাতে শুরু করেছে, সেই অবধি এসে ল্যাপ মহিলা আর হরিণ দুটি বিদায় নিল। সবাই ডেকে বলল, "বিদায়! বিদায়!" তার পর অনেকদিন পরে, প্রথম ওরা ছোটো-ছোটো পাখি দেখল। ছোটো পাখিরা কিচির মিচির শব্দ করতে লাগল, তার পর সে যে কী মিষ্টি গান গাইল! বনের গাছে গাছে নানারকম সবুজের সমাহার দেখে ওরা মুগ্ধ হল।

হঠাৎ গাছের সবুজ ডাল সরিয়ে দিয়ে, একটা তেজী ঘোড়া এসে উপস্থিত। ঐ ঘোড়া গের্দার খুব চেনা, কারণ ঐ ঘোড়া গের্দার সেই সোনার গাড়িতে জোতা ছিল। ঘোড়ার পিঠে অল্পবয়সের এক মেয়ে বসে, মাথায় তার লাল টুপি, কোমরের খাপে পিস্তল! এ তো সেই ডাকাত-বাড়ির মেয়ে ছাড়া আর কেউ নয়! বাড়িতে আর তার মন টিকছিল না, তাই দেশ দেখতে বেরিয়ে পড়েছে, আগে উত্তরে, তার পর বাকি দুনিয়ায়। গের্দাকে দেখামাত্র সে চিনতে পারল, গের্দাও তাকে ভোলে নি। আবার দেখা হওয়াতে তাদের আনন্দ দেখে কে?

ডাকাত-মেয়ে কে-কে খুব বকল, "বাঃ, বাঃ, খাসা ভদ্রলোক হয়েছ দেখছি, লক্ষ্মীছাড়া ঘর-পালানো ছোকরা! বল দিকিনি, কী এমন গুণ তোমার যে কেউ সব ছেড়ে ছুড়ে তোমার খোঁজে পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াবে!"

কিন্তু গের্দা তার গালে হাত বুলিয়ে আদর করে, রাজকুমার, রাজকুমারীর কুশল জিজ্ঞাসা করল।

ডাকাত-মেয়ে বলল, "ওরা বিদেশে বেড়াতে গেছে।"

"আর সেই দাঁড়কাক?"

"বুড়ো দাঁড়কাক মরে গেছে। পোষা দাঁড়কাক বিধবা হয়ে, পায়ে একটা গরম কাপড়ের ফেট্টি বেঁধে নেচে বেড়ায়।

থেকে থেকে কাঁই-কুঁই করে বটে, তবে আগের মতোই বেজায় বক্‌বক্‌ করে। কিন্তু তোমার ব্যাপার সব বল দিকিনি। পুরনো বন্ধুকে খুঁজে পেলে কি করে?"

তখন গের্দা আর কে তাদের কাহিনী শোনাল। শুনে ডাকাত-মেয়ে বলল, "আরি বাপ্পলো বাপ্পলো বাপ।" তার পর দুজনের হাত চেপে ধরে, কথা দিল যে কখনো যদি সে ঘুরতে ঘুরতে ওদের শহরে যায়, তা হলে নিশ্চয় দেখা করবে। তার পর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডাকাত-বাড়ির সেই মেয়ে ঘোড়ায় চেপে দুনিয়া দেখতে চলে গেল।

কে গের্দা বড়ো একটা শহরে পৌঁছুল, সেখানে মহা আনন্দ করে গির্জার ঘণ্টা বাজছিল; গির্জার উঁচু চুড়ো দেখেই ওরা চিনতে পারল, এই তো তাদের নিজের শহর, এইখানেই তাদের বাড়ি। বুক ভরা আনন্দ নিয়ে পথ পার হয়ে, তারা গের্দার ঠাকুমার বাড়ির দোরগোড়ায় থামল। তার পর সিঁড়ি দিয়ে উঠে, সেই বড়ো চেনা ঘরটিতে ঢুকল। ঘড়ি বলল, টিক্‌-টিক্‌-টিক্‌, তার কাঁটা দুটি আগের মতোই ঘুরছিল।

সবই আগের মতো, শুধু একটি তফাত তাদের নজরে এল. সে তফাত তাদের নিজেদের মধ্যে, তারা এখন বড়ো হয়ে গেছে! খোলা জানলার সামনে বাড়ির ছাদের গোলাপগাছ দুটি ফুলে ভরে আছে, গাছতলায় ওদের সেই ছোটো-ছোটো টুল দুটি রয়েছে। কে আর গের্দা তখনো হাত ধরাধরি করে গিয়ে সেই টুল দুটিতে বসল। তুষার-রানীর প্রাসাদের সেই হিম-শীতল ফাঁকা জাঁকজমকের কথা তারা ভুলে গেল, মনে হল যেন কী একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। এদিকে ঠাকুমা চন্‌মনে রোদে বসে, বাইবেল থেকে এই কথাগুলি পড়ছিলেন, "শিশুদের মতো সরল না হলে কেউ স্বর্গরাজ্যে যেতে পারে না।"

কে আর গের্দা এ-ওর দিকে তাকাল। এতদিন পরে তারা সেই গানের কথার মানে বুঝল,

গোলাপ ফোটে, গোলাপ ঝরে,
দেব-শিশু রয় চিরতরে ;
সে-মুখ দেখে ধন্য হই,
সদাই শিশুর মতো রই !